ক্যালকাটা বুক হাউস
১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

শান্তিনিকেতনের
পরলোকগত শিক্ষক-কর্মীদের
উদ্দেশে

ভূমিকা

আজ থেকে একশো বছর আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তির উৎসব আজ দিকে দিকে। দেশে-বিদেশে, ঘরে-বাইরে।

আর এই উৎসবে ছেলে-মেয়েদেরও একটি ভূমিকা আছে। তাদেরও কিছু-না-কিছু করার আছে এই উৎসবে। কিন্তু উৎসব সার্থক করতে হলে প্রথমেই তাদের ভেবে নেওয়া দরকার, 'কার জন্যে উৎসব করতে যাচ্ছি?' ভাল করে বোঝা দরকার রবীন্দ্রনাথকে। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি ছিলেন, আর তিনি কবিতা লিখে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন—' এটাই যে কবির সব থেকে বড় পরিচয় নয়—আজ এই শতবার্ষিকী উৎসবের দিনে সেটা তাদের ভাল করে জেনে নিতে হবে। আর সেই জেনে নেওয়াতেই আছে উৎসবের প্রকৃত সার্থকতা।

এই কথা ভেবে আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই সংকলনটি প্রকাশ করা হলো। এর মধ্যে শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথ—নিতান্তই একজন সাধারণ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানবার মত লেখাও সংকলিত হয়েছে। কবির দৈনন্দিন জীবনের অনেক ছোট-খাটো ঘটনা, খেয়াল-খুশির ছবি, হাস্য-পরিহাসের ধরন যেমন এ বই থেকে পাওয়া যাবে—তেমনি জানতে পারা যাবে একজন প্রজা-দরদী জমিদার রবীন্দ্রনাথকে। একদিকে যেমন দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর স্নেহময় ছবি অন্যদিকে তেমনি নির্ভীক দৃপ্ত চরিত্র-চিত্র। শান্তিনিকেতনকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা সম্পূর্ণ হয় না, তাই শান্তিনিকেতন সম্পর্কেও কিছু লেখা এ সংকলনে দেওয়া হলো।

তবে এ কথাও সত্য যে, কবির সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনের সমস্ত ঘটনা বা সমগ্র অনুরাগীবৃন্দের লেখা এ সংকলনে দেওয়া যায়নি, আর তা দেওয়া সম্ভবও নয়। তবু যে লেখাগুলি এই বইতে সংকলিত হলো তা থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণায় আসা সম্ভব হবে।

'রবীন্দ্র স্মৃতি'র লেখাগুলি সাজানোর ব্যাপারে কোন নিয়ম মেনে চলা হয়নি, যে ভাবে সংগৃহীত হয়েছে ঠিক সেই রকমই পর পর দেওয়া হলো। শুধু লেখাগুলির বিষয় অনুসারে সূচীপত্র মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কবিকে খুব কাছে থেকে দেখে যাঁরা নিজেদের স্মৃতিকথায় তাঁর কথা বলেছেন—সে লেখাগুলি দেওয়া হলো 'স্মৃতিকথা' পর্যায়ে। 'জীবনকথা'য় আছে শুধু রবীন্দ্রনাথের জীবনী বিষয়ক লেখাগুলি। আর তাঁর সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের লেখাগুলি দেওয়া হলো 'সৃজনকথা' পর্যায়ে।

তবু এ-ধরনের একটি সংকলন-গ্রন্থের সাজানো-গোছানো, মিল-মিছিল যেমন হওয়া দরকার ঠিক তেমনটি আমি করে উঠতে পারিনি এই কথাই এখন বার বার মনে হচ্ছে। নির্ধারিত একটি সময়ে বইটি প্রকাশ করার তাগিদে তাড়াহুড়োর জন্য কিছু মুদ্রণ প্রমাদও যে নেই এ কথা বলবো না।

বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে এ সংকলনের অনেক লেখাই দেওয়া যেতো না, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি ও কবিতার পাণ্ডুলিপি-চিত্র প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে তাঁরা এই সংকলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলায় সাহায্য করেছেন। ৺প্রমথ চৌধুরী ও ৺ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর লেখার জন্যেও তাঁদের কাছে আমি ঋণী। 'একটি বিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি' লিপিচিত্রটি প্রকাশ করার অনুমতি দান করেছেন শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ। অনেক স-স্নেহ উপদেশও আমি তাঁর কাছে পেয়েছি। আর সহযোগিতা করেছেন শান্তিনিকেতনের শ্রীসুধীরচন্দ্র কর, 'দেশ' পত্রিকার সহ-যোগী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ ও বিশ্বভারতীর শ্রীসুশীল রায়। কবি সুনির্মল বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি 'রোশনাই' শিশু মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরমেন দাস ও প্রকাশক শ্রীমৃণাল দত্তর সৌজন্যে পাওয়া গেছে। শ্রীচিত্ত নন্দী গৃহীত 'শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা'—চিত্রটিও পাওয়া গেছে 'রোশনাই'-এর সৌজন্যে। বইপত্র দিয়ে সংকলনের লেখা সংগ্রহের কাজে সাহায্য করেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার শ্রীআতাউর রহমান, 'বসুধারা' পত্রিকার শ্রীজয়ন্ত বসু, 'গীতবিতান' সঙ্গীত শিক্ষায়তনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানীর শ্রীমৃণাল দত্ত, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স-এর শ্রীসুপ্রিয় সরকার,

নবারুণ প্রকাশনীর শ্রীসুবোধ রায়, সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল ও শ্রীপ্রকাশ ভবনের শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ। কবি শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত ও আমার পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু সাংবাদিক শ্রীশ্যামল দত্তর কাছেও আমি নানা ব্যাপারে অনুগৃহীত।

কয়েকটি রচনার প্রতিলিপি গঠন করার কাজে সহযোগিতা করেছেন শ্রীপারমিতা সেন ও শ্রীকনক দে। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি; আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ সংকলনের লেখক ও লেখার স্বত্বাধিকারী-দের, যাঁদের সহযোগিতা না পেলে সংকলনটি প্রকাশিত হতে পারতো না।

আর একটি কথা, 'রবীন্দ্র স্মৃতি' সংকলন-গ্রন্থের পরিকল্পনা শুধু একটি পরিকল্পনা হয়েই থেকে যেতো, যদি না 'ক্যালকাটা বুক হাউসে'র কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল বইটি প্রকাশ করতেন। 'রবীন্দ্র স্মৃতি' প্রকাশ করার জন্য এবং এই ব্যয়বহুল গ্রন্থের এত স্বল্প মূল্য ধার্য করার জন্য বাংলার কিশোর পড়ুয়ারা তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। কিন্তু আমি জানাবো না, কারণ চিরাচরিত কৃতজ্ঞতা জানালে তাঁকে আরো ছোট করা হবে বলে মনে করি। তবে একটি সংশয় আছে—এই সংকলন সম্পাদনার যে গুরুদায়িত্ব তিনি আমাকে দিয়েছিলেন তা যথাযথ ভাবে পালন করতে পেরেছি কি?

বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র

স্মৃতিকথা

জীবনকথা

স্বজনকথা

ধন্য কবি, কাব্য-লোকের ছত্রপতি, ধন্য তুমি,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি।
বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে কবি,
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি সভায় ওগো বাজাও বীণা হাজার-তারা।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
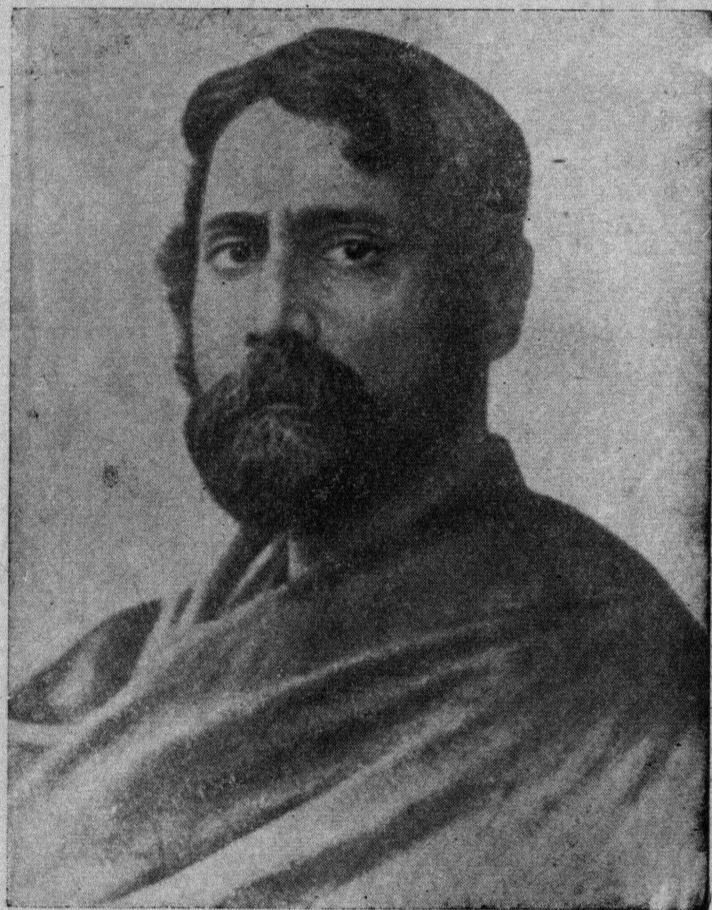
স্বদেশী যুগে কবি

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা, বাড়ির গিন্নি থেকে চাকরবাকর দাসদাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘড়ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁর দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন। বাড়িতে তাঁত বসে গেল, খটাখট শব্দে তাঁত চলতে লাগল। মনে পড়ে এই বাগানেই সুতো রোদে দেওয়া হোত। ছোটো ছোটো গামছা, ধুতি তৈরি ক'রে মা আমাদের দিলেন—সেই ছোটো ধুতি, হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই প'রে আমাদের উৎসাহ কত!

একদিন রাজেন মল্লিকের বাড়ি থেকে ফিরছি, পল্লীসমিতির মিটিঙের পর, রাস্তার মোড়ে একটা মুটে মাথা থেকে মোট নামিয়ে সেলাম করে হাতে পয়সা কিছু গুঁজে দিলে, বললে, আজকের রোজগার। একদিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিয়ে দিলে। মুটেমজুরদের মধ্যেও কেমন একটা ভাব এসেছিল স্বদেশের জন্য কিছু করবার, কিছু দেবার।

রবিকাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের। সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। উৎসবের মন্ত্র অনুষ্ঠান সব জোগাড় করতে হবে, তখন তো তোমাদের মতো আমাদের আর বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় ছিলেন না, ক্ষিতিমোহন বাবুও ছিলেন না; কিছু একটা হোলেই মন্ত্র বাতলে দেবার। কী করি, থাকবার মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন কথক ঠাকুর, রোজ কথকতা করতেন আমাদের বাড়ি, কালো মোটাসোটা তিলভাণ্ডেশ্বরের মতো চেহারা। তাঁকে গিয়ে ধরলুম রাখীবন্ধন-উৎসবের একটা অনুষ্ঠান বাতলে দিতে হবে। তিনি খুব খুশী ও উৎসাহী হয়ে উঠলেন,

বললেন, এ আমি পাঁজিতে তুলে দেব, পাঁজির লোকদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, এই রাখীবন্ধন-উৎসব পাঁজিতে থেকে যাবে। ঠিক হোলো সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান ক'রে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব— রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি-ঘোড়া নয়। কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী আর করি—হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে বললুম, নে সব কাপড়-জামা নিয়ে চল্ সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চলল স্নানে, মনিবচাকর এক সঙ্গে সব স্নান হবে। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দু-ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

বাংলার মাটি
বাংলার জল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

এই গানটি সে-সময়েই তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হোলো—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হোলো। হাতের কাছে ছেলে-মেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে

মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে—এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোল-কুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চীৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হলো, চলো সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমান-দের রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না। তার উপর রবিকাকার খেয়াল, কোথা দিয়ে কোথায় যাবেন আর আমাকে হাঁটিয়ে মারবেন। আমি করলুম কী, আর উচ্চবাচ্য না করে যেই না আমাদের গলির মোড়ে মিছিল পৌঁছানো, আমি সট করে একেবারে নিজের হাতার মধ্যে প্রবেশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। রবিকাকার খেয়াল নেই—সোজা এগিয়েই চললেন মসজিদের দিকে, সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরো সব ডাকাবুকো লোক।

এদিকে দীপুদাকে বাড়িতে এসে এই খবর দিলুম, বললুম, কী একটা কাণ্ড হয় দেখো। দীপুদা বললেন, এই রে, দিনুও গেছে. দারোয়ান দারোয়ান, যা শিগগির, দেখ্ কী হোলো—ব'লে মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। আমরা সব বসে ভাবছি—এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী কী হলো সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবী টৌলবী যাদের পেলুম হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে—ওরা একটু হাসলে মাত্র। যাক, বাঁচা গেল। এখন হোলে—এখন যাও তো দেখিনি, মসজিদের ভিতর গিয়ে রাখী পরাও তো—একটা মাথা-ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে।

তখন পুলিশের নজর যে কিছুই নেই আমাদের উপরে, তা নয়। একবার আমাদের উপরের দোতলার হলে একটা মিটিং হচ্ছে, রাখীবন্ধনের আগের দিন রাত্তিরে, উৎসবের কী করা হবে তার আলোচনা চলছিল। সেদিন ছিল বাড়িতে অরন্ধন, শাস্ত্র থেকে সব নেওয়া হয়েছিল তো! মেয়েরা সেবারে দেশবিদেশ থেকে ফোঁটা রাখী পাঠিয়েছিল রবিকাকাকে। হ্যাঁ, মিটিং তো হচ্ছে—তাতে ছিলেন এক ডেপুটিবাবু। আমাদের সে-সব মিটিঙে কারও আসবার বাধা ছিল না। খুব জোর মিটিং চলেছে এমন সময়ে দারোয়ান খবর দিলে, পুলিশ সাহেব উপর আনে মাঙ্গতা।

সব চুপ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। রবিকাকা দারোয়ানকে বললেন, যাও, পুলিশ সাহেবকে নিয়ে এসো উপরে।

ডেপুটি বাবুর অভ্যেস ছিল, সব সময়ে তিনি হাতের আঙ্গুলগুলি নাড়তেন আর এক দুই তিন করে জপতেন। তার কর-জপা বেড়ে গেল, পুলিশ সাহেবের নাম শুনে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, —আমার এখানে তো আর থাকা চলবে না। পালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, বেড়ালের নাম শুনে যেমন ইঁদুর পালাই-পালাই করে। আমি বললুম, কোথায় যাচ্ছেন আপনি, সিঁড়ি দিয়ে নামলে তো এখুনি সামনাসামনি ধরা পড়ে যাবেন! তিনি বললেন, তবে, তবে—করি কী, উপায়? আমি বললুম, এক উপায় আছে, এই ড্রেসিং-রুমে ঢুকে পড়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে থাকুন গে। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে তাই করলেন—ড্রেসিং রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রবিকাকা মুখ টিপে হাসলেন। দারোয়ান ফিরে এল—জিজ্ঞেস করলুম, পুলিশ সাহেব কৈ। দারোয়ান বললে, পুলিশ সাহেব সব পুছকে চলা গয়া। পুলিশ জানত সব, আমাদের কোনো উপদ্রব করত না, যে যা মিটিং করতাম—পুলিশ এসেই খোঁজ খবর নিয়ে চলে যেত, ভিতরে আর আসত না কখনো।

ঘরোয়া ॥

জানি নে কোন্ সূত্রে, কিন্তু বৃহৎ পরিবারের ভিতর ভাইয়েদের মধ্যে রবিকাকা ও জ্যোতিকাকামশায়ের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) এবং বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমার (স্বর্ণকুমারী দেবী) সঙ্গে বাবার (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। জ্যোতিকাকামশায় ছেলেবেলায় মাদের সঙ্গে বোম্বাই চলে যান এবং রবিকাকাও তো বাবার সঙ্গে বিলেত যান। সেইখান থেকেই আমাদের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। যখন যা আবদার করতুম সবই তিনি পূরণ করতেন। একবার মনে আছে হাজারিবাগ কনভেণ্টে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁকে ধরি।

রবিকা বলবামাত্র আমাদের নিয়ে যেতে রাজি হলেন। হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নেমে পুশপুশ গাড়ি করে বাকি পথটা যেতে হয়। পুশপুশ একরকম বড়গোছ মানুষে-ঠেলা পালকি-গাড়ি বলা যেতে পারে, তাতে শোওয়াও চলে। রাত্রিবেলা ঘনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া খুব নিরাপদ ছিল না, কারণ বাঘভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। যদিও আমাদের সে রকম কোনো বিপদ ভাগ্যে ঘটেনি। হাজারিবাগ পৌঁছে বোধ হয় ডাকবাংলোতেই আশ্রয় নিয়েছিলুম। এখনও পুরনো 'বালক' মাসিকপত্রের পাতা উলটালে সেই ডাকবাংলোর হাতায় ইজি-চেয়ারের উপর পা তুলে দেওয়া রবিকা'র একটা ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য আর্টিস্টের আঁকা চেহারাটি যে রবিকা'র সেটি ধরে নিতে হবে। আমার একটু একটু মনে পড়ে যেন আমরা কোনো যাদুগোপাল মুখুজ্জের বাড়ি উঠেছিলুম।...ছ দিন মাত্র বোধ হয় সেখানে ছিলুম, তার পরে যে পথে এসেছিলুম সেই পথেই ফিরে গেলুম। এক সপ্তাহব্যাপী কষ্টকর ভ্রমণে যে রবিকা' রাজি

হয়েছিলেন, তাতেই বোঝা যায় তিনি আমাদের কত স্নেহ করতেন। আবার মনে হয়, হয়তো ঐ বয়সে কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয় না, সবটাতেই আনন্দ বোধ হয়।

আর-একবার মনে আছে রবিকা'র সঙ্গে মুসৌরি পাহাড়ে যাই। তার পরে সোলাপুরেও রবিকা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কারোয়ারেও ছিলেন, সেখান থেকেই তো বিয়ে করতে কলকাতায় চলে যান। জ্যোতিকাকামশায়ের 'সরোজিনী' জাহাজেও আমরা একত্র ছিলুম। মনে আছে একবার খুব ঝড় হবার উপক্রম হওয়াতে মা রবিকা'র সঙ্গে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। জ্যোতিকাকামশায়ের আঁকবার খাতা তো তাঁর সঙ্গী ছিল। সেই জাহাজে বসেই আমাদের অনেক ছবি এঁকেছিলেন। এখনও তার খাতা কোথাও সঞ্চিত থাকতে পারে। রবিকা'র নানারকম মজার মজার মুখের ভাব দিয়ে ছবি এঁকেছিলেন। আর-একটি নতুন জিনিস করেছিলেন, আলাদা করে চোখ আঁকা। তার পরে কোনো-এক বইয়ে দেখেছি, একরকম খেলা আছে, তাতে একটা খবরের কাগজের পর্দার আড়ালে একদল বসে এবং প্রত্যেকের চোখের মাঝে একটা গবাক্ষ কাটা থাকে, তাতে চোখ দিয়ে বসতে হয়। পর্দার ওপার থেকে একজন চোখ দেখে কার চোখ চিনতে চেষ্টা করে। খেলাটা আমরা কখনও খেলিনি, একবার খেলে দেখবার চেষ্টা করলে হয়। সেই জাহাজে নদীর হাওয়াতে ···আমার খুব ক্ষিদে পেত এবং ক্রমাগত কুচো গজা ভেজে দেবার জন্যে রান্নাঘরে তাগিদ দিতুম মনে আছে। সেই জাহাজের ব্যবসায়ে তো জ্যোতিকাকামশায়ের সর্বনাশ হয়ে গেল। কিন্তু সে কথা বোঝবার বয়স আমাদের তখন হয়নি। এই জাহাজেই আমরা দ্বিপুদাদার (জ্যাঠামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ) বিয়েতে বরিশাল গিয়েছিলুম। পরে সিমলে পাহাড়ে রবিকা দিন-কতক আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

রবিকা'র প্রথম মেয়ে বেলা হবার পর রবিকা' গাজিপুরে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। গাজিপুর তার সুন্দর গোলাপফুল এবং গোলাপজলের জন্য বিখ্যাত বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিখ্যাত হওয়া উচিত তার গরমের জন্য। আর সে শুকনো গরম যে, নাবার সময় গায়ে জল ঢেলে আর তোয়ালে দিয়ে মোছার আবশ্যক হত না; এমনিই গায়ের জল গায়ে শুকিয়ে যেত। রাত্রিবেলা লোকে বিছানা-বালিশ-ঘাড়ে খুঁজে বেড়াত বাগানে, বাইরে কোথায় শুলে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়া যায়। ভজিয়া নামে বেলার এক খ্যাঁদা দাসী ছিল। সে অনেক দিন পরে আমার কাছেও কাজ করেছিল। সে আমাকে দিদিয়া বলেই ডাকত। ওদের দেশের এই 'ইয়া' অন্ত, যথা, পানিয়া ইত্যাদি, কথাগুলি শুনতে বড় মিষ্টি লাগে এবং অনেক হিন্দী গানেই দেখা যায়। গাজি-পুরে জ্যোতিকাকামশায়ের শ্বশুর শ্যামলাল গাঙ্গুলিও ছিলেন। মনে আছে তিনি বেগুন মুলো ও বড়ি দিয়ে গুড়-অম্বল রেঁধে রান্নাঘরের তাকে তুলে কাশী বেড়াতে যেতেন এবং ফিরে এসে খেতেন। ততদিনে বেশ সুন্দরভাবে মজে থাকত। সত্যি কথা বলতে কি, সে রকম সুস্বাদু গুড়-অম্বল তার পরে আর খাইনি, যদিও বেগুন-মুলো বড়ি দিয়ে পরে অনেককে রাঁধতে দেখেছি।....

আমাদের সঙ্গে এক বাড়িতে রবিকাকার থাকা প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে, তিনি একবার দার্জিলিঙ আর তিনধরিয়ায় আমাদের সঙ্গে অনেক-দিন কাটিয়েছিলেন। সময়টা ঠিক মনে করতে পারছি নে।

তিনধরিয়াতে আমার বড়ভাশুর একটি চা-বাগানের বাড়ি কিনে তাকে সুন্দর করে বাড়িয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন। সেখানে একবার দিনু (দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ) আর তার স্ত্রী কমলা-বউমার সঙ্গে আমরা দিনকতক বেড়াতে গিয়েছিলুম। রবিকা' দার্জিলিঙ যাবেন শুনে তাঁকে আমাদের ওখানে কিছুদিন থেকে যাবার নেমন্তন্ন জানিয়েছিলুম। তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন বটে,

কিন্তু খুব যে মনের সুখে ছিলেন, তা বলতে পারি নে। বাগানে বেশ ছোট্ট একটি আলাদা ঘর ছিল, সেখানে সকালে তাঁকে নিয়ে বসতুম আর রিপুকর্ম করতে করতে গল্প করতুম, যেমন আমার বাতিক আছে। তিনি বলতেন, পাহাড়ে জায়গায় তাঁর তেমন ভালো লাগে না। কারণ চার দিকে পাহাড় ঘিরে থাকে, দৃষ্টিকে বাধা দেয়। তিনি পছন্দ করেন উন্মুক্ত-প্রান্তর—যেমন শান্তি-নিকেতনে দেখা যায়, যেখানে দৃষ্টি দিগন্তের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকে যেন এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারে। আমি নিজে এ কথার সার্থকতা বুঝতে পারলুম যখন উদয়নের দোতলার জানলার ধারে বসে কাচের সার্সির ভিতর দিয়ে দেখতে পেলুম যেন বর্ষার ধারা সার-বাঁধা সেনাবাহিনীর মত মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে আসছে। রবিকা' কেবল দু'তিন দিনের জন্য তিনধরিয়ায় থেকে দার্জিলিঙ চলে গেলেন। বোধ হয় সেবারেই আমরা আবার তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙে একটা দোতলা বাড়িতে ছিলুম।

রবীন্দ্র-স্মৃতি ॥

শিশু-কবি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

…বড় একটা বুনিয়াদি পরিবারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিশুকাল কাটে, আরও পাঁচটি শিশুর মতোই।

ধনীগৃহের রেওয়াজ-মতে শিশুদের দিন কাটে ঝি-চাকরদের হেপাজতে। মাতা সারদাদেবী এই বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী—সব সময় মন দিতে হয় সংসারের কাজে—কর্তা থাকেন বিদেশে। পুত্র-বধূরা ও কন্যারা নিজ নিজ শিশুদের সামলাতেই ব্যস্ত। এ ছাড়া সারদাদেবীর শেষ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে তাঁর শরীরও যায় ভেঙে; সে শিশুর অকালমৃত্যু হয়। ফলে, রবীন্দ্রনাথ মায়ের বা দিদিদের বা বউদিদিদের যত্ন খুব যে পেতেন তা নয়। ভৃত্যমহলেই দিন কাটে অযত্নে অনাদরে। ঘরে আটকা থাকেন; জানলার নীচে একটা পুকুর, তার পুব ধারে পাঁচিলের গায়ে বড় একটা বটগাছ, দক্ষিণ দিকে নারিকেল গাছের সারি। শিশুর সময় কাটে এই ছবির মতো দৃশ্য দেখে—ডাকঘরের অমলের দশা—ঘর থেকে বের হওয়া বারণ। ঘুর ঘুর করলে চাকরদের কাজ বাড়ে, তারা শাসন করে।

পুরানো বসত বাড়ি প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নানা মহলে। অনেক ঘর, আঁকা-বাঁকা অনেক আঙিনা। বহু তলায় ও বহু ছাদে ওঠা নামার উঁচু-নীচু নানারকম সিঁড়ি এখানে-সেখানে। গোলক-ধাঁধার মতো সমস্ত বাড়িটা। শিশুর নিকট এই সব জানা-অজানা কুঠুরি ছাদ বিরাট রহস্যে পূর্ণ। কল্পনা-প্রবণ বালকের বিশ্বাস করবার শক্তি অপরিসীম। সঙ্গীদের মধ্যে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ তাঁর থেকে একটু বড়; তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ব'লে ছোট মাতুলটির তাক্ লাগিয়ে দিতেন। তাঁর ভগিনী

ইরাও 'রাজার বাড়ি'র রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিতে বালককে বিহ্বল করে তোলে। বড় বয়সে 'শিশু'র উক্তিচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'আমার রাজার বাড়ি কোথায়
কেউ জানে না সে তো—
সে বাড়ি কি থাকত যদি
লোকে জানতে পেত।'

অন্যত্র কবি বলেছেন, 'মনে আছে এক-একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল।...গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতুম কী একটা রহস্য আবিষ্কৃত হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো করে তার ভিতর কতকগুলো আতার বিচি পুঁতে রোজ যখন-তখন জল দিতেম—ভাবতেম এই বিচি অঙ্কুরিত হয়ে উঠলে সে কী একটা আশ্চর্য ব্যাপার হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়বাদলা—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানামূর্তিতে আমায় সঙ্গ দান করত।'

ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া ছিল সাহিত্য গান অভিনয় প্রভৃতির আনন্দকোলাহলে ভরপুর। তবে সে যুগে বড়দের ও ছোটদের মধ্যে খুব একটা ব্যবধান ছিল ; জ্যেষ্ঠদের মজলিশে বা জলশায় কনিষ্ঠদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু সেইসব গান বাজনা হৈহুল্লোড়ের ঢেউ ছোটদের কানে এবং প্রাণে তো এসে পৌঁছয়। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য লিখছেন, বন্ধুদের পড়ে শোনান—রবীন্দ্রনাথ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সেসব শোনেন। শুনে শুনে

কাব্যের অনেকখানি তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়—তাঁর শৈশবের কাব্যের মধ্যে স্বপ্নপ্রয়াণের প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

শিশুকাল হতে রবীন্দ্রনাথ সুকণ্ঠ। তিনি বলেছেন, কবে যে গান গাইতে পারতেন না তা তাঁর মনে পড়ে না। দেবেন্দ্রনাথের পরম ভক্ত শ্রীকণ্ঠ সিংহ বীরভূম-রায়পুরের লোক, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জ্যেষ্ঠতাত, কলিকাতায় এলে এঁদের বাড়িতে থাকেন। তিনি গানের পাগল ; সুরে সেতারে মশগুল, মত্ত। কবি লিখেছেন, 'তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না।' বিষ্ণু চক্রবর্তী আদিব্রাহ্মসমাজের গায়ক ; শিশুদের গানে 'হাতে খড়ি' হয় এঁর কাছে—সকাল-সন্ধ্যায়, উৎসবে, উপাসনা-মন্দিরে তাঁর গান শোনেন। বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছেন। আর-একটু বড় বয়সে ঠাকুরবাড়ির ছেলে-মেয়েদের গান শেখাবার জন্য এলেন যদুভট্ট—অসামান্য ওস্তাদ। কিন্তু যাকে বলে মন দিয়ে শেখা বা বিশেষ প্রণালীর মধ্য দিয়ে শেখা, তা রবীন্দ্রনাথের ধাতে ছিল না ; ইচ্ছামত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেতেন ঝুলি ভর্তি করতেন তাই দিয়ে। দাসদাসী কর্মচারী ভিখারি বেদেনি বাউল মাঝিমাল্লা প্রভৃতি বিচিত্র লোককে যখন যা গাইতে শুনতেন তাই শিখে ফেলতেন। এই বিচিত্র রসের গান ও সুর শিশুর মনকে ভরে দিত।

যে ভৃত্যমহলে শিশুদের দিন কাটে, সেই ভৃত্যদের মধ্যে ঈশ্বর বা ব্রজেশ্বর কোনো এক কালে ছিল গ্রামের গুরুমশায়। তার উপরেই ছেলেদের ভার। তখনকার দিনে কলিকাতা শহরে বিজলী-বাতি অজ্ঞাত, কেরোসিনের তেল শুরু হচ্ছে সবেমাত্র ; রেড়ির তেলের সেজের অনুজ্জ্বল আলোর চার পাশে ব'সে বালকেরা ঈশ্বরের রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকা-পাঠ শুনত। তার পর রাত্রির আহার শেষ করে বড় একটা বিছানায় শিশুরা শুয়ে পড়ে—পৃথক্ খাটে আলাদা-আলাদা শোওয়ার রেওয়াজ তখনও হয়নি।

বাড়ির পুরাতন ঝিয়েদের মধ্যে কেউ-না-কেউ ছেলেদের শিয়রের কাছে ব'সে গল্প শোনায়—তেপান্তরের মাঠ দিয়ে চলেছে রাজ-পুত্তুর। শুনতে শুনতে ঘুম আসে।

লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হল 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে। 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটিয়ে প্রথম ভাগের পাতায় প্রথম যেদিন পড়লেন 'জল পড়ে পাতা নড়ে' সেদিন কবির মনে হল, যেন আদি কবির আদি কবিতা শুনলেন। পড়ার বই মুড়ে রেখেও মনের মধ্যে অনুরণন থামল না—'জল পড়ে পাতা নড়ে।'

পড়াশুনা চলে ঘরেই, মাধব পণ্ডিতের কাছে। কিন্তু একদিন বড় ছেলেদের স্কুলে যেতে দেখে বালক রবি কান্না জুড়লেন, তিনিও স্কুলে যাবেন। মাধব পণ্ডিত এক চড় কষিয়ে বললেন, 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্যে যেমন কাঁদিতেছ, না-যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।' কবি পরে লিখেছেন, 'এত বড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।'

যা হোক, কান্নার জোরে ওরিএন্টাল সেমিনারি নামে এক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। কিন্তু সেখানে বেশি দিন পড়েননি: অভিভাবকেরা সকলকেই নর্মাল-স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে পড়াশুনা হত বিলাতী ইস্কুলের অনুকরণে। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-লাভের থিয়োরি অনুসারে ক্লাস আরম্ভ হবার পূর্বে সমস্ত ছাত্র এক জায়গায় সমবেত হয়ে একটা ইংরেজি কবিতা সমস্বরে আবৃত্তি করত। সেই দুর্বোধ্য ইংরেজি গানের ভাষা বাঙালি ছাত্রদের মুখে মুখে কী বিকৃত রূপ পেয়েছিল তা 'জীবন-স্মৃতি'র পাঠক অবশ্যই জানেন। কবির মনে এই নর্মাল-স্কুলের স্মৃতিও মধুর ছিল না।

রবীন্দ্র-জীবনকথা ॥

রবীন্দ্রনাথ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথকে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কি চোখে দেখবে, তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা কল্পনায় মনে আনবে, সেকথা ভেবে দেখতে চেষ্টা করব না। তবে নিশ্চয় জানি, আমাদের যেমন তিনি ছিলেন চির বিস্ময়, তাদের মনেও তিনি জাগাবেন সেই বিস্ময়। তাঁর কাব্য-সৃষ্টিতে যে মহার্ঘ অজস্রতা, বৈচিত্র্যের যে বর্ণছত্র তা মনকে যেমন কাব্যের আনন্দে ভরে দেয়, শক্তির বিরাটত্বে বুদ্ধিকে তেমনই অভিভূত করে। এবং কবিতা তাঁর সাহিত্যের সার হ'লেও সর্বস্ব নয়। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, সমালোচনায় ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রায় সকল দিকের আলোচনায় যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাতে সকল রসের যে সমাবেশ, সকল ভঙ্গির যে প্রকাশ-- তাকে এক মানুষের রচনা বলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই সৃষ্টির ক্ষমতার সামান্য অংশও যার থাকে জীবন ও অনুভূতির আর সব দিক বঞ্চিত করে সে সৃষ্টির আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এর বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। সৃষ্টির এই বিরাট শক্তি ও আকৈশোর তার অতন্দ্রিত প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোনদিক শীর্ণ করেনি; তাঁর অনুভূতির সৌকুমার্য কোথাও কর্কশ করেনি। মানুষের যা কিছু মহৎ, তাঁর পূজা পেয়েছে, যা কিছু হীন, তাঁকে বেদনা দিয়েছে। বিশ্ব-মানবের মৈত্রী তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সব ঘরে যে তাঁর ঠাঁই—সে কেবল তাঁর কাব্যের কল্পনা নয়। যেদেশে তাঁর জন্মভূমি, তার অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও দুর্দশা কবিকে করেছে কর্মী, তার সমস্ত দৈন্য ও হীনতা তিনি যেন নিজের বিরাট মহত্ত্ব দিয়ে লোপ করতে চেয়েছেন। প্রাচীন যেখানে বড়, কোন নবীন তাঁর মনের শ্রেষ্ঠত্ব বোধকে টলাতে পারেনি, নবীন

যেখানে সত্য, কোন প্রাচীনের মোহ তা গ্রহণ করতে তাঁকে বাধা দিতে পারেনি। সমস্ত মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ও মহত্ত্বের তিনি ছিলেন প্রতীক। একাধারে এই মহাকবি ও মহামানব বাস্তবে দেখা না দিলে কল্পনায় সম্ভব হত না।

আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী ও সমসাময়িক—অসম্ভব নয় যে দূর ভবিষ্যতে আমাদের একালের প্রধান পরিচয় হবে যে এটা রবীন্দ্রনাথের যুগ। আজকার দিনের তুচ্ছ ঘটনা, ক্ষুদ্র চেষ্টা, স্বল্প সাফল্য যখন সুদূরের দৃষ্টিতে অলক্ষ্য হবে, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতেই ভাবীকাল আমাদের কালকে জানবে। আমাদের সুখ-দুঃখ নিরাশাআনন্দ তাদের চিত্তকে স্পর্শ করবে তাঁরই কাব্য থেকে। আমাদের সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য হবে জানতে, আমরা কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছিলাম, আমাদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা ব্যাপক ও গভীর ছিল, আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছে। তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে আমাদের একাল অমর হ'য়ে থাকল। সবকালের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে না।

ভবিষ্যৎ কালের লোক মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে জানবে ইতিহাসের সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠায়, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম স্পর্শ তারা পাবে তাঁর কাব্যে, যেমন আমরা পেয়েছি। আজ হতে বহু শতবর্ষ পরে তাদের বসন্ত-দিনও রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-গানে ধ্বনিত হবে, তাদের আষাঢ়ের সজল মেঘের উপর তাঁর বর্ষা-কাব্যের নীল অঞ্জন নেমে আসবে।··রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তারা নিরাশায় উৎসাহ, শোকে সান্ত্বনা পাবে। সেই অনাগত কালের সমমর্মীদের আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠে তাদের আনন্দই এর প্রত্যভিবাদন।

শান্তিনিকেতন

নীহাররঞ্জন রায়

এক দিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের তপোবনে শিশু বালকদের শিক্ষার জন্য এক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; আজ তাহা শতাব্দীর এক পাদ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষাব্যাপারে এমন experiment বাংলা দেশে আর কোথাও হয় নাই, ভারতবর্ষেও হইয়াছে বলিয়া জানি না। প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত লীলার মধ্যে, প্রকাশের অপূর্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে সুকুমার প্রাণগুলি যে স্বেচ্ছাবিকাশের আনন্দ লাভ করে, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষার প্রথম সূচনা কত সহজ, কত স্বাভাবিক, জীবনের বিকাশ কত সুন্দর! তিনি এই বালক-বালিকাদের জন্য এক সময় 'সিলেবাস'-ও হয়ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন, নিজে পড়াইয়াছেন, এমন-কি পাঠ্যপুস্তকও লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই কর্মচেষ্টার মূলে ইহারা অত্যন্ত গৌণ; মূলতঃ তিনি বিশ্বজীবনের লীলার মধ্যে শিশুমনের যে প্রথম আনন্দ সেইটিই ভোগ করিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধির উষার সঙ্গে সঙ্গে এই বালক-বালিকাদল যে প্রকৃতির ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া বিচিত্রভাবে নিজেদের প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে কবির চিত্তই আনন্দে উদ্বোধিত হইয়াছে। এইখানেও তাঁহার কবি-প্রকৃতিরই জয়। ইহাদের সম্মিলিত জীবনধারাকে-ও তিনি একটি সমগ্র কবিতা করিয়া রচনা করিয়াছেন। এই যে আশ্রম-প্রাঙ্গণে নৃত্যগীতে ও বিচিত্র উৎসবের লীলায়, ঋতুতে ঋতুতে প্রাণের উৎসবে ইহারা মাতিয়া উঠে, ইহাদের জীবনের প্রকাশের যে এই সুন্দর সুঠাম রূপ, ইহার মধ্যে-ও তো রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির অভিব্যক্তিই আমি দেখিতে পাই। শিক্ষা সমস্যার কি মীমাংসা এখানে হইয়াছে বা হয় নাই, শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ বিচার অত্যন্ত

গৌণ বলিয়াই আমি মনে করি। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রাণের একটি অপূর্ব প্রকাশ; বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র আনন্দলীলাকে শিশুজীবনে কি করিয়া সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যায়, ইহাদের আনন্দকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া নিজের অন্তরের রসভোগের ক্ষুধাকে, আনন্দের প্রকাশের ব্যাকুলতাকে, অনুভূতির তৃষ্ণাকে সৃষ্টির কার্যে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়, শান্তিনিকেতন তাহারই পরিচয়।···

জয়ন্তী-উৎসর্গ ॥

বহু দিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু॥

৭ই পৌষ ১৩৩৩
শান্তিনিকেতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি ॥

পথের স্মৃতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

উপরে পরিষ্কার আকাশ—ফিকে নীল, ধারে-ধারে দিক্‌চক্রবালের উপরেই সাদা-সাদা মেঘ ; সকালের বাল-সূর্যের মিষ্টি রোদ্দুর সমস্ত উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে ; নীচে সমুদ্রের কালাপানি এখন আর ঘত নীল নয়—সকালে সূর্যের কোমল স্পর্শে তার গাঢ় রঙটাও একটু হাল্‌কা হ'য়ে চমৎকার দেখাচ্ছে—এ যেন একেবারে ভূমধ্য-সাগরের সমুদ্র। কাছে-কাছে, দূরে, সব জায়গায় টগ্‌ব'গে ফেনায় ছোটো-ছোটো ঢেউ ভেঙে প'ড়ছে—এর-ই মধ্যে জল কেটে-কেটে আমাদের জাহাজ চ'লেছে। এই জল কেটে যাওয়ার একটা এক-টানা আওয়াজ বরাবর আমাদের জাহাজের জীবনের background বা চিত্রভিত্তির মতন হ'য়ে র'য়েছে—জলোচ্ছ্বাসের শব্দ, মাঝে-মাঝে যেন একটা সজোর ফোঁস-ফোঁসানি—সমস্ত আওয়াজটা মিশে মনে যে ভাব আনে, সেটা হ'চ্ছে, কবির কথায়, 'অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।'

···কালকের দিনটা বিকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সারা বিকাল আর সন্ধ্যা আমরা উপরের ডেকে রেলিঙের ধারে ব'সে-ব'সে বৃষ্টির কুহেলী দেখে আর জলের উপর বৃষ্টি-বিন্দু-পাতের শব্দ শুনে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার সময়ও মেঘ কাটেনি, যদিও সূর্য অস্ত যাবার কালে এক চমৎকার ফিরোজা রঙের খেলা আকাশে আর সমুদ্রের উপরে দেখেছিলুম ; সন্ধ্যার···আলো-আঁধারিতে কে যেন হালকা নীলের তুলি দিয়ে আকাশ আর সাগরের উপরে এক পোঁছ রঙ বুলিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। আজকের দিনটাও ঐ রকম জলের ঝাপটায় কাট্‌বে ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু ভোরে উঠে প্রসন্ন আকাশ দেখে মনটা খুশী হয়ে গেল।

জাহাজে আমরা চ'ড়েছি পরশু, বেস্পতিবার, ১৪ই তারিখে (১৪ই জুলাই ১৯২৭)। বেলা সাড়ে পাঁচটায় আমাদের জাহাজ ছেড়েছিল—বারবেলা কাটিয়ে, আশা করি। মাদ্রাজ শহরে সকাল আটটায় আমাদের প্রবেশ, সেখান থেকে পাঁচটায় আমাদের প্রয়াণ। ক'লকাতা থেকে তার তুদিন আগে, মঙ্গলবার ১২ই তারিখে আমরা যাত্রা করি। এই মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, তিন দিন ধ'রে একটানা রেলযাত্রা ক'রে আর মাদ্রাজে ঘোরাঘুরি ক'রে, জাহাজে যখন চ'ড়লুম তখন শরীর মন তুই-ই অবসন্ন। জাহাজ ছাড়্তে সকলে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেললুম—অন্ততঃ চার পাঁচ দিন শুয়ে-ব'সে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারা যাবে, এই মনে ক'রে। বিদেশে যাচ্ছি, তিন মাস ধ'রে আমাদের ভারতভূমি বা বঙ্গভূমির মনঃকোকনদ যে আমাদের ক'জন-বিহীন হ'য়ে থাকৃতে পারে সে-কথা আদৌ মনে হয়নি।···

ক'লকাতা থেকে মাদ্রাজ—চল্লিশ ঘণ্টার এই রেলযাত্রা আমরা ···বেশ আনন্দই ক'রেছি। কবি আমাদের পাশের গাড়ীতে একখানা কামরায় তিনি একা ছিলেন। খড়্গপুরে···কবির গাড়ীতে একদল কলেজের আর ইস্কুলের ছেলে ঢুকে প'ড়্ল। এরা মেদিনীপুর থেকে আসছে। কবি আসছেন মনে করে কালকেও এসেছিল, আজ এঁর দেখা পেয়েছে। Autograph hunting বা বড়ো লোকের হস্তাক্ষর সংগ্রহের বাতিক দেখলুম ভীষণ সংক্রামক হ'য়ে প'ড়েছে। ছেলেরা চায় কবির হস্তাক্ষর,—তাঁর সামনে ছোটো বড়ো বাঁধানো খাতা,···এক্সারসাইজ-বুক, ঘরে সেলাই-করা খাতা, চার পাঁচ খানা খুলে ধরা হ'য়ে র'য়েছে দেখলুম। একটা সাহিত্য-রসিক ছেলে চায়, কবি তখনি তু'ছত্র রচনা ক'রে তার খাতায় লিখে দেন। ছেলেদের বিমুখ করতে তিনি চান না, অথচ দেশ-কাল আর শরীর-মন ঠিক কবিতা রচনার উপযুক্ত নয়। তিনি একটু কাতর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে

তাকালেন। মনে প'ড়ল, কে একজন নবীন নাট্যকার যশঃ-প্রার্থী, তার নাটকের গানগুলিতে সুর দেবার জন্য কবির কাছে এসেছিল। বেশী নয়, গোটা বাইশেক গান; প্রত্যেকটিতে সুর দিতে, এমন আর কি, বড়ো আধ-ঘণ্টা করে সময় লাগবে—এটা কি তাঁর স্নেহস্পদ অনুগামীকে বাধিত করবার জন্য তিনি ক'রতে পারেন না? সুখের বিষয়, ছেলে কয়টি উক্ত উদীয়মান নাট্যকারের মতন নাছোড়বান্দা ছিল না; তাদের বাইরে ডেকে নিয়ে এসে মিষ্টি কথায় ব'লতে, তারা সন্তুষ্ট মনে কবিকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। খড়গ্‌পুর থেকে গাড়ী ছেড়ে দিলে; সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, রাত্রিটা কবি নির্বিঘ্নে কাটালেন।···

বুধবার দিন ১৩ই তারিখে সকালটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু দুপুরে এখন অসহ্য গরম হ'ল। অন্ধ্রদেশে কবিব অনুরাগী আর ভক্তের সংখ্যা দেখলুম অনেক। দেখে মন যে খুশী হ'ল না একথা ব'লতে পারি না, যদিও এইসব কবি-দর্শনকামী লোকেদের ভীড় অনেক সময়ে তাঁর পক্ষে মোটেই আরামদায়ক হ'চ্ছিল না।··· প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে লোকে তাঁকে দেখতে পেয়ে উদ্দেশে প্রণাম করছে। আর যেখানে-যেখানে গাড়ী বেশীক্ষণ থেমেছে, সেখানে তাঁর কামরার দরজা খুলে দিতে হ'য়েছে,—লোক ঢুকে তাঁকে প্রণাম ক'রেছে, প্রশংসাবাণী শুনিয়েছে, তাঁর লেখা পড়ে তাদের মনে আনন্দ আর উৎসাহ লাভের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। শ্রদ্ধা আর ভক্তির আতিশয্যে তাঁর গাড়ীর সামনে আগত লোকেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি হ'য়েছে; জায়গায়-জায়গায় আশঙ্কা হ'চ্ছিল যে, লোকে হুড়মুড় করে তাঁর গাড়ীতে ঢুকে না পড়ে।···তেলুগুদের মধ্যে দু'-চারজন পরিচিত লোকও এলেন। এক স্টেশনে কাকনাডা-কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক একটি ভদ্রলোক এলেন; ক'লকাতায় ইনি কিছুকাল ছিলেন,—ক'লকাতায় থাকবার সময়ে বাঙলা শিখে-ছিলেন। একটি তেলুগু মহিলা এসে বাঙলায় কবির সঙ্গে কথা

কইলেন। এই রকম সব লোক এলেন। অন্য অপরিচিত লোকেদের মধ্যে সকলেই বেশ বিনয়ী, শ্রদ্ধাপূর্ণ। একটি স্টেশনে এক ভদ্রলোক গাড়ীর ভিতর লা-পরওয়া ভাবে ঢুকলেন—আর একজন পিছু-পিছু এসে তাঁর পরিচয় দিলেন যে, ইনি স্থানীয় এক ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট। কবির খবর যে ঠিক-মতন ইনি রাখেন তা মনে হ'ল না; কিন্তু উঠেই পরিচিতের মতন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি না কাকনাডার কংগ্রেসে এসেছিলেন?' প্লাটফর্মের ইতরজনের প্রতি সগর্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। আর একটি স্টেশনে একজন বৃদ্ধ তেলুগু ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে হাত জোড় ক'রে কবির সামনে দাঁড়িয়ে তেলুগু ভাষায় কি ব'লতে লাগলেন; শুনলুম ইনি একজন স্থানীয় উকিল, নামটি বায়াম্মা পন্তুলু না কি, তেলুগু ভাষাব একজন কবি; ইনি ভারতের কবিগুরুকে নিজের ভাষায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রতে এসেছেন। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা অন্তর সব জায়গায় এই রকম লোকেদের সঙ্গে শিষ্টাচার ক'রতে ক'রতে যাওয়া, আর তার উপর একেবারে ভাদ্দুরে গুমট—এটা যে কি অস্বস্তিকর তা আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পেলুম। রাজমহেন্দ্রীতে দুশো আন্দাজ কলেজের ছাত্র এসে হাজির। এরা সকলেই কাগজে কবির যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে ভুল খবর প'ড়ে, আগের দিনও স্টেশনে এসেছিল। অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে একটি সাদাসিধে ধরনের লোক জানালা দিয়ে কবিকে লেবু, একটি কাঠের উপর রঙ-করা একাধারে ফুলদানী আর ধূপদানী—তাতে কিছু ফুল, আর কিছু দক্ষিণী ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া আছে,—আর একটি রঙীন্ কাঠের নলে ক'রে ধূপ দিয়ে, নীরব ভাষায় কবির প্রতি প্রীতি জানিয়ে নমস্কার ক'রে ভীড়ের মধ্যে মিশে চ'লে গেল। কবির এই অজ্ঞাত ভক্তের এই রকম নির্বাক অনাড়ম্বর বাহ্য-উচ্ছ্বাসবিহীন শ্রদ্ধা-নিবেদনটি আমাদের বড় ভাল লাগল। রাজমহেন্দ্রী গোদাবরীর উপর। গোদাবরী হ'চ্ছে

দক্ষিণের গঙ্গা—মাহাত্ম্যে গঙ্গার চেয়েও বেশী তো কম নয়; এখানে স্নান ক'রলে বিশেষ পুণ্য-সঞ্চয় হয়; রাজমহেন্দ্রীতে নেমে, একদিন থেকে, স্নান করবার জন্য বিশুদ্ধ-সংস্কৃত-বহুল তেলুগু ভাষায় (যার আশয় বুঝতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হ'ল না) অনুরোধ এ'ল এক পাণ্ডার কাছ থেকে। লোকটি সরেও না, আর তার সঙ্গের কলেজের ছাত্রেরাও তার কথায় সায় দিয়ে মাদ্রাজী কায়দায় মাথা নাড়ে, আর ইংরেজীতে বলে, 'আপনি দয়া ক'রে নামুন, এখানে থাকুন একদিন। আমাদের কিছু বলুন—এ স্থানটি কাশীর চেয়েও বড় পুণ্যক্ষেত্রে—এখানে তো আপনি কখনও আসেননি।' রাজমহেন্দ্রীতে নামা অসম্ভব তা বুঝিয়ে বলা গেল। তখন তারা বলে, 'তাহ'লে কবি আমাদের কিছু উপদেশ দিন—কোনও···বাণী বলুন।' তাঁর বক্তব্য যা বলার তা তো তিনি অন্যত্র ব'লে আসছেন, হঠাৎ স্টেশনে দাঁড়িয়ে পলিটিকাল সর্দারের মতন দু-মিনিটের দাঁড়া-বক্তৃতা দেওয়া তাঁর ধাতে সয় না, এ কথা বলা গেল। পাণ্ডাটি কিন্তু নাছোড়বান্দা—জানালা ধ'রে দাঁড়িয়ে, তার তেলুগু গোদাবরী-মাহাত্ম্য শোনাতে লাগল। আমি এগিয়ে গিয়ে আমার 'বৈয়ী' (অর্থাৎ বি-এ ক্লাস পর্যন্ত পড়া) সংস্কৃত নিয়ে তার উপর চড়াও হ'লুম, যা ব'লতে চাচ্ছ, বাপু হে, সংস্কৃতে বল, আমরা তোমার ভাষা বুঝি না, সংস্কৃত জানো না দেখ্‌ছি—তীর্থগুরু হ'তে এসেছো সংস্কৃত জানো না?' পাণ্ডা সংস্কৃত জানে না, খালি তেলুগু জানে, এই কথা ব'লে রবীন্দ্রনাথের মতন অতবড় যজমান পাকড়াবার আশা নেই দেখে, আর পিছনের ছেলেদের ধাক্কাধুক্কিতে স'রে গেল। ছেলেরা এসেছিল নিজেরাই, এদের বড়োরা তেমন কিছু সংবর্ধনার ব্যবস্থা ক'রে উঠ্‌তে পারেননি। গাড়ী ছাড়বার সময়ে 'রবীন্দ্রনাথ কী জয়' আর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠল।

রাজমহেন্দ্রীর পরেই গোদাবরী নদীর প্রশস্ত হৃদয়—আর লম্বা

রেলের সাঁকো। তখন সন্ধ্যা হ'ল প্রায়। মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। ঘোলা জল, হ'লদে বালির রঙ গোদাবরী, দূরে পাহাড়—দৃশ্যটি চমৎকার লাগল। গাড়ীর খোলা জানালা আর দরজা দিয়ে বেশ মিষ্টিঠাণ্ডা হাওয়া আসতে লাগল। কবির ক্লান্ত শরীরের পক্ষে এই হাওয়া বিশেষ শ্রান্তিহর হ'ল। আমি তখন তাঁরই গাড়ীতে ছিলুম—কবি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললেন, 'আঃ এই হাওয়াটুকুন এসে বাঁচালে। এমনি অবসন্ন ক'রে ফেলেছিল এই গরম আর এই গাড়ীর ঝাঁকানি আর লোকের ভীড়—এখন আর কোন কষ্ট নেই—আমার সব শ্রান্তি যেন এখন দূর হ'য়ে গেল।' দূরে অস্তগামী সূর্যকরোদ্ভাসিত পাহাড়ের আর গাছপালার দৃশ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব'ললেন, 'ছাখো হে, যাই বল, এই দেশের প্রতি স্বাভাবিক নাড়ীর টান ছাড়া, এর সৌন্দর্যের জন্য আরও একটা টান আছে—এ দেশ ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না; মনে হয়, আবার ঘুরে এসে যেন এই দেশেই জন্ম নিই।'

কবির কাছে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসার পরিচয় বহুবার পেয়েছি—কিন্তু দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার পথে তাঁর মুখে এই কথাগুলি আন্তরিক দৃঢ়-আস্থাপূর্ণভাবে শুনে, আমার মন খুবই অভিভূত হ'ল।···

রাত্রি নটার দিকে আমরা বেজওয়াডায় এলুম। সেখানেও খুব লোক-সমাগম। তাঁর কামরা অন্ধকার ক'রে দেওয়া ছিল, তা সত্ত্বেও লোকে তাঁকে খুঁজে বার ক'রলে। আলো জ্বালিয়ে তাঁকে দর্শন দেওয়াতে হ'ল। প্রৌঢ় বয়সের একটি তেলুগু ভদ্রলোক ইংরেজীতে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিলেন, 'আমরা শেক্স্পিয়র প'ড়েছি, কিন্তু আপনাকে পেয়ে আর আমাদের ক্ষোভ নেই, আমরা ঢের বড়ো কবি পেয়েছি।' এঁদের সকলের প্রশস্তির আন্তরিকতা বুঝতে দেরী লাগে না। বেজওয়াডার পরে, কবিকে আর জাগাবার

সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করবার জন্য তাঁর কামরার দরজা বন্ধ ক'রে ছিটকিনি লাগিয়ে দেওয়া হ'ল, আমরাও আমাদের গাড়ীতে এসে শোবার ব্যবস্থা করলুম। সমস্ত পথ জিজ্ঞাসু লোকদের সঙ্গে কিছু কিছু বক্‌তে হ'য়েছিল—যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে যাচ্ছেন কেন, 'বৃহত্তর ভারত'-এর সঙ্গে আমাদের যোগ, বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য কি, কেমন চ'লছে বিশ্বভারতীর কাজ—ইত্যাদি ইত্যাদি।...

দ্বীপময়-ভারত ॥

কবি-স্মৃতি

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

...বোলপুর বা কলকাতায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অসহ্য গরম, দুপুরবেলা চারিদিক রোদে পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু কখনো দরজা জানালা বন্ধ করতেন না। বর্ষার সময়েও দেখেছি হয়তো জানালা খুলে রেখেছেন যাতে অবাধে আসতে পারে 'বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।' যখন বয়স কম ছিল, কালবৈশাখীর মেঘ আকাশে ঘনিয়ে এসেছে, বোলপুরের খোলা মাঠে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। সারাবছর বিকাল থেকে খোলা ছাতে বসে থাকতে ভালোবাসতেন। বিলাতে শীতের জন্য দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে হত তাতে ওঁর মন খারাপ হেয়ে যেত। বলতেন, 'ভালো লাগে না, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।'

বাইরের জগৎটা ওঁকে সত্যিই যেন পাগল করে দিত। তাই লেখবার সময় জানালার কাছ থেকে দূরে সরে বসতেন। আমাদের আলিপুরের বাড়িতে যে ঘরে থাকতেন তার জানালা ছিল পুবদিকে —ঠিক সামনে অনেকগুলি পাম গাছ, তার পরে খোলা মাঠ, পিছনে বট অশোক আর অন্য সব বড়ো বড়ো গাছ। লেখবার সময় টেবিলটাকে ঘুরিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরে বসতেন। বরানগরের বাড়িতে থাকতেন খুব ছোটো একটা কোণের ঘরে। সামনে একটা বড়ো জানালা দিয়ে পুব-দক্ষিণ কোণে দেখা যেত পুকুরঘাট, আম সুপুরির বাগান—তাই ঘরটার নাম দিয়েছিলেন "নেত্রকোনা"। এই ঘরেও লেখবার টেবিলটা রাখতেন জানালার কাছ থেকে সরিয়ে এক কোণে যেখানে দুপাশে দেয়াল, কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। বলতেন, 'খোলা জানালার কাছে বসলে আর আমার লেখা হবে না। আমার মন ঘুরে বেড়াবে ঐ বাইরে দূরে।'

যখন কাজ-কর্ম শেষ হয়ে যেত, তখন জানালার সামনে ইজিচেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন।

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসবের আগে আমি প্রায় দু-মাস শান্তিনিকেতনে ছিলাম। কবি তখন থাকতেন অতিথিশালার দোতলায় পুবদিকের ঘরে। সবচেয়ে ছোটো এই ঘর। সামনে খোলা ছাদ। আমি থাকি পশ্চিম দিকের ঘরে। সে আমলে বাইরের লোকের আসাযাওয়া কম। কবির জীবনযাত্রাও অত্যন্ত সরল নিরাড়ম্বর। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসতেন। আশ্রমের অধ্যাপকেরা কেউ কেউ দেখা করতে আসতেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠত। অধ্যাপকেরা একে একে চলে যেতেন। রাত হয়তো এগারোটা বারোটা বেজে গিয়েছে, তখনো কবি অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন। আমি ঘুমোতে চলে যেতুম। আবার সূর্য উঠার আগেই উঠে দেখি কবি পুবদিকে মুখ করে ধ্যানে মগ্ন।

কোনো কোনো দিন হয়তো অন্ধকার থাকতে মন্দিরে পূবদিকের চাতালে গিয়ে বসেছেন। পিছনে দু-চারজন লোক। সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে হয়তো কিছু বললেন। 'শান্তিনিকেতন' নামক বইয়ের অনেক ব্যাখ্যান এইভাবে মুখে মুখে বলা।

তিরিশ বছরের বেশি এই রকমই দেখছি। শেষ বয়সে যখন রোগশয্যায় অজ্ঞান তাছাড়া কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অসুস্থতার মধ্যেও অপেক্ষা করতেন কখন ভোর হবে। বার বার বলতেন, 'ভোর হোলো, আমাকে উঠিয়ে দাও।' যখন যে বাড়িতে থাকতেন পছন্দ করতেন পুবদিকের ঘর। যাতে প্রথম সূর্যের আলো এসে মুখে পড়ে। জানালা কখনো বন্ধ করতেন না। সূর্য উঠার অনেক আগেই উঠে বসতেন। বলতেন, 'শেষ রাত্রে উঠে রোজ চেষ্টা করি নিজের ছোটো-আমির কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই বড়ো-আমির মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিতে। পারিনে তা নয়,

কিন্তু একটু সময় লাগে।' আমরা বলেছি, 'ক্লান্ত শরীরের আরেকটু শুয়ে থাকলে ভালো হয়।' বলেছেন, 'দেখেছি যে শেষরাত্রে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ তখন সহজে এটা হয়। তাই ঘুমিয়ে এ সময়টা ব্যর্থ করতে ইচ্ছা হয় না। ছেলেবেলায় বাবামশায় রাত চারটের সময় ঘুম থেকে তুলে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করাতেন। এখন ভাবতুম কেন আরেকটু শুয়ে থাকতে দেন না। এখন তার মানে বুঝতে পারি। ভাগ্যিস তিনি এই অভ্যাস করিয়েছিলেন। এতে যে আমাকে কত সাহায্য করে তা বলতে পারি না।'

এই ভোরে ওঠা নিয়ে বিদেশে মজার ব্যাপার ঘটত। নরওয়েতে ওঁর শোবার ঘরের পাশে আমাদের শোবার ঘর। মাঝে একটা ছোটো দরজা। প্রথম দিন সভাসমিতি অভ্যর্থনা সেরে শুতে যেতে দেরি হয়ে গেল। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে শুনি দরজায় টক্‌টক্ আওয়াজ। কবি বলছেন, 'আর কত ঘুমোবে? অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।' ঘরে চারদিকে কালো পর্দা টাঙ্গানো। আলো জ্বেলে ঘড়িতে দেখি রাত তিনটে। তখন গ্রীষ্মকাল, নরওয়েতে সূর্য ওঠে রাত দুপুরে। কবির ঘরেও কালো পর্দা টাঙ্গানো ছিল, কিন্তু শোবার আগেই সরিয়ে দিয়েছেন। মাঝরাত্রে ঘর আলোয় ভরে গিয়েছে আর উনিও উঠে বসেছেন। আমাদের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আর থাকতে না পেরে আমাদের ডেকে তুলেছেন। যাহোক, ওঁকে তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললুম যে, তখন রাত তিনটা। নরওয়েতে ভোরের আলো দেখে ওঠা চলবে না। সকালে চায়ের টেবিলে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হল।

কত কবিতার মধ্যে কবি বলেছেন, 'প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান।'

বলেছেন ;

হে প্রভাত সূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ

তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল ;
প্রভাত-ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত……

ভোরবেলা যেমন, রাত্রে শুতে যাবার আগেও সেই রকম চুপ করে বসে থাকতেন। বলতেন, 'সারাদিনের ছোটখাটো কথা, সব ক্ষুদ্রতা, সমস্ত গ্লানি একেবারে ধুয়ে মুছে স্নান করে শুতে যেতে চাই।' এর মধ্যে কোনো আড়ম্বর ছিল না। এমন কি এই যে প্রতিদিনের ধ্যানের অভ্যাস বাইরের লোকের কাছে তা জানাতেও যেন একটু সংকোচ ছিল। ওঁর নিজের কাছে এর এমন গভীর মূল্য পাছে অন্য লোকের কাছে হালকা হয়ে যায়। যাদের সত্যি শ্রদ্ধা আছে তাদের সঙ্গে নিঃসংকোচে আলোচনা করতেন।

মন যখন বেশি ক্লিষ্ট তখন কোনো কোনো সময়ে নিজের মনে গান করতেন। কুড়ি বছর আগে ৭ই পৌষের উৎসবের সময় কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছু হল না। ৬ই পৌষ সন্ধ্যাবেলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁচেছি। কবি তখন থাকেন ছোটো একটা নতুন বাড়িতে—পরে এ বাড়ির নাম হয় 'প্রান্তিক'। শুধু দুখানা ছোটো ঘর। খাওয়ার পরে আমাকে বললেন, 'তুমি এখানেই থাকবে।' লেখবার টেবিল সরিয়ে আমার শোবার জায়গা হল। পাশেই কবির ঘর। মাঝে একটা দরজা, পর্দা টাঙ্গানো। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন 'অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ।' বার বার ফিরে ফিরে গান চলল, সারারাত ধরে। ফিরে ফিরে সেই কথা 'অন্ধজনে দেহ আলো।' বিকাল থেকে মেঘ করেছিল, ভোরের দিকে পরিষ্কার হল। সকালে মন্দিরের পরে বললুম, 'কাল তো আপনি সারারাত ঘুমোননি।' একটু হেসে বললেন, 'মন বড় পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল।'

রবীন্দ্রনাথ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কলকাতা। তখনও এ শহর ইঁট-কাঠ-পাথরে এমন আঁট ক'রে বাঁধা হয়নি। ডোবাপুকুর গাছপালা মাটি দেখা যেত। কলের ধোঁয়ায় আকাশ এমন কালো হয়ে থাকত না। রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে আসত পাল্কীবেহারার হাঁই-হুই শব্দ, সহিসের হেইও হাঁক। সেদিনকার সেই কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল সব দিক দিয়ে আলাদা। মস্ত সাবেককালের বাড়ি, পুরানো ঐশ্বর্যের স্মৃতি তার সর্বাঙ্গে। বাড়ির কর্তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্ম হবার পর এ বাড়ি থেকে পূজাপার্বণের পাট উঠে গেছে। বাড়িতে তখন দিনবদলের পালা চলেছে ; পুরনো কাল গিয়ে নতুন কাল আসছে। দেবেন্দ্রনাথ সংসারে থাকলেও আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিভোর। বাড়িতে প্রচুর লোক ; সবাই মুখ বুঁজে যে যার কাজ নিয়ে আছে। দেবেন্দ্রনাথের কোন শাসন নেই, শুধু আদর্শ দিয়ে সবাইকে তিনি নিয়মে সংযমে বেঁধেছেন। এ বাড়ির চালচলন সংস্কারমুক্ত ; চিন্তা স্বাধীন। বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বভাব অনেকটা তাঁর বাবার মত। গণিতে আর সঙ্গীতে তাঁর রীতিমত দখল, কবিতা লেখেন, ছবি আঁকতে পারেন, নাটকের শখ আছে, দর্শনের বিষয় নিয়ে চমৎকার গদ্য লেখেন ; বাংলা শর্টহ্যাণ্ড তাঁরই প্রবর্তন। মেজো ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পাস-করা আই. সি. এস. ; সাহিত্যে তাঁরও উৎসাহ। পরের দুটি ছেলের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ; গান লেখেন, ছবি আঁকেন, নাট্যচর্চা করেন, ফরাসী ও সংস্কৃত থেকে বই অনুবাদ করেন। মেয়েদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী উপন্যাস লেখেন। বাড়িতে নিভৃতে মজলিস বসে। গানবাজনা হয়, সাহিত্যচর্চা চলে, আর সেই সঙ্গে দেশোদ্ধারের জল্পনা কল্পনা হয়। একই চত্বরের

মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের ভাইয়ের বাড়ি; সে বাড়ির ছেলে শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ আর শিল্পী-সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ।

সংসারের এই পরিবেশে বড় হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সাত ছেলের মধ্যে সকলের ছোট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুরবাড়ি ছিল সেকালের বাঙালী সমাজের একেবারে একপাশে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত—সমাজের শাসনের বাইবে; এ বাড়ির শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ভাব সব আলাদা। এ গণ্ডীঘেরা জগতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মনের অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। ছেলেবেলায় কখনও একা বাড়ির বাইরে না যাওয়ায় বাইরের জগৎটা ছিল তাঁর কাছে অজ্ঞাত রহস্যে ভরা। বাস্তবের সেই অভাব তিনি কল্পনায় ভরিয়ে নিতেন। খুব ছোট বয়সে গোলাবাড়িতে একটা বাখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তেন আর মনে করতেন একটা কোন রহস্য বার হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, জলের ওপরকার আলোছায়া, চিলের ডাক, রাস্তার শব্দ, ভোরবেলার বাগানের গন্ধ নানা মূর্তি ধ'রে তাঁর সঙ্গ নিত।

বাইরের প্রচলিত সমাজের রীতিনীতির বেড়া ভাঙবার জন্যেই ঠাকুরবাড়িকে একঘরে হতে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ সে বাড়িকে ভেতর থেকে-নিয়মে সংযমে বেঁধে দিলেন—বাইরের শাসন দরকার হল না। জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে এল ঠাকুর-পরিবারে মনের মুক্তি। বালক রবীন্দ্রনাথকেও সে বংশে জন্মে কুনো একঘরে হতে হয়েছিল। বাইরের বস্তুময় গতিময় জগতের সঙ্গে মেলবার জন্যে তাঁর মনের মধ্যে আনচান ক'রে উঠল। মনের সেই দুরন্ত আক্ষেপ তাঁর কল্পনাকে নাড়িয়ে তুলল। বাইরের সেই বেড়া ভেঙে দিয়ে কল্পনা উদাও হল—

…শুরু হল আমার ভাঙা ছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মত; বালকের যা তা এলোমেলো গাঁথুনি। এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত।

ছেলেবেলার এই পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টির ভেতর বন্ধন আর মুক্তি, সীমা আর অসীম, দেহ আর মন, বস্তু আর গতির দ্বৈত লীলা ফুটিয়ে তুলেছে। বিশ্বচরাচরকে, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকে এই একটি সূত্রে গেঁথেছিলেন ব'লেই রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তিনি আমাদের জীবনেরও সংগঠক। কথা আর কাজ, বস্তু আর প্রতীক তাঁর কাছে আলাদা থাকেনি। 'জীব-স্মৃতি'তে তার ইতিহাস আছে।

…আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরে গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল-সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া চলিয়াছে।…

সামান্য কিছু করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে গতি-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনও লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই —এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমগ্রকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ-চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম।

এগারো-বারো বছর বয়স থেকে আঠারো-উনিশ বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য বা কাব্যনাট্য লিখেছেন, তার সংখ্যা কম নয়। তবে প্রকৃতপক্ষে তার পর থেকেই তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হল ব'লে ধরা হয়। এই ষাট বছরের সাহিত্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ দু'হাজারের ওপর গান, এক হাজারের ওপর কবিতা, ছোট-বড় প্রায় পঞ্চাশটি নাটক-নাটিকা-প্রহসন, ছোট-বড় শতাধিক গল্প, দশ-বারোটি

উপন্যাস, ভাষা-সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাস-বিজ্ঞান নিয়ে অজস্র প্রবন্ধ, রসরচনা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, রকমারি টুকরো লেখা লিখেছেন; সেই সঙ্গে গান গাওয়া, অভিনয় করা, ছবি আঁকা, দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া, দেশে দেশে ঘোরা। কারো একার জীবনে এত দিকে এত কাজ করা যে সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ না জন্মালে বিশ্বাস হত না। রবীন্দ্রনাথই দেখিয়ে দিলেন এদেশে কবি হয়েও কাজের লোক হওয়া যায়। তাই বাঙালীর শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমাজে রাজনীতিতে আন্দোলনে সংগঠনে চলায় বলায় ধ্যানে জ্ঞানে রুচিতে অনুভূতিতে এর আগে এমন ক'রে আর কেউ ছাপ ফেলতে পারেনি।

বাংলা সাহিত্যের সেকাল ও একাল ॥

বালক রবীন্দ্রনাথ

সেই আশ্চর্য দেশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেক অনেক আগের, অনেক অনেক দূরের এক আশ্চর্য দেশ আছে যেখানে আকাশ সব সময়ে স্বপ্নের মত নীল, যেখানে অন্ধকার আদরের মত নরম, যেখানে পলকে পলকে বুকদোলান উত্তেজনা, পথে পথে আচমকা খুশি।

এই আশ্চর্য অনেক আগের দেশের নাম আমাদের ছেলেবেলা।

এই ছেলেবেলার স্বর্গে একদিন আমরা সবাই থাকতে পাই, কিন্তু এমনি সে দেশের কড়া আইন যে একবার বড় হয়েছ কি সেখান থেকে জন্মের মত বিদায়।

এ নির্বাসনের সাজা যে কত বড় তা আমরা কেউ কেউ সারা জীবনেও টের পাই না। আমরা বড় হওয়ায় বুড়ো হওয়ার অহঙ্কারেই খুশি হয়ে থাকি, ফাঁকা একটু নাম করে তুচ্ছ দুটো পয়সা জমিয়ে মনে করি কি না যেন হয়েছি! জানতেও পারি না যে যত বড় আর যত বুড়ো হই, নাম আর ঐশ্বর্যের চূড়ো যত উঁচু হয়ে ওঠে ততই আকাশ আর ছবিটি আমাদের ছোট হয়ে আসে, জীবনের সব রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

কিন্তু সবাই ত তেমন নয়। এমন অনেকে আছেন যে বয়স বাড়লেও বুড়ো হতে যাঁরা জানেন না, চুলে পাক ধরলেও ছেলে-বেলার দেশের আইন যাঁদের ঘাড় ধরে বিদেয় করবার ফাঁক পায় না। তাঁদের বয়সটা শুধু হিসেবের খাতায় জমা হতে থাকে, মনটা থাকে নদীর স্রোতে চাঁদের আলোর মত সব টানের বাইরে, আলগায়, আলগোছে। কালের স্রোত সবই বয়ে নিয়ে যায়, পারে না শুধু তাঁদের মনের অফুরন্ত ঝলমলানি।

সময়ের শাসন-ছাড়ান এই যে সমস্ত আশ্চর্য মানুষ, তাঁদের

মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য বুঝি আমাদের রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সমস্ত জীবনটাই একটা বিশাল ছেলেবেলা, সেখানে আকাশের আলো কখনো ম্লান হয়নি, অজানা তেপান্তর কখনো ফুরিয়ে যায়নি। কীর্তি ক্ষমতা ঐশ্বর্য কোন কিছুর সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাঁকে বাঁধতে পারেনি। সব ডিঙিয়ে তাঁর মন সেই প্রথম অপরূপ বিস্ময়, সেই আদিম উত্তেজনার রোমাঞ্চ শেষ দিনটি পর্যন্ত সজাগ রেখেছিল।

আমাদের সকলের সমবয়সী এই যে চিরকালের ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথ মোটা অঙ্কের হিসেবে এঁর একটা ছেলেবেলা অবশ্য ছিল। তারিখ সাল ধরে বিচার করলে সেটা প্রায় নব্বই বছর আগেকার কথা।

সেই নব্বই বছর আগে কি রকম ভাবে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছিল তার কথা জানতে নিশ্চয়ই তোমাদের ইচ্ছে করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা লিখেছেন। তোমরা তাঁর লেখা থেকেই সে কথা জানতে চাইবে এই আশায় ইসারায় তোমাদের মনকে একটু হাতছানি এখানে দিয়ে যাচ্ছি।

নব্বই বছর আগে! তখনকার কলকাতা সহরের চেহারা তোমরা ভাবতে পারো! পারো না বোধ হয়! মোটর, ট্রাম, বাস! কেউ তখন কল্পনাও করেনি। জলের কল, গ্যাসের আলো, বিজলি বাতি— স্বপ্নেরও অগোচর!

ছিল শুধু শ্যাকরা গাড়ি আর পাল্কি। রাস্তার ধারে বাঁধানো নল দিয়ে গঙ্গা থেকে আসতো বড় লোকের বাড়ির পুকুরে জল। কেরোসিন তখন পাতালপুরী থেকে উদ্ধার হয়নি বলে গরীব বড়মানুষ সবার ঘরে জ্বলতো রেড়ির তেলের আলো।

সেই আশ্চর্য কলকাতা সহরের একটি বিরাট বনেদী বাড়িতে একটি সাত আট বছরের ছেলের মন সবে তখন কল্পনার পাখা মেলতে সুরু করেছে। নবাবী আমলের একটা পুরোন ভাঙা বরখাস্ত করা পাল্কি থাকে অবহেলায় বাড়ির উঠোনে পড়ে। তারই

ভেতর সবার অগোচরে সেই ছেলেটির প্রথম কল্পনা প্রয়াণ সুরু হয়।

'একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পাল্কি, হাওয়ায়-তৈরি বেয়ারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে, সেই পথে চলছে পাল্কি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে-সব দেশের বইপড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনও বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভেতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করছে, গা করছে ছম্‌ছম্। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম, ব্যাস্, সব চুপ। তার পর এক সময়ে পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খী ; ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্ ; ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, 'সামাল সামাল, ঝড় উঠল।' 'হালের কাছে আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া।'

যাঁর কল্পনা একদিন সমস্ত পৃথিবীকে দুলিয়ে দেবে তাঁর ছেলেবেলার এই স্বপ্নদেখা খেলা আমার তোমার কারুর চেয়ে খুব অন্যরকম কি ? এরকম খেলা তোমরাও খেলো, আমরাও হয়ত খেলেছি।

কিন্তু আমাদের পুরোন পাল্কি একদিনের খেলায় সাগরের ঢেউএর নোনা ফেনার স্বাদ পেয়েও শেষ পর্যন্ত সেই পুরোন পাল্কিই থেকে যায়। আমাদের নিজেদের মাপেই তার মাপ ঠিক হয়ে যায় এবং একদিন হঠাৎ বড় ও পরম বিজ্ঞ হয়ে আমরা আবিষ্কার করে ফেলি যে সেটা নেহাৎই পুরোন পাল্কি, অবহেলার চোরকুঠুরি বা ভাঙা আসবাবের বাজারে তার স্থান।

কিন্তু ছেলেবেলা তাঁর কোন দিনই ফুরিয়ে যায়নি, তাঁর ছেলেখেলার পাল্কি তাঁরই সঙ্গে নব নব রূপে আশ্চর্য থেকে আরো আশ্চর্য মেঘেছোঁয়া কল্পনায় পাল তুলে অজানা সাগরে সাগরে নীল দিগন্ত সন্ধান করে ফিরেছে।

ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে ব্যবস্থা ছেলেরা নিষ্ঠাভরে মেনে চলতেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মর্নিং-ওয়াক! শীত-গ্রীষ্ম কোনো কালেই তা বাদ যেত না। মর্নিং-ওয়াকে দু'চারজন সঙ্গীও মিলেছিল। ভোর হবার আগেই মুখ হাত ধুয়ে সব বেরুনো; কোনদিন রেসকোর্স, কোনদিন উত্তরে দক্ষিণেশ্বর, কোনদিন দমদমা। রোজই তিন-চার মাইল করে বেড়ানো। বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে শীতকালে চা-জলখাবার, শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে চা খাওয়া ছিল বারণ। জলখাবার খেয়ে পাঠশালায় এসে পড়তে বসা। ঠাকুর-দালানে পাঠশালা, কালি-পড়া মাদুরে বসে পড়াশুনা। বাড়িতে একজন গুরু মহাশয় ছিলেন। প্রথমে তাঁর কাছে বসে বাঙলা আর ধারাপাত পড়া। গুরু মহাশয়ের একগাছি বেত ছিল। বেতটি সব সময়ে তাঁর পাশে থাকতো। পড়ায় অমনোযোগী হলে বা দুষ্টামি করলে সেই বেত পিঠে পড়তো। একদিন হেমেন্দ্রনাথ বেত-গাছটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। বেত না পেয়ে গুরু মহাশয় যেন পুত্রশোক পেয়েছেন, এমন কাতর! বহু কাকুতি-মিনতি করায় হেমেন্দ্রনাথ বেতটি ফিরিয়ে দিলেন; তখন গুরু মহাশয় ধাতস্থ হন!

গুরু মহাশয়ের কাছে পড়া শেষ হলে ঘরে এসে ইংরেজির মাস্টার মহাশয়ের কাছে টেবিলে বসে ইংরেজি পড়া করতে হতো।

পড়ার পর বাড়ির পিছন দিকে যে পুকুর, সেই পুকুরে স্নান। স্নানের সময় সাঁতার কাটতে হতো। সাঁতারের ধূমে জল ছেড়ে কোনো ছেলে উঠতে চাইতেন না! ধমকানি দিয়ে জল থেকে সকলকে তুলতে হতো। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথ—সকলেই সাঁতারে বেশ পটু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সাঁতারে কারো চেয়ে কম ছিলেন না।

ব্যায়ামের জন্য জিমনাষ্টিক, প্যারালেল বার, রিঙ, হোরিজণ্টাল বার তো ছিলই ; তার উপর এক পালোয়ান ছিল—হীরা সিং। এই পালোয়ানের কাছে সকলকে কুস্তি শিখতে হতো।···

এ-বাড়িতে গান-বাজনার রেওয়াজ বহুকাল থেকে। বিখ্যাত গায়ক, সেতারী, পাখোয়াজী প্রভৃতি এ-বাড়িতে চিরকাল রাজার খাতির পেয়ে এসেছেন। ওস্তাদদের গান-বাজনার আসরে ছেলেদের ছিল অবারিত দ্বার।···জোড়াসাঁকো বাড়িতে এ সময়ে তিনজন বড় গায়কের খুব খাতির ছিল—রমাপতি বন্দোপাধ্যায়, শান্তিপুরের বিখ্যাত জমিদার রাজচন্দ্র রায় এবং যদু ভট্ট। রমাপতি শুধু গান গাইতেন না গান লিখতেনও। তাঁর লেখা অনেক গান তখন এদেশে বেশ চলতি হয়েছিল।···জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিয়াই হইয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল বছর। বাড়িতে এই সাহিত্য এবং গানবাজনার সমারোহ তাঁর মনকেও জাগিয়ে তুললো। বাড়িতে টিউটরদের কাছে তিনি তখন ইংরেজি, বাঙলা, সংস্কৃত—সব ভাষায় লেখাপড়া শিখছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গতা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবিতা লিখতেন, গান লিখতেন এবং যেমন যেটুকু লেখা হতো রবীন্দ্রনাথকে দেখাতেন, কবিতা লেখায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিতেন—এমনি করেই কবিতা লেখায় রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি।

দেশে জাতীয়তার ভাব জাগিয়ে তোলবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন রানী পদ্মিনীর উপাখ্যান নিয়ে 'সরোজিনী' নাটক। যেমন যেটুকু লেখেন, রবীন্দ্রনাথ পড়েন, শোনেন এবং পড়ে রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে নানা চিন্তা, নানা কল্পনা করেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও suggestions দেন। সরোজিনীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশের দৃশ্য

লেখবার সময় সরোজিনীর মুখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেশ ক'টি সতেজ বাক্য দিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের তা পছন্দ হয়নি। তিনি দেন suggestion—না, কথা নয়, এখানে একটি গান চাই। এবং এ suggestion দেবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে গানের ক' ছত্র লিখলেন। 'সরোজিনী' নাটকের সেই বিখ্যাত গান—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা!

এই গান গাইতে গাইতে রাজপুত পুরনারীদের সঙ্গে রানী সরোজিনী চিতার আগুনে ঝাঁপ দেবেন!

তখনকার এই আবহাওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের আবহাওয়া বহিত। মনে পড়ে, যখন শিশু ছিলাম, বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম; সন্ধ্যায় বৈঠকখানা-বাড়িতে আলো জ্বলিতেছে, লোক চলিতেছে, বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কী হইতেছে, ভাল বুঝিতাম না—কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম···আমার খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রনাথ তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না।'

যে বাড়ির এমন আবহাওয়া, সে বাড়ির ছেলেমেয়েরা সে আবহাওয়ার গুণে নিজেদের গড়ে তোলবার কতখানি সুযোগ পায়, সহজেই তা বোঝা যায়; তবে সে আবহাওয়াকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করবার মত মন এবং শক্তি থাকা প্রয়োজন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি।

বাবা ও ছেলে

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। কবির বয়স তখনও পূরো বারো হয় নি। মহর্ষি অনেকদিন পরে কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি তখন প্রায়ই দেশভ্রমণে বাইরে বাইরে কাটাতেন। মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য বাড়িতে ফিরে আবার বেরিয়ে পড়তেন। তাই ছেলেবয়সে কবি বাবার কাছে বেশি দিন থাকতে পাননি। এবার দেশে ফিরে মহর্ষি তাঁর উপনয়ন দিলেন। নতুন ব্রাহ্মণ হবার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে রবীন্দ্রনাথের খুব ঝোঁক পড়ল। তিনি খুব যত্নের সঙ্গে আওড়াতে লাগলেন, "ভূর্ভুবঃ স্বঃ"। এই মন্ত্রের পূরো অর্থ অবশ্য বুঝতে পারতেন না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? 'কী বুঝিতাম কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরের যে জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোন বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্ত একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিছু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি।'

কিন্তু মুশকিল বাঁধল মন্ত্র নিয়ে নয়, মুড়ানো মাথা নিয়ে। স্কুলে ফিরিঙ্গি ছেলের দলের সামনে এ মাথা নিয়ে কেমন করে হাজির হবেন! ভয়ানক ভাবনায় তাঁর দিন কাটতে লাগল।

—কর্তামশায় আপনাকে ডাকছেন।—তকমাওয়ালা পাগড়ি আর সাদা চাপকানপরা বুড়ো কিনু হরকরা এসে খবর দিলে!

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির ঘরে গিয়ে হাজির হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সঙ্গে হিমালয়ে বেড়াতে যাবে ?

এ কথা শুনে কবি যেন হঠাৎ আকাশভাঙা চাঁদখানা হাতে পেলেন। আনন্দের আবেগে তাঁর ইচ্ছা হল প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠেন, হ্যাঁ যাব, হ্যাঁ যাব।

ঘরকুনো রবীন্দ্রনাথের এতদিন বেশির ভাগ কেটেছে ঠাকুর-বাড়ির পাঁচিল ঘেরার মধ্যে। বাইরেটা দেখার বেশি সুযোগ হয়নি বলেই বাইরেটা তাঁকে ডাক দিত দুর্নিবার আকর্ষণে। 'বাইরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক, বাইরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়ত সেই কারণেই সহজ ছিল।' তাঁর আকাশে-বাতাসে চরে-বেড়ানো মন সুযোগ পেলেই বাড়ির উঠান বেয়ে সামনের ছাদ ডিঙিয়ে স্বপ্নের দেশদেশান্তরে ছুটিয়ে দিত আপন ডিঙি। এতদিন পরে সম্ভাবনা হল বাইরের সেই অজানা পৃথিবীকে চোখ দিয়ে দেখবার।

যাত্রার আয়োজন একে একে শেষ হল। হুকুম পেয়ে দরজী মাপ নিয়ে তাঁর জামাকাপড় তৈরি করে দিলে। এভাবে পোশাক তৈরি রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই প্রথম। মহর্ষির সংসারে ছেলেমেয়েদের ভোগবিলাসের মধ্যে মানুষ হবার রীতি ছিল না। কবির ছোটবেলা কেটেছে নিতান্ত সাদাসিধাভাবে। 'আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়-চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনও দিন কোনও কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল।'

নতুন জামাকাপড় পরে রবীন্দ্রনাথ বাবার সঙ্গে প্রথম এসে হাজির হলেন বোলপুরে। এই বোলপুরের একটু ইতিহাস আছে।

সেই ইতিহাসটুকু জানা একান্ত দরকার কারণ বোলপুরই পরে শান্তিনিকেতন হিসাবে তাঁর জীবনকথার গল্পে এক প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়াবে।

সে এক বিরাট প্রান্তর। চারিদিকে কেবল ধুধু করছে বালি। পুবপশ্চিম উত্তরদক্ষিণে না আছে লোকের বসতি, না কোনও প্রাণীর চিহ্ন। কলকাতা থেকে প্রায় এক শো মাইল দূরে বোলপুর গ্রাম, সেই গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে এই মাঠ। গাঁয়ের লোকেরও মাঠ পার হতে গা ছমছম করে—এমন ভয়ঙ্কর সেই মাঠ। ডাকাতের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে খুব কম লোকেই সে মাঠ পার হয়েছে। সাধক মহর্ষির মনে তখন তীব্র ব্যাকুলতা, সাধনার সিদ্ধির আশায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে একদিন পাল্কি চড়ে এসে হাজির হলেন সেই মাঠে। মাঠের কোনও দিকে গাছপালার চিহ্ন নেই, শুধু মাঝ পথে এক জায়গায় দু-চারটে বড় বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরে ক্লান্ত হয়ে সঙ্গের লোকেরা পাল্কি নামালে সেই জায়গাটায়। মহর্ষি এসে বসলেন একটা ছাতিম গাছের তলায়। হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল, তাঁর ভিতরের বেদনা দূর হল, মন ভরে জেগে উঠল শান্তি।

পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই ভূখণ্ডটি কিনে তিনি একখানি বাড়ি তৈরি করালেন। শহরের ভিড় ও কোলাহল থেকে পালিয়ে এসে প্রায়ই এখানে ধ্যান-জপে দিন কাটাতেন।

বোলপুরের কুঠির দুপাশে খোলা মাঠে আছে অসংখ্য ছোট ছোট নুড়ি আর কাঁকুরে বালির ঢিপি। বর্ষার জল নেমে তাদের পাশে পাশে নানা আকারের খাদ তৈরি হয়েছে। দূর থেকে মনে হয় যেন বামনদের দেশের অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়ের মালা আর সরু সরু নদী উপনদীর রেখা। সেই জায়গাটাকে লোকে বলে খোয়াই। বালক রবীন্দ্রনাথ আপন মনে সেই খোয়াই-এর মধ্যে

বেড়াতেন। তাঁর যেন মনে হত, তিনি এক অজানা মরুর দেশে এসে পৌঁচেছেন। তাই অভিযানকারীর উৎসুক আগ্রহ নিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারের আশায় মেতে উঠতেন। মহর্ষি ছেলেকে চোখে চোখে রেখে অবাধ সঞ্চরণের আনন্দ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতেন না। এ করো না ও করো না বলে ছোট ছেলের মনকে পঙ্গু করে রাখতে ভালবাসতেন না। ছেলে যা করতে চাইতেন তাতেই বরং উৎসাহ দিতেন—আপনা থেকে তাঁর বিচারবুদ্ধি, স্বাধীন মতামত যাতে গড়ে ওঠে তার চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথ খোয়াই-এ বেড়াতে বেড়াতে নানা ধরনের নানা আকারের পাথরনুড়ি জামার আঁচলে ভরে বাবার কাছে নিয়ে এসে হাজির করতেন। মহর্ষি ছেলের এই অধ্যবসায়কে অকাজ বলে উপেক্ষা করতেন না। তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, কি চমৎকার পাথর, এসব তুমি কোথায় পেলে ?

মনের আনন্দে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠতেন, খোয়াই-এ এমন কত হাজার হাজার আছে, আমি রোজ আপনাকে এনে দিতে পারি।

—তাহলে ত বেশ হয়!—কুঠির পাশে পুকুরের ওপারে একটি মাটির স্তূপ ছিল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে মহর্ষি কথা শেষ করতেন ঃ তুমি কেন এমনি পাথর দিয়ে আমার ঐ ঢিবি পাহাড়টা সাজিয়ে দাও না।

খোয়াই-এর মধ্যে এক জায়গায় মাটি চুঁইয়ে একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হয়েছিল। সেই জল উপচে উঠে ঝির-ঝির করে বালির মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়ে মহর্ষিকে এসে বললেন, বাবা, একটা ভারি সুন্দর জলের ঝরনা দেখে এসেছি। সেখান থেকে আমাদের নাওয়া-খাওয়ার জল আনলে ত বেশ হয়।

—সে ত বেশই হয়।—মহর্ষি ছোট্ট লিভিংস্টনের আবিষ্কার-বৃত্তিকে উৎসাহ দেবার জন্য সেখান থেকেই জল আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

একদিন ছেলের মনে দায়িত্ববোধ জাগাবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের দামী সোনার ঘড়িটা দিয়ে বললেন, রোজ ঘড়িটাতে দম দেবার ভার রইল তোমার।

রবীন্দ্রনাথ বেশ যত্ন করেই ঘড়িটিতে দম দিতেন, কিন্তু ছোট হাতের যত্নের প্রাবল্যে কিছুদিনের মধ্যেই তার স্প্রিং গেল কেটে। দেবেন্দ্রনাথ মেরামতের জন্য তা কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু ছেলেকে একটুও বকলেন না। তিনি রোজ ছেলের কাছে দু-চার আনা পয়সা রেখে দিতেন। সকালে বেড়াতে যাবার সময় ভিখারী দেখলে তাঁকে বলতেন, ভিক্ষে দাও। সন্ধ্যেবেলায় আসত হিসাব দেবার পালা। অনেকদিন রবীন্দ্রনাথ জমাখরচ কিছুতেই মেলাতে পারতেন না। একদিন ত হিসাব নিতে গিয়ে দেখা গেল তহবিল বেড়ে গেছে। মহর্ষি হেসে বললেন, তোমাকেই দেখছি আমার জমিদারির কেশিয়ার করতে হবে। তোমার হাতে টাকা বেড়ে ওঠে।

কিশোর কবি একটি ছোট নারিকেল গাছের তলায় কাঁকুরে মাটির উপর পা ছড়িয়ে বসে প্রায়ই বাঁধানো খাতাটিতে কবিতা লিখতেন। শহরের বদ্ধ পরিবেষ্টন থেকে এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে তাঁর কল্পনায় লেগেছিল মুক্তির দোল! কত রকমের ভাব তাঁর মনে জমা হয়ে উঠত। কত অজানা কথা এসে হাজির হত তাঁর কলমের মুখে।

বোলপুর থেকে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর হয়ে তাঁরা এসে পৌঁছলেন অমৃতসরে। পথে একটা মজার ঘটনা ঘটে। তাঁদের ট্রেন এসে তখন থেমেছে একটা বড় স্টেশনে। গাড়িতে উঠে একজন টিকিট পরীক্ষক বললে, আপনার টিকিট? রবীন্দ্রনাথের ছিল ছেলেদের টিকিট। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখে পরীক্ষকের যেন সন্দেহ হল। সে অবশ্য আর কিছু না বলে চলে গেল। তারপর নিয়ে এল আর একজন পরীক্ষককে। দুজনে গাড়ির

দরজার কাছে উসখুস করে ঘুরে চলে গেল। শেষে এসে হাজির স্বয়ং স্টেশন মাস্টার। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভাল, বাড়ন্ত গড়ন তাঁর দিকে চেয়ে এবার সোজা প্রশ্ন হল, এই ছেলেটির বয়েস কি বার বছরের বেশি নয়?

মহর্ষি জবাব দিলেন, না।

স্টেশন মাস্টার সে কথায় বিশ্বাস না করে বললেন, এর জন্যে পূরো ভাড়া দিতে হবে।

টাকা বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে বলবেন—এই সন্দেহ করায় মহর্ষির দুচোখ জ্বলে উঠল। তিনি সে ভাব চেপে একখানা নোট বার করে দিলেন। ভাড়ার টাকা কেটে নিয়ে তারা বাকিটা ফিরিয়ে দিতে এসে বললে, এই নিন।—মহর্ষি তা হাতে করে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে টাকাগুলো ঝনঝন করে বেজে উঠল।

অমৃতসর থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁরা এসে পৌঁছলেন ড্যালহৌসি পাহাড়ে। তখন চৈতালী ফসলের সময়। পাহাড়ের স্তরে স্তরে কে যেন সৌন্দর্যের ঢেউ লাগিয়ে দিয়ে গেছে। কোথাওবা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুঁড়িওলা বুড়ো গাছ ঝাঁকড়াঝাঁকড়া ডালপালার ভার নিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও ঝরনার ধারা শেওলা-কাল পাথরগুলোর গা বেয়ে কুলকুল শব্দে ঝরে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়ে ব্যগ্র হয়ে সেই সব দৃশ্য দেখতেন। উপত্যকার বিস্তৃত কেলুবনে একলা-একলা আপনমনে লোহার ফালআঁটা লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াতেন।

মহর্ষি তাঁকে বিছানা থেকে তুলে দিতেন খুব ভোর বেলা। ঘোর অন্ধকার তখনও দিকে দিকে জড়িয়ে থাকত। রবীন্দ্রনাথ উঠে সংস্কৃত পড়তে বসতেন। ততক্ষণে মহর্ষির উপাসনা শেষ হত। সূর্য উঠলে ছেলের সঙ্গে তিনি আর একবার উপাসনায় বসতেন। তারপর তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বার হতেন। ফিরে

এসে ঘণ্টাখানেক চলত ইংরেজি পড়া। দশটার সময় রবীন্দ্রনাথ বরফগলা, কনকনে জলে স্নান করতেন। ঠাণ্ডা জলে স্নানের বিষয়ে মহর্ষি ছিলেন ভীষণ কড়া। এক একদিন ছেলের ভীষণ কষ্ট হত। মহর্ষি তা বুঝতে পেরে তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য নিজে ছেলেবয়সে কিরকম ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন তার গল্প বলতেন।

দুপুরে খাবার পর আবার পড়া শুরু হত। সন্ধ্যাবেলা ব্রহ্মসঙ্গীত। পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে উঠত একটির পর একটি অগণ্য তারা। কখন বা মহর্ষি তাঁকে গ্রহতারকা চিনিয়ে দিয়ে জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। কখন বা বলতেন তাঁদের সময়কার সেকালে বড়মানুষির মজার মজার গল্প। তিনি ছেলের মিষ্টি গলার ব্রহ্মসঙ্গীত শুনতে খুব ভালবাসতেন। অনেকদিন সন্ধ্যে হয়ে এলে বাগানের সামনের বারান্দায় এসে বসতেন, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। রবীন্দ্রনাথ হয়ত গাইতেন,

'তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে,
কে সহায় ভব অন্ধকারে।'

মহর্ষি মাথা নীচু করে কোলের উপর দুই হাত জোড় করে রেখে স্থির হয়ে সেই গান শুনতেন।

এই হিমালয়ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে খুলে দিয়েছিল এক নতুন ঋতু। একলাএকলা পাহাড়েপাহাড়ে ঘুরে তিনি যে মুক্তির আনন্দ পেয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি মুক্তি পেলেন বাড়িতে ফিরে। প্রায় চার মাস বাইরে কাটিয়ে কলকাতায় এসে দেখলেন, হঠাৎ কে যেন তাঁর বন্দীজীবনের বন্ধ আগল দু ফাঁক করে খুলে দিয়েছে। আর যেন তিনি সেই আগেকার ছোট ছেলে নেই। মেয়েদের মহলে বড়দের বৈঠকে তাঁর যাতায়াতে নেই আর কোন বাধা। কিছুদিন ত তিনি ঘরে ঘরে ভ্রমণের গল্প করে বেড়াতে লাগলেন। ছোট ঘটনাকে কখন কখন এমন রংচঙিয়ে গল্প তৈরি করতেন যে

তা শুনে মা বৌদি সকলেই অবাক হয়ে যেতেন। একবার কিন্তু বড় বিপদে পড়েছিলেন। মহর্ষির কাছে 'ঋজুপাঠ' বলে একখানা বই পড়েছিলেন। তার এক অংশে ছিল বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ থেকে তোলা কয়েকটা শ্লোক। মার মজলিসে কেউ না কেউ প্রায় কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়ে শোনাত। একদিন রবীন্দ্রনাথ মাকে বললেন, এ আর কি রামায়ণ, আমি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ পড়েছি।

মা ছেলের কৃতিত্বে বিস্মিত হয়ে জবাব দিলেন, তাই নাকি ? আচ্ছা আমাদের সেই রামায়ণ একটু পড়ে শোনাও ত।

রবীন্দ্রনাথ ঋজুপাঠে যেটুকু পড়েছিলেন তারই খানিকটা পড়ে বাংলায় ব্যাখ্যা করে দিলেন। পড়তে গিয়ে দেখলেন, অভ্যাসের অভাবে মানে অনেক জায়গাতেই ভুলে গেছেন। কিন্তু মা তখন ছেলের অসাধারণ কৃতিত্বের গৌরবে মুগ্ধ, সংস্কৃতও তিনি জানতেন না। সহজেই তাঁকে ফাঁকি দেওয়া গেল !

বিপদ বাঁধল তিনি যখন আবার বড়দাকে ডেকে বললেন, দ্বিজেন্দ্র, রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়তে শিখেছে একবার শোন না।

রবীন্দ্রনাথ আর না বলতে পারলেন না। বুঝতে পারলেন, এবার নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবেন। তবু সহজে পিছু হটবার ছেলে তিনি নন। যাহোক করে খানিকটা পাঠ ত পড়ে গেলেন কিন্তু ব্যাখ্যা ?

দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, বললেন, আর বাংলা ব্যাখ্যার দরকার নেই। বেশ পড়তে শিখেছ।

সে যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের আত্মমর্যাদাটা বেঁচে গেল।

রবীন্দ্র জীবনকথা ॥

কত ছবি কত সুর

রানী চন্দ

গুরুদেব চলে গেছেন, এখন তাঁর স্মৃতি নিয়েই দিন কাটছে। শেষ দশ-বছর তাঁর অতি কাছেই ছিলুম। তাঁকে প্রণাম করে দিনের কাজে হাত দিতুম, সকালে উঠে তাঁর মুখই আগে দেখতুম জানলা দিয়ে। অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতে উঠে বাইরে এসে একটি চেয়ারে বসতেন পুব মুখো হয়ে, কোলের উপর হাত দু'খানি রেখে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতরাশ শেষ করে লেখা শুরু করে দিতেন। কোনোদিন দেখতুম বসেছেন কোণার্কের বারান্দায়, কোনোদিন তাঁর অতি প্রিয় শিমুল গাছের তলায়, কোনোদিন মৃন্ময়ীর চাতালে, কোনোদিন শ্যামলীর বারান্দায়—আমগাছের ছায়ায়, কোনোদিন বা বাতাবিলেবুর গাছটির পাশে। সে যেন দেবমূর্তি দর্শন করতুম রোজ। মানস চোখে প্রতিদিনকার সে সব মূর্তি এখনো দেখি; আরো দেখবো যতদিন বাঁচব।

ভোরে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা গুরুদেব পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'এমনি করে দিনের অনেকখানি সময় আলস্য খাবলে নেয়, এ হতে দেওয়া কারুরই উচিত নয়।' তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বাইরে এসে তাঁকে প্রণাম করে কাছে বসতুম। প্রাতঃরাশের সময় তিনি প্রায়ই হালকা মনে হাসি-তামাশা গল্পগুজব করতেন। কোনো কোনোদিন বেশ কিছুক্ষণ সময় এভাবে কাটিয়ে দিতেন; যেদিন দেখতুম যেন একটু অন্যমনস্ক ভাব, গল্প শুনতে শুনতে বা বলতে বলতে দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে থেমে যাচ্ছেন, সেদিন তাড়াতাড়ি আসর ভেঙে যে যার সরে পড়তুম, বুঝতুম লেখা কিছু মাথায় ঘুরছে। তিনি সেখানেই বসে খাতা খুলে নিয়ে লেখা শুরু করে দিতেন; রোদ্দ্‌ুর কড়া না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বসেই লেখা চলত।

পেয়েছি তাঁকে কতভাবে কতদিক থেকে। 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই'—এমন করে পরকে আপন করতে পারে এমন লোক আর যে দুটি দেখি না আজকের দিনে। কতভাবে কতদিক থেকে কাছে টেনেছেন, দিয়েছেন অজস্র ঢেলে যোগ্য অযোগ্য নির্বিচারে—ফলাফলের ভাবনা না রেখে। তিনি মহামানব, যুগের অবতার ছিলেন ; অতি নগণ্য আমি নাগাল পাব তাঁর কী করে। কিন্তু তিনি যে মানুষ হয়েই ধরা দিয়েছিলেন, কাছে টেনেছিলেন। মানুষ হিসাবেই তাঁকে জেনেছি পেয়েছি বেশি।

প্রতিদিনকার কত ঘটনা আজ থেকে থেকে মনে পড়ছে। তিনি তো শুধু গুরুদেব ছিলেন না আমাদের, স্নেহ ক্ষমা দিয়ে পিতার মতো আগলে রেখেছিলেন, সংকটে সম্পদে বন্ধুর মতো উৎসাহ উপদেশ দিতেন, আবার গুরুর মতো বল ভরসা দিয়ে পথ চলতে শেখাতেন। কত সময়ে অসময়ে এইটুকুতেই ছুটে যেতুম তাঁর কাছে। বলবার কিছু প্রয়োজন হত না, অথচ তাঁর কাছে গোপনও কিছু থাকত না। কথাচ্ছলে মনের সকল প্রশ্নের উত্তর মিলত, সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেত, দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভয় ভাবনা কাটত, মাথার 'পরে তাঁর স্নেহপরশ—প্রাণে যেন অভয় মন্ত্র জাগিয়ে দিত। শান্তপ্রাণে যখন উঠে আসতুম তাঁর মুখে সে স্নিগ্ধ হাসির আভাষ প্রাণে যে কী ঢেলে দিত তা' বোঝাই কী করে।

যতদিন তাঁর পায়ে চলার ক্ষমতা ছিল, যখন তখন বাড়িতে এসে আমাদের অবাক করে দিয়ে যেন মজা পেতেন। কতদিন দুপুরে বসবার ঘরে ঢুকে হাতের কাছে কাগজ পেনসিল যা পেয়েছেন, তাই নিয়ে ফরাসে বসে ছবি আঁকছেন, আমরা কিছু জানিনে। হঠাৎ তাঁর কাশির শব্দে ছুটে এসে অনুযোগ করতুম, 'কেন জানতে দেননি, কেন ডাকেননি'—মধুর হাসিতে সব ভুলিয়ে দিতেন। কখনো বা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত, একসময়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

আমার কাজ দেখছেন, হঠাৎ তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে খুশিতে ভরে উঠি। পিঠের দিকে ঘোরানো ডান হাতটি এগিয়ে দেন। হাতে তাঁরই আঁকা ছবি একখানি, তা'তে লেখা 'বিজয়ার আশীর্বাদ'। খেয়াল হলো সত্যিই তো আজ বিজয়া। সকাল থেকে এই কথাটাই ভুলে ছিলুম; কিন্তু যিনি আশীর্বাদ করেন তাঁর যে ভুল হয় না। দু-হাতে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলুম।···

ছয়মাসের শিশু অভিজিত একদিন হঠাৎ মাঝরাতে দারুণ কান্না জুড়ে দিলে। কারণ বুঝতে পারিনে, বাড়িতে অন্য কেউ নেই তখন। ঐ অসহায় শিশুর কাছে নিজেকে আরো অসহায় মনে হোলো। কী করি। আবার এক ভাবনা—পাশে শ্যামলীতে গুরুদেব আছেন। নিশুতি রাতে এই কান্নায় যদি গুরুদেবের ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি সে দিকের জানালা বন্ধ করে দিলুম। খানিকবাদে দরজার কাছে গুরুদেবের ডাক শুনি, দরজা খুলে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে। খোকার কান্না শুনে বাইরে বেরিয়ে ভৃত্য বনমালীকে উঠিয়ে বাতি জ্বালিয়ে বাইওকেমিকের বাক্স থেকে বেছে ওষুধ নিয়ে নিজে এসেছেন। বললেন, 'বোধ হয় ওর পেটে ব্যথা হচ্ছে কোনো কারণে, কান্নার সুরে সে রকমই মনে হোলো; এই ওষুধটা খাইয়ে দে দেখিনি।'

ছবি আঁকার সময় কাছে কেউ থাকে তা তিনি চাইতেন না। গোড়াতে যখন ছবি আঁকতেন—দূরে দাঁড়িয়ে থাকতুম। পেলিক্যান রং-এর শিশিগুলো দেখতে দেখতে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আরো জানা হয়ে গিয়েছিল গুরুদেব কোন্ রং-এর পর কোন্টা লাগান ছবিতে। গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, তিনি রংকানা, বিশেষ করে লাল রংটা নাকি তাঁর চোখেই পড়ে না—অথচ দেখছি অতি হালকা নীল রংও তাঁর চোখ এড়ায় না। একবার বিদেশে কোথায় যেন ট্রেনে যেতে যেতে তিনি দেখছেন অজস্র ছোটো ছোটো নীল ফুলে রেললাইনের দুদিক ছেয়ে আছে। তিনি বলতেন, 'আমি

যত বৌমাদের ডেকে ডেকে সে ফুল দেখাচ্ছি—তারা দেখতেই পাচ্ছিলেন না। আর আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম—এমন রংও লোকের দৃষ্টি এড়ায়।'

দেখেছি গুরুদেবের ছবিতে লালের প্রাচুর্য, তবু নাকি লাল রং ওঁর চোখে পড়ত না, অথচ নীল রং দেবার বেলায় কত কার্পণ্য করতেন। সে কথা বলাতে মাঝে মাঝে ছু' একটা ল্যাণ্ডস্কেপ্-এ নীল রং দিয়েছেন কিন্তু মন খুঁত খুঁত ক'রে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম তাঁর ছবি আঁকা, নেশার মতো পেয়ে বসেছিল আমাকে। রং-এর পর রং লাগাতেন। এত তাড়াহুড়োতে ছবি আঁকতেন—খেয়াল থাকত না কী রং লাগাতেন, রং বেছে নেবার অবসর নেই, হাতের কাছে যে শিশি পাচ্ছেন, তাতেই তুলি ডুবিয়ে নিচ্ছেন। অনেক সময় উলটো রং লাগিয়ে ফেলবার জন্য আগাগোড়া ছবিই শেষ পর্যন্ত বদলে ফেলতেন। দেখে দেখে আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল উনি কোন্ রং-এর পরে কোন্ রং ব্যবহার ক'রে খুশি হন, কোন্ ছবিতে কী কী রং লাগবে। ছবির সূচনা দেখেই আমি সেই সেই শিশি হাতের কাছে রেখে অন্য শিশিগুলি দূরে সরিয়ে রাখতুম। কখনো বা হল্‌দে আকাশের জন্য রং নিতে গিয়ে কালোর শিশিতে তুলি ডোবাতে যাবেন, তাড়াতাড়ি হল্‌দে শিশি এগিয়ে দিতুম। তিনি হেসে উঠতেন, বলতেন, 'দেখলি আর-একটু হোলেই সর্বনাশ হোত।' কিছুদিনের মধ্যে আমাকে তাঁর কেমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, ছবি আঁকতে শুরু করলেই ডেকে পাঠাতেন, কাছ থেকে রং সরিয়ে দিলে খুশি হতেন। আমিও ওঁর ছবি আঁকা দেখতে দেখতে মজে যেতুম!

কত সময়ে আমাকে মডেল করে ছবি আঁকতেন, যদিও ছবিতে ও আমাতে কোনো সাদৃশ্যই খুঁজে পেতুম না। প্রথম প্রথম মনে একটু লাগত, পরে এ থেকেই বড়ো মজা পেতুম। অনেক সময় আবার তাঁর হাতে কাগজ পেনসিল দিয়ে নিজে পোজ দিয়ে বসতুম,

বলতুম, 'আঁকুন, আমাকে।' তিনি হাসিমুখে ছবি আঁকতে শুরু করতেন। এক মিনিটের বেশি চুপ করে থাকতে হোত না। তারই মধ্যে পেনসিলে লাইন ড্রয়িং করে নিয়ে তারপরে চলত তার উপরে রং-এর পর রং-এর প্রলেপ; হোতে হোতে সে ছবি যে এক-একবার কী মূর্তি ধরত—দেখতে দেখতে দু'জনেই হেসে উঠতুম। তিনি বলতেন, 'তোর মনে গর্ব হওয়া উচিত, দেখ তো—আমিই কতরূপে তোকে দেখছি।'

কাছে থাকি, চুপ করে থাকতে যদি আমার খারাপ লাগে এই ভেবে ছবি আঁকতে আঁকতেও কত গল্প করতেন; আবার ছবির সঙ্গে কথা কইতে কইতে ছবি আঁকতেন, 'কী গো মুখ ভার করে আছ কেন। আর একটু রং চাই তোমার? কালো রংটা তোমার পছন্দ হলো না বুঝি? আচ্ছা, এই নাও; দেখো তো কত করে তোমার মন পাবার চেষ্টা করছি—তবু তোমার চোখ ছলছল করছে। তা থাকো ছলছল চোখেই, আমি আবার একটু জলভরা নয়নই ভালবাসি কিনা দেখতে।' আমার কত যে মজা লাগত, ছোটো খুকির মতো পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনে, চোখমুখের ভঙ্গী দেখে খিলখিল করে হাসতুম। আবার ভাবতুম, এমনি করে কথা না কইতে পারলে সৃষ্টি করে আনন্দ পাওয়া যায়? কতদিকে কতভাবে তিনি চোখ ফুটিয়ে দিতে দিতে চলতেন! আজ ভাবি সে সব দিনের কথা, কত ছবি চোখে ভেসে উঠছে, কত সুর কানে বাজছে।

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥

মেজমামিদের সঙ্গে রবিমামাও প্রথমবারের বিলেত যাত্রা থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। আমরা ছোটরা গানের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে এলুম···

বাড়িতে গান-বাজনা ও অভিনয়াদির দিক থেকে রবিমামার প্রাধান্য ক্রমশ ফুটছে। এর আগে নতুনমামা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিককার কর্ণধার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিলেতনিবাস কালেই আমার মায়ের (স্বর্ণকুমারী দেবী) রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ি তখন। আমাদের শিশুকণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হতে থাকত বড় বড় ভাবের বড় বড় কথায় বড় বড় রাগ—'চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথে য়ে য়ে য়ে য়ে'—বাগেশ্রীর তানে আমাদের গলা ও মন খেলিয়ে খেলিয়ে উঠত। 'বসন্তোৎসব' বাস্তবিকই একখানি অপূর্ব জিনিস।··

রবীন্দ্রনাথের জন্যে বাড়িতে ভূমি তৈরি। তিনি এসে তাতে নতুন নতুন বীজক্ষেপ করতে থাকলেন। তিনি আসার পর প্রথম যে একটি ছোট্ট গীতিনাট্যের অভিনয় হল—যাতে ইন্দ্র ও শচী সাজেন নতুনমামা নতুনমামি (কাদম্বরী দেবী) এবং বসন্ত সাজেন রবিমামা, তার নাম 'মানময়ী', নতুনমামাই তার রচয়িতা।

তারপর হল সরস্বতী পূজার দিন 'সারস্বত সম্মিলনে' ছাদের উপর স্টেজ বেঁধে, বাইরের লোক নিমন্ত্রণ করে মহা ধুমধামে 'বাল্মীকি প্রতিভা'! এইতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রথমে সর্বজনসমক্ষে উদ্‌ঘোষিত হল।

এসব মধুচক্রের রচয়িতা বড়রা হলেও আমরা ছোটরা নিত্য তাঁদের প্রসাদ-মধুপায়ী ছিলুম। কখনো কখনো তাঁদের অনুকরণে নিজেদের দল বেঁধেই আবার ঐ সবের অভিনয়পরায়ণ হতুম। আমাদের নেতা ছিলেন সুধীদাদা—বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। তিনি রবিমামার অনুকরণ করে ঠিক ঠিক সেই রকম বাল্মীকি সাজতেন, নিজের হাতের লেখাটিও তাঁর লেখার প্রায় অবিকল প্রতিরূপ করে তুলেছিলেন—তখনো তিনি সে প্রখ্যাত রবীন্দ্রনাথ হননি—যাঁর হস্তলিপির অনুলিপি দেশের ডজন ডজন ভক্ত ছেলেরা করছে।

এই রকমে পরোক্ষভাবে সঙ্গীত-প্রাণকতায় আমরা রবিমামার অধিনায়কত্বে আসতে থাকলুম। কিন্তু যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ হল সে ১১ই মাঘের গানে। এর আগে ১১ই মাঘের গানের অভ্যাস বড়মামা, নতুনমামা বা বোম্বাইপ্রবাস প্রত্যাগত মেজমামা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহ-নেতৃত্বাধীনে থাকত। রবিমামা বিলেত থেকে ফেরার পর তিনিই নেতা হলেন। দাদাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নতুন নতুন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করা, ওস্তাদদের কাছ থেকে সুর নিয়ে সুরভাঙ্গা, নিজের মৌলিক ধারার সুর তখন থেকেই তৈরী করা ও শেখান—এ সবের কর্তা হলেন রবিমামা। বাড়ির সব গাইয়ে ছেলেমেয়েদের ডাকও এই সময় থেকে পড়ল।...

শুধু ধর্মসঙ্গীতে নয়, এখন থেকে কত ভাবের কত গানে বাড়ি সদাগুঞ্জরিত হতে থাকল। বাড়িতে শেখা দিশী গানবাজনায় শুধু নয়, মেমেদের কাছে শেখা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের চর্চায়ও আমাদের উৎসাহদাতা ছিলেন রবিমামা।

আমার একটা নৈসর্গিক কুশলতা বেরিয়ে পড়ল—বাঙলা গানে ইংরিজি রকম কর্ড দিয়ে ইংরিজি 'piece' রচনা করা। একবার রবিমামা আমাদের 'task' দিলেন—তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাকে পিয়ানোতে প্রকাশ করা। একমাত্র আমিই সেটা

করলুম। মনে পড়ে তাতে কি অভিনিবেশ শিক্ষা দিলেন। কি গভীর ভাবে কাব্যের অর্থবোধ ও সঙ্গে সঙ্গে সুরে ও তালে তাতে দেহদান করার অপূর্ব গহন আনন্দকূপে আমায় ডুব দেওয়ালেন।

তখন আমার বয়স বার বৎসর। হঠাৎ সেই জন্মদিনের সকালে রবিমামা এলেন কাশিয়াবাগানে হাতে একখানি য়ুরোপীয় music লেখার manuscript খাতা নিয়ে। তার উপর সুন্দর করে বড় বড় অক্ষরে লেখা—" 'Socatore'—Composed by Sarola"।

'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে' বলে রবিমামার একটি ব্রহ্মসঙ্গীতকে আমি রীতিমত একটি ইংরেজি বাজনার pieceএ পরিণত করেছিলুম। পূরোদস্তুর ইংরেজি piece, পিয়ানোতে বা ব্যাণ্ডে বাজাবার মত।—না জানলে কেউ চিনতে পারবে না এর ভিতরটা দিশী গান।···

ইংরেজি বিধানে সপ্তাঙ্গে সম্পূর্ণ সেই বাজনাখানি আমার মাথায় স্তরে স্তরে লেখা ছিল। কাউকে শোনাতে গেলেই সবটা মনের থেকে হাত বেরিয়ে এসে বাজত। রবিমামা খাতাখানি দিয়ে বললেন, 'এইতে লিখে রাখ, ভুলে যাবি।'

লেখা হল, কিন্তু ভোলাও হল। কেননা সে খাতাখানি গেছে হারিয়ে—আমার জীবনের সব কিছুই যেমন হারানর তহবিলে গেছে চলে।

তারপরেও 'চিনি গো চিনি বিদেশিনী' প্রভৃতি অনেকগুলি রবীন্দ্রগান এবং 'হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও' প্রভৃতি দুই-একটি নিজের গানও আমার হাতে সেই রকমে য়ুরোপীয়ান্বিত হয়েছিল।···

প্রাণের গভীরে আমার যে সুরদেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন··· তাঁর পুষ্টিসাধনা করে তাঁর দ্বারা আমারও পুষ্টিবিধানের হোতা হলেন রবিমামা। আমি গানের বাতিকগ্রস্ত ছিলুম। যেখান সেখান থেকে নতুন নতুন গান ও গানের সুর কুড়ুতুম। রাস্তায় গান গেয়ে

যাওয়া বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী ভিখারীদের ডেকে ডেকে পয়সা দিয়ে তাদের গান শিখে নিতুম।...

কর্তাদাদামহাশয় (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) চুঁচড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত—তাঁর মত সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম—অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙ্গে, কখনো কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন। 'কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি অনেক গান সেই মাঝির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসান।

মহীশূরে যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবিমামার পায়ের তলায় সে গানের সাজিখানি খালি না করা পর্যন্ত, মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, সেগুলিকে মুগ্ধচিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন—তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হল। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এস হে গৃহদেবতা', 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ', 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর' প্রভৃতি আমার আনা সুরে বসান গান।

আমার সব সঙ্গীতসঞ্চয়ের মূলে তাঁকে নিবেদনের আগ্রহ লুকিয়ে বাস করত। দিতে তাকেই চায় প্রাণ, যে নিতে জানে। বাড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রহীতা ছিলেন রবিমামা।...

'বন্দে মাতরম্'এর প্রথম দুটি পদ তিনি সুর দিয়েছিলেন নিজে। তখনকার দিনে শুধু সেই দুটি পদই গাওয়া হত। একদিন আমার উপর ভার দিলেন—'বাকী কথাগুলোতে তুই সুর বসা।'

তাই 'ত্রিংশকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত কথায় প্রথমাংশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমি সুর দিলাম। তিনি শুনে খুশি হলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু হল।

আমার সাহিত্যগত রুচিও গড়ে দিয়েছিলেন রবিমামা। ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কীটস্, শেলি প্রভৃতির রসভাণ্ডার যিনি আমার চিত্তে খুলে দেন—সে রবিমামা। মনে পড়ে দার্জিলিঙের 'Castleton House'এ যখন মাসকতক রবিমামা, মা, বড়মাসিমা, দিদি ও আমি ছিলুম—প্রতি সন্ধ্যাবেলায় Brownirg-এর "Blot in the Scutcheon" মানে করে করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ে শোনাতেন। Browning-এর সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়। সেই সময় পিঠে একটা ফোড়ায় যখন শয্যাশায়ী তখন শুয়ে শুয়ে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য রচনা আরম্ভ করেন। প্রতিদিন একটি দুটি করে গান রচনা করতেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমায় শিখিয়ে দিতেন।

জীবনের ঝরাপাতা ॥

লণ্ডনে তরুণ রবীন্দ্রনাথ

কৈশোরের শান্তিনিকেতন

সুধীরঞ্জন দাস
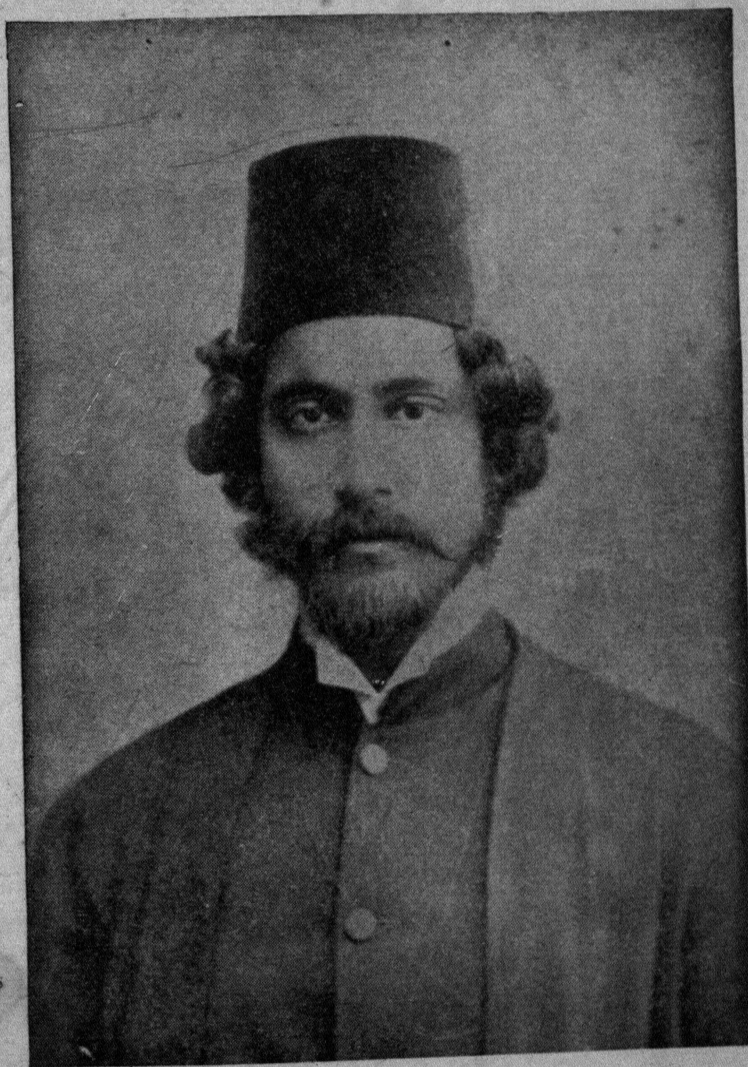
আমাদের সময় কিছু কিছু উদ্ভট নষ্টামি যে হত না তা বলতে পারি নে। একটা বাঁদরামির বিষয় এখনো মনে রয়ে গেছে। সেবার আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি না গিয়ে আশ্রমেই থাকব এবং জগদানন্দবাবুর কাছে আমাদের অঙ্কের জ্ঞানটা ঝালিয়ে নেব—এই রকম কথা হয়েছিল। চিঠি লিখে বাড়িতে সে কথা জানিয়ে দিলাম। ছেলের পড়াশুনার চাড় দেখে বাবা খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন। আমাদের সহপাঠীরাও বাড়ি থেকে অনুমতি পেলেন। মনোরঞ্জনদা (আশ্রম-সতীর্থ) থাকলেন বলে তাঁর ছোটো ভাই সরোজও রয়ে গেলেন। অন্যান্য ছেলেরা বাড়ি চলে গেলেন—আশ্রম প্রায় খালি হয়ে গেল। জগদানন্দবাবু ও আর দু-একজন ছাড়া মাস্টারমহাশয়রাও অনেকেই চলে গেলেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ভার নিয়ে রইলেন চণ্ডী ঠাকুর।···চণ্ডী ঠাকুর ছিলেন বেঁটেখাটো অথচ বেশ বলশালী লোক। ভয়ডর তাঁর ছিটেফোঁটাও ছিল না, অন্তত এই ছিল তাঁর বড়াই। হাতে লাঠি থাকলে ভূতপ্রেতের বাপের সাহস হবে না তাঁর কাছে এগোয়। অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে শ্মশানের গা ঘেঁষে পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে যেতে তাঁর এতটুকুও পরোয়া নাকি নেই। এক কথায় নিজের সাহসের গরব গরিমায় চণ্ডী ঠাকুর পঞ্চমুখ। সরোজ একদিন বললে, 'ওহে সুধীরঞ্জন, চণ্ডী ঠাকুরের বড্ড অহঙ্কার হয়েছে—ওকে একটু শিক্ষা না দিলে তো আর চলে না হে।' পরামর্শ চলতে লাগল কী করে চণ্ডী ঠাকুরকে আক্কেল দেওয়া যায়। বড়ো রান্নাঘরের উত্তরে একটি খড়ের চালাঘরে ছিল ভাণ্ডার। তারই নিচু দাওয়াতে চণ্ডী ঠাকুর শুতেন রাত্তিরে। সরোজ, আমি আর ক'জনায় মিলে

এক গভীর অন্ধকার রাত্রে ল্যাবরেটারি-ঘরে ঢুকলাম। সেখানে সত্যবাবুর আমলের নরকঙ্কালটা তখনো ঝোলানো ছিল। সেটাকে নামিয়ে তার চোখের কোটরের চারিদিকে ও চোয়ালের উপরের ও নীচের হাড়গুলিতে জগদানন্দবাবুর ফস্‌ফরাসের শিশিটা থেকে খানিকটা বের করে আচ্ছা করে ঘষা হল। ঘষাটা যতটা সোজা মনে হয়েছিল কাজে ততটা সোজা বোধ হল না—কেননা, হাত জ্বালা করতে লাগল। কিন্তু কী আর করা যাবে—চণ্ডী ঠাকুরকে তো শায়েস্তা করা দরকার, সুতরাং জ্বালা সইতেই হল। তার পর অতি সন্তর্পণে কঙ্কালটাকে বের করে নিঃশব্দ পদে গুটি গুটি গিয়ে চালের বাতায় তাকে টাঙানো হল। তার পর তার নীচের চোয়ালের সঙ্গে একটা সুতলি বেঁধে আমরা ক'জন পাশের দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়ালাম! সুতলিটা টেনে দেখা গেল যে কঙ্কালের চোয়ালটা বেশ উঠছে আর নামছে। অন্ধকার রাত্তিরে কঙ্কালের যে কী ভীষণ মুখব্যাদন আর তার চক্ষুকোটর থেকে তারাহীন চোখের সে কী ভীতিপ্রদ চাহনি! এখন কথা হল চণ্ডী ঠাকুরকে কী করে জাগানো যায়। সরোজ গোটাকয়েক কাঁকর কুড়িয়ে একটি একটি করে তাঁর দিকে ছুঁড়তে লাগলেন। একটা তাঁর গায়ে লাগায় তখনই চণ্ডী ঠাকুর মোড়ামুড়ি দিয়ে কঙ্কালের দিকে পাশ ফেরা মাত্র সরোজ সুতলিটা টানতে লাগলেন। আর যায় কোথায়! ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে নরকঙ্কাল তখন মুখ খুলতে আর বন্ধ করতে শুরু করলে। তাই-না দেখে চণ্ডী ঠাকুর তো গোঁ গোঁ শব্দে মূর্ছা যান আর কি। ভয় হল লোকটি হার্ট ফেল করে মারা যাবে না তো? যখন দেখা গেল দু-একবার তাঁর পাশে শোওয়ানো লাঠিটার দিকে হাত বাড়ালেন তখন উলটো ভয় হল যে, যদি মরিয়া হয়ে লাঠিটা ভূতের গায়ে সজোরে মারেন একবার তবে তো সে ভূত চুরমার হয়ে যাবেই, পরের দিন জগদানন্দবাবু আমাদেরও আস্ত রাখবেন না। সরোজকে চুপি চুপি বললাম

আশঙ্কার কারণটা। দেখলাম তাঁরও মনে ঐ একই কথা এসেছে। সুতরাং আমরা সমস্বরে খিল খিল করে হেসে উঠলাম। শেষে সরোজ বললেন, 'কী হে চণ্ডী এই রকম করেই ভূতের সঙ্গে লড়াই কর নাকি?' লণ্ঠনটার আলো একটু বাড়িয়ে দিয়ে চণ্ডী ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'আমি বুঝেছিলাম, দাদাবাবুরাই বটে। মারছিলাম আর-কি লাঠির গুঁতো—ভূত ভেগ্যে যেত।' লণ্ঠনের আলোয় দেখি চণ্ডীর গায়ে মুখে তখনো ঘাম ঝরছে। বললাম, 'বটেই তো, এই তো বাপু গোঙাচ্ছিলে—শুনতে পাইনি? কালা কি?' চণ্ডী তখন স্বীকার করলেন যে, কিছুটা ভয় হয়েই ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত সামলিয়ে যেতেন। রাতারাতি সকলে মিলে নরকঙ্কালটি নামিয়ে নিয়ে ল্যাবরেটারি-ঘরে যথাস্থানে টাঙিয়ে রেখে আমরা শুতে গেলাম। দিনের আলোয় কঙ্কালের চোখে মুখে ফস্‌ফরাস্ তো দেখা যাবে না, সুতরাং ভয় নেই। আর শিশিটা থেকে যা খোওয়া গেছে তাতেও ধরা পড়বার ভয় নেই, কেননা জগদানন্দবাবুই তো বলেছিলেন যে, ফস্‌ফরাস্ হাওয়ায় উবে যায় কিছু কিছু, হয়তো ছিপিটা ভালো করে আটকানো ছিল না। এই-সব জবাব মনে এঁচে নিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা কে জানে। ঘটনাটা চাপাই রয়ে গেল, কেননা আমাদের কেরামতিটা ব্যাখ্যা করতে পারলাম না জগদানন্দবাবুর ভয়ে আর চণ্ডী ঠাকুর পারলেন না, তাঁর পৌরুষের পাছে হানি হয় এই ভয়ে। তবে ফলের মধ্যে এই হল যে, এর পর চণ্ডী ঠাকুরকে ভূতের সঙ্গে লড়াইয়ের বড়াই করতে আর কখনো শোনা যায় নি।

সারা গ্রীষ্মের ছুটিটা সকালে বিকেলে জগদানন্দবাবুর কাছে চলল আমাদের পাটীগণিত, জ্যামিতি আর বীজগণিতের চর্চা। সকালের ক্লাসটা নির্বিঘ্নে হয়ে যেত, মাঝে মাঝে গোল হত ঐ সন্ধ্যার ক্লাসে। ব্যাপারটা খুলেই বলি। অনেক গীতরচয়িতা প্রথমে গানের পদগুলি লেখেন, পরে তাতে সুর সংযোগ করেন বা

করিয়ে নেন। এতে করে অনেক সময় কথায় এবং সুরে সামঞ্জস্য থাকে না। একথা এখন সকলেই জানেন যে গুরুদেবের বেশির ভাগ গানই আরম্ভ হয়েছিল সুরে, কথা এসেছিল পরে। কত সময়ে দেখেছি গুরুদেব নিস্তব্ধ হয়ে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের অমৃতধারা নিঃশেষে টেনে নিচ্ছেন নিজের অন্তরে গুনগুন করতে করতে। সেই সুরের অঙ্কুরকে পরিণত মূর্তি দেবার জন্যে কথা যেন আপনি আসত! আর যখনই এই রকম সুরের স্রোতে কথা জুটে একটি কোনো গান রচনা হত তখনি সেটি তিনি কাউকে শিখিয়ে দিতেন, নইলে সে সুর অনেক সময় তাঁর মনে থাকত না। যাঁর অন্তরে সুরের সুরধুনী নিত্য প্রবাহিত হচ্ছে, তার একটি ঢেউ যে মিলিয়ে মিশিয়ে যাবে অন্য শত শত ঢেউয়ের মধ্যে তাতে আর বিচিত্র কী! এই জন্যে তাঁর প্রয়োজন ছিল তাঁর 'গানের ভাণ্ডারী' দিনুবাবুকে (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। দীনুবাবু অনুপস্থিত থাকলে অনেক সময় অজিতবাবুকেও (অজিতকুমার চক্রবর্তী) শিখিয়ে দিতেন। এখন হল কী, ঐ গরমের ছুটিতে যখন আমরা বাড়ি না গিয়েই আশ্রমেই রয়ে গেলাম, আশ্রমে তখন না ছিলেন দিনুবাবু, না ছিলেন অজিতবাবু। দায়ে পড়ে বলতে হল, আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কারো গানের খ্যাতি ছিল না। সুতরাং মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ত সন্ধ্যার সময়। ভাঙা কুলোও যেমন অনেক সময় কাজে লেগে যায়। দূর থেকে দেখা যেত লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে কে আসছে জগদানন্দবাবুর বাড়ির দিকে। তার পরেই দেখি স্মিতহাস্য উমাচরণ সসম্ভ্রমে সমাচার জ্ঞাপন করছে, 'আজ্ঞে, সুধীরঞ্জন-দাদাবাবুকে বাবুমশায় ডেকেছেন।' জগদানন্দবাবু যে খুশি হলেন না, তা তাঁর মুখের ভাব ও চোখের চাহনিতেই বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু উপায় নেই, বাবুমশায় ডেকেছেন, কাজেই ইচ্ছা না থাকলেও যেতেই বললেন। আমিও যেন একান্ত অনিচ্ছা নিয়ে উঠে পড়লাম। এই

ব্যাপারটা যখন একটু নিয়মিতভাবে ঘটতে লাগল, জগদানন্দবাবুর অসন্তোষের তাপও দিন দিন বাড়তে লাগল বৈ কমল না। শেষে একদিন যেই-না দেখা গেল লণ্ঠনটি এগিয়ে আসছে তিনি বলে ফেললেন, 'আর কেন ধাষ্টামো—পা তো বাড়িয়েই আছ, উঠে পড়ো। বাবুমশায়কে আমিও বলে রাখব যে তোমার পাস-ফেলের মধ্যে আমি নেই। স্পষ্ট দেখছি তুমি ফেল হবে আর আমারও নাম ডোবাবে। নাও, উঠে পড়ো।' আমি তখন গ্যাঁট হয়ে মাথা গুঁজে জ্যামিতির একটা নকশা আঁকতে লেগে গেলাম। 'কৈ হে, উঠছ না যে বড়ো—হল কী?' আমি বললাম, 'না মশায়, আমি যাব না, কে শেষে গান শিখতে গিয়ে পরীক্ষায় ফেল হবে?' জগদানন্দবাবু ভাবলেন তিরস্কারটা আর একটু কড়া হলেই আমি উঠব। তাই বললেন, 'নাও, ঢের হয়েছে। লেখা পড়ায় এত মন কবে থেকে হল হে? পড়াশুনোয় মন যদি থাকবে তবে তোমার বাপ-মা বাড়ি থেকে তোমায় তু-তুবার খেদিয়ে দেবেন কেন? এঁদের বাপ-মায়েরা এঁদের একবারই খেদিয়েছেন। আর তুমি এমনি ছেলে যে তোমার বাপ-মা তোমাকে তু-তুবার বাড়ি থেকে তাড়িয়েছেন। বাস্ রে, কী ছেলে। যাও, যাও খসে পড়ো?' তখনো আমি নড়বার নাম করি নে। অবশেষে মাস্টারমশায় দেখলেন, শান্তির পন্থা অবলম্বন না করলেই নয়। বললেন, 'আহা দেখছ না? বাবুমশায় তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কাল সকালে না-হয় একটু আগে এসো—ঐ আঁকটা তখন ভালো করে বুঝিয়ে দেব।' দেখলাম যে এই অবস্থায় সন্ধি করাই শ্রেয়। সুতরাং উঠে পড়লাম। উমাচরণ মুচকি মুচকি হাসছে, আর মাস্টারমশায় খালি বললেন, 'বাস্ রে, কী ছেলে!' এর পর মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গান শেখা নিয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি।

গুরুদেবের কাছ থেকে গান শিখে ফিরে আসতাম ঠিক রাত্রে খাবার ঘণ্টা পড়বার অব্যবহিত পূর্বে। খাবার পরেই···প্রায় সবাই

অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজ কী গান শিখে এলে ভাই ?' তখন তাঁদের শোনাতেই হত সেই সদ্য-শেখা গানগুলি, যা পরে গীতাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছিল। দিনুবাবু ফিরলে যে-কটা গান আমি শিখেছিলাম সেগুলি তাঁকে শুনিয়ে দিতে হয়েছিল। পরে তিনি সেগুলি আবার গুরুদেবকে শুনিয়ে ঠিক হয়েছে কি না জেনে নিলেন। একদিন এই রকম একটা নূতন গান শিখলাম—

'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগে নি,
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।'

সেদিন রাত্তিরে গৌরপ্রাঙ্গণ ভেসে গেছে জোৎস্নায়। খাবার পর সুহৃদ আর আমি মাঠে বেড়াচ্ছিলাম শরীরটা একটু জুড়োতে। সুহৃদের নির্বন্ধাতিশয্যে নূতন শেখা গানটি গলা ছেড়ে গাইতে লাগলাম। গানটার প্রথম অন্তরাটা পেরিয়ে খাদের জায়গাটাতে পৌঁছতে-না-পৌঁছতে শুনলাম, 'সুধীরঞ্জন ! সুধীরঞ্জন।'—কণ্ঠস্বরেই বুঝলাম কোন মাস্টারমশায় ডাকছেন। গান মূলতুবি রেখে মাস্টারমশায়ের সামনে দাঁড়াতেই রুক্ষস্বরে তিনি বকলেন, 'লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, থিয়েটারি গান করবার আর জায়গা পেলে না ? আশ্রমে গান হচ্ছে—হতভাগিনী জাগেন নি। যাও, এক্ষুনি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।' আমি নেহাত বোকার মতো বলে বসলাম, 'থিয়েটারি গান কী মশায়, গুরুদেব তো নিজে শিখিয়ে দিলেন, আজকেই।' মাস্টারমশায়ের ঠিক যেন প্রত্যয় হল না, বললেন, 'হ্যাঁ, গুরুদেব শিখিয়েছেন !' আমি যখন তবু জোর করে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—গুরুদেবই তো শেখালেন।' তখন তিনি বললেন, 'গা তো দেখি, শুনি।' আমি তখন আবার গানটির আদ্যোপান্ত তাঁকে শুনিয়ে দিলাম। শুনতে শুনতেই দেখলাম মাস্টারমশায়ের মাথাটি নড়ছে। গান শেষ হলে খালি বললেন 'হ্যাঁ, কথাগুলোর বাঁধুনি রয়েছে বৈকি ! আচ্ছা যা, শুগে যা।' সুহৃদে আমাতে যে সেদিন গোপনে একটু হাসাহাসি করিনি সে কথা বলতে পারব না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর আবার আমাদের জীবনযাত্রা বাঁধা নিয়মে লাইন ধরে চলতে শুরু করল। দিনুবাবুর গানের ক্লাসে এই গানটা নূতন শেখা গেল—

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার॥
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার॥'

এই গানটার কথা ও সুর মনের মধ্যে প্রবল নাড়া দিয়েছিল তা সত্যি, কিন্তু গানটা এখনো মনে থাকবার অন্য কারণ ঘটেছিল এই সময়ে, সেটা তবে খুলেই বলি। দিনুবাবু সে সময়ে কিছুদিন ছিলেন গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটারি-বাড়ির তৃতীয় কামরাটাতে। নগেন আইচ মাস্টারমশায় তখন ছেলেদের সঙ্গে পাশের প্রাক্‌কুটিরেই থাকেন। নগেনবাবু বেশ সুর করে করে আমাদের নদী কবিতাটি পড়াতেন। এ ছাড়া দিনের বেলায় অন্য কোনো গান তাঁকে গাইতে শুনিনি কখনো। দিনুবাবু একদিন বললেন. 'ওরে, নগেনবাবুকে গানে পেয়েছে শুনেছিস।' আমরা বললাম, 'শুনিনি তো।' দিনুবাবু বললেন, 'গানে পেয়েছে নিশ্চয়ই জানি। এমনিতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু এই আমারই জানলাটার পাশে রাত দুপুরে না গাইলেই কি নয়? কী করা যায় বল্‌ তো?' 'তাঁকে ডেকে বলে দিলেই হয় যে একটু তফাতে মাঠের মধ্যে গিয়ে গাইলে ভালো।' দিনু-বাবু বললেন, 'তা কি বলা চলে রে বোকা! দেখি কী করা যায়।' সেই দিনই একটু বেশি রাত্তিরে আমাদের ঘর থেকেই শুনতে পেলাম নগেনবাবু গুন গুন করে কী একটা গান করছেন। যেই-না নগেনবাবু গুনগুনিয়ে উঠেছেন অমনি দিনুবাবু এসরাজটা নিয়ে গান জুড়লেন—

'গভীর রাতে তোমার অত্যাচার
নগেন আইচ শত্রু হে আমার।
তোমার গান কান্না-সম—
আসে না ঘুম নয়নে মম—
তুয়ার খুলি হে মোর যম
তোমায় তাড়াই বারে বার।'

নগেনবাবুর গুনগুনানি নিমেষে থেমে গেল। তার পর থেকে আশ্রমে কেউ তাঁর গান শোনেনি কখনো।

এই সময়ের কাছাকাছি এমন একটা অঘটন ঘটল যে কিছুদিন আমরা অভিভূত হয়ে রইলাম। তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছেলে আমরা ক'জন লাইব্রেরি-বাড়ির পশ্চিম-দেয়ালের লাগাও নূতন ঘরটিতে থাকতাম। একদিন জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরে গিয়েছে—রাত্রে খাওয়া শেষ হলে সুহৃদ ও আমি, আর কে কে বেরিয়ে পড়েছি খেলার মাঠে। বেহাগ সুরে একটার পর একটা গান করছি সবাই-মিলে। হঠাৎ নজরে পড়ল, আমাদের ঘরের সামনে কারা লণ্ঠন নিয়ে ছুটোছুটি করছে। খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম, একটা অনির্দিষ্ট অমঙ্গল-আশঙ্কায় মনে কেমন যেন ভয় হতে লাগল। আমরা সব তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ঘরে। এসে দেখি ভোলা তাঁর বিছানায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন এবং গুরুদেব তাঁর পাশে একটা মোড়া না কিসের উপর স্তম্ভিতভাবে বসে আছেন, নির্নিমেষ চোখে ভোলার দিকে তাকিয়ে। একটা টিপাইয়ের উপর কয়েকটা বাইওকেমিক ওষুধের শিশি। একটু পরেই বোলপুর থেকে হরিচরণ ডাক্তারবাবু এসে যখন বুক পিঠ ও নাড়ী পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, বুঝতে পারলাম যে আমাদের সতীর্থটিকে আমরা হারালাম। গুরুদেবের তন্ময় মুখচ্ছবিতে যে দুঃখ ও করুণার ভাব ফুটে উঠেছিল আজও তা ভুলিনি। ভোলার হঠাৎ কী হল আমরা কিছুই বুঝলাম না, পরেও জানতে পারিনি। মনের মধ্যে

বিশেষ করে জাগছিল এই কথাটা, শমী (গুরুদেবের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ) গেলেন ভোলাদের মুঙ্গেরের বাড়ি হতে, আর ভোলা চলে গেলেন গুরুদেবের আশ্রম থেকে। ভোলা ও শমীর মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল বলেই বোধ হয় এই কথাটা বার বার মনে আসছিল। প্রত্যূষে তাঁর দেহ সংকার করে শ্মশান থেকে যখন সকলে ফিরলাম তখন রোদ উঠে গেছে। সেদিন আর আমাদের ক্লাস হয় নি।

আমাদের শান্তিনিকেতন ॥

শান্তিনিকেতনের রতনকুঠি

বুদ্ধদেব বসু

একদিন শোনা গেলো রতনকুঠির রান্নাঘরের পথে নিমগাছের তলায় মস্ত এক গোখরো সাপের আস্তানা—চাকরদের চোখে নাকি প্রায়ই পড়ে, একদিন কাশী বুঝি আর একটু হ'লে মাড়িয়েই দিচ্ছিলো। এ-কথা শোনা যেতেই নানাদিক থেকে স্থানীয় সাপের গল্প অজস্রধারায় আমাদের উপর বর্ষিত হ'তে লাগলো। রতনকুঠিতে আমাদের ঘরেই একবার এক ভদ্রলোক ছিলেন, একদিন তিনি টেবিলে ব'সে কাজ করছেন, হঠাৎ উপর থেকে ঝুপ ক'রে কী-একটা পড়লো। চমকে তাকিয়ে দ্যাখেন, সাপ। উপরে তাকিয়ে দ্যাখেন, সেখানে আরো একটি উঁকি দিয়ে রয়েছে। একদিন নাকি ক্ষিতিমোহনবাবুর (আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন) ভোরবেলায় ঘুম ভেঙেছে, পাশ ফিরতে খুব ঠাণ্ডা আর নরম কী-একটা জিনিস হাতে ঠেকলো। দেখা গেলো, মস্ত একটা সাপ তাঁর পাশে দিব্যি আরামে শুয়ে। এই ধরনের আরো অনেক গল্প শুনলুম। একটি মেয়ে বললেন, 'একদিন রাত্রে শুতে যাবো, দেখি খাটের পায়ে একটি সাপ জড়িয়ে আছে। হুস্ করতেই সেটা পালিয়ে গেলো, শুয়েও পড়লাম, কিন্তু শুয়ে মনে হ'লো একটা সাপ ঘরের মধ্যেই নিয়ে ঘুমানো কি ভালো হবে? উঠে লণ্ঠন নিয়ে সেটাকে খুঁজে বের করলাম, হাতের কাছে আর-কিছু ছিলো না—স্যাণ্ডেল দিয়ে পিটিয়ে সেটাকে মারলাম, তারপর এসে ঘুমোলাম।' আমরা জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের সাপে ভয় করে না?' মেয়েটি চোখ বড়ো ক'রে বললেন, 'করে না আবার! খুব করে! তেমন-তেমন সাপে কামড়ালে মানুষ তো আর বাঁচে না।' আসলে এখানে সাপ যেমন বেশি, সাপের ভয়ও

তেমনি কারুরই নেই। অন্ধকারে বেরোতে হ'লে টর্চ একটা হাতে রাখেন এ-ছাড়া সাপের কথা কেউ ভাবেন না, তাও দু' এক জনকে দেখেছি টর্চ ছাড়াই দিব্যি অন্ধকারে চ'লে যেতে। খাটে দেরাজে টেবিলের তলায় হঠাৎ সাপ দেখলে অবাক হবার কিছুই নেই, কেউ কিছু মনেই করেন না, তবে যথার্থ বিষাক্ত সাপ হ'লে রীতিমতো তোড়জোড় ক'রেই মারা হয়। ছেলেরা হেলে সাপ পকেটে নিয়ে ক্লাশে যায়, এবং তার নানারকম অসঙ্গত ব্যবহারও করে। চারদিকে সকলের নির্ভয় ভাব অতিথির মনেও নির্ভয় আনে। এত সাপের গল্প অন্য কোথাও শুনলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতুম, কিন্তু শান্তিনিকেতনে আমার মতো সর্পভীরু লোকেরও কোনো দুশ্চিন্তাই মনে আসতো না—মনে হ'তো এখানকার জীবন অত্যন্ত নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, কোনো অনিষ্ট এখানে হবে না। তাছাড়া সকলেই জানেন যে এত বছরের ইতিহাসে এই আশ্রমের এলাকার মধ্যে একটিও সর্পাঘাত হয়নি। নন্দলালবাবুকে (আচার্য নন্দলাল বসু) একবার আর সুধাকান্ত বাবুকে (সুধাকান্ত রায়চৌধুরী) দু'বার সাপে অবশ্য কামড়েছিলো, কিন্তু সে অতি বাজে সাপ, তাঁদের কিছুই হয়নি।

তবু, একটা বিষধর আমাদের অত নিকট প্রতিবেশী এ-কথা শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলুম বই কি। কবিকে পরিহাস-ছলে বলেছিলুম কথাটা, তিনি মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'ওরা কিছু বলে না।' কথাটি কানে লেগে রয়েছে, ওতে একটি অপূর্ব কোমলতা ছিলো। আরো অনেককেই বলেছিলুম, এবং মানুষের আর সাপের বাসা এত কাছাকাছি না-হওয়াই সঙ্গত এমন ইঙ্গিতও করেছিলুম। শোনা গেলো কাছাকাছি এক সাপুড়ে আছে, সে গর্ত থেকে জ্যান্ত সাপ ধরতে পারে। এ-রকম সাপ ধরার গল্প অনেক শুনেছি, কিন্তু চোখে কখনো দেখিনি। সাপের কামড়ে মরবার ভয়ে ততটা নয় যতটা সাপ-ধরা দেখবার উৎসাহে খবর

পাঠালুম সেই সাপুড়েকে। দিন দুই পরে সকালবেলায় সে এলো। পূর্বোক্ত নিমগাছের কাছে একটা ইঁটের পাঁজা ছিলো। ইঁটের পাঁজা বাঁশবনের মতোই প্রসিদ্ধ সর্পাবাস, সাপুড়ে গুণে-টুনে বললে যে হ্যাঁ, সাপ আছে। ধরতে পারবে? পারবো। আরম্ভ হ'লো ওদের কাজ, আমরা সবাই পরম উত্তেজিত দর্শক। যে-কোনো মুহূর্তে ফোঁস ক'রে বিরাট ভুজঙ্গ মাথা তুলতে পারে মনে ক'রে আমরা প্রথমে একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিলুম, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও যখন কয়েকটা ছুঁচোর বাচ্চা ছাড়া কিছুই বেরুলো না, আমরা সাহস পেয়ে কাছে গিয়েই দাঁড়ালুম! ইট সরিয়ে এখানে-ওখানে খোঁড়া হচ্ছে, গর্তের মতো কিছু দেখা যেতেই আমাদের হৃদয়ে আনন্দে-আতঙ্কে-মেশা কম্পন লাগছে—এইবার। দু'তিনটা গর্তের মুখে কাগজ পুড়িয়ে ধোঁয়া দেয়া হলো, একটার মধ্যে সুধাকান্তবাবু দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে হাত ঢুকিয়েও দেখলেন—কিন্তু কোথায় সাপ! বোধ হয় আমাদের অসৎ অভিপ্রায় টের পেয়ে সে আগেই পালিয়েছে। বেলা এগারোটা অবধি রোদ্দুরে পুড়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলাম ঘরে, ··এর পরেও খোঁড়াখুড়ি খোঁজাখুজি চলেছে, কিন্তু খবর পেয়েছি যে রতনকুঠির সাপটিকে প্রকাশ্য দিবা-লোকে আত্মপ্রকাশ করতে আজ পর্যন্তও রাজি করানো যায়নি।

এদিকে কবির কানে উঠলো যে আমরা সাপের ভয়ে গর্ত খোঁড়াচ্ছি। এ-প্রসঙ্গে তিনি আমাদের যে-ক'টি কথা বলেছিলেন তার মধ্যে পরিহাসের লঘুতা ছিলো না। আমাদের মানসিক শান্তি পাছে নষ্ট হয় সেজন্য তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখলুম, আশ্বাস দিলেন নানা ভাবে। বললেন, 'পায়ের কাছে একটা সাপ ফণা উদ্যত ক'রে উঠলে ভয় পাবার কিছু নেই তা বলিনে, কিন্তু সত্যি ওরা ওদের মনেই থাকে, মানুষের এলাকা মাড়ায় না, এখানে এতদিনের মধ্যে ওরা কাউকে কিছু করেনি। তোমরা যে বাড়িতে আছো সেটায় আমি অবশ্য কখনো থাকিনি, কিন্তু তাছাড়া এখানকার প্রায় সব

বাড়িতে সব অবস্থায় থেকেছি, সাপ দেখেছি অনেক, কিন্তু কখনো কোনো বিপদ ঘটেনি তা তোমাদের বলতে পারি। তোমাদের মানসপটে এখানকার যে-স্মৃতি বহন ক'রে নিয়ে যাবে তা থেকে সাপের ছবিটা বাদ দিয়ো।'

কথাগুলো শুনে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেছিলুম। নিজেদের মনে হয়েছিলো অপরাধী। একটা প্রাণীকে তার স্বাভাবিক আশ্রয় থেকে টেনে এনে বিপর্যস্ত করায় আমাদের যে-উৎসাহ তাতে কোথায় যেন একটা হীনতা আছে, তখনকার মতো তা আন্তরিক-ভাবেই অনুভব করলুম।

সব-পেয়েছির দেশে ॥

গুরুদেবের খেয়াল-খুশি

সুধীরচন্দ্র কর

কবির বাতিক ছিল বায়োকেমিক। ওষুধ পরকেও বিলাতেন, কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ওর ব্যবহার-পদ্ধতিটাই ছিল দেখবার মতো। হাতের কাছে টেবিলের উপর সাজানো থাকত অষ্টপ্রহর শিশিগুলো, খানিকক্ষণ পরে-পরেই বাঁ হাত উপুড় করে নিয়ে ডান হাতের তেলোয় ঠুকে মুখে পুরতেন ঐ শিশি থেকে চার-পাঁচটি করে সাদা গুটিকা। শারীরিক পটুতা, মস্তিষ্কের স্নায়ু-সবলতা কতটা রক্ষিত হয় তিনিই জানেন, কিন্তু উঠতে-বসতে ঐ বায়োকেমিকই নিয়েছিল টেনে তাঁর বিশ্বাস ও অধ্যবসায়। সংগীত ভবনের সেতার-অধ্যাপক শ্রীসুশীল ভঞ্জের ডাক পড়ত মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি-চর্চায়।

খেয়াল খুশিগুলো ছিল অদ্ভুত রকমের। শরীরই নাকি আগে। শরীরের দিকেও খেয়াল ছিল। যে যা বলত, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যে গুরুদেব তাই করতেন। একবার কে বললে—রোজ-রোজ আমলকী ছেঁচে খাওয়া উপকারী। আশ্রমে আমলকী গাছ মেলা; তলায় তলায় ফলের ছড়াছড়ি। গুরুদেব হুকুম দিলেন, রোজ তাঁকে আমলকী ছেঁচে দিতে হবে। কিছুদিন পরে কলকাতায় আশ্রমের অভিনয়। গুরুদেবও যাবেন। সেবার তিনি অমনি গেলেন না, সঙ্গে নিলেন আমলকী। চাকরদের প্রধান কাজই দাঁড়ালো এতো-এতো আমলকী ছেঁচা। সবাই অবাক! করছেন কী গুরুদেব! তা, কে শোনে কার কথা! এমনি চলল কদিন—আমলকী সেবন। সহ্যেরও সীমা আছে। হঠাৎ দেখা দিল এমনি অসুখ, নিতে হল শয্যা! তখন ডাকো ডাক্তার, আনো ওষুধ। এদিকে নাটকে যাওয়া বন্ধ, গুরুদেব রেগে সারা! সে এক ব্যাপার।

যাক্, আমলকী বাতিল হয়ে গেল। তবু মৃত্যুর তিন-চার বছর আগেও স্বাস্থ্যের জন্য কত যত্ন—কাঁচা স্যালাড, কাঁচা সরষে পাতা প্রভৃতি চিবিয়ে খেতেন ভাতের আগে। সে সব বাগান থেকে তক্ষুনি তোলা হত; গোছা ধরে মূলসহ সাজানো থাকতো টেবিলে ডিসের পাশে।

ছিল আরেক ঝোঁক বাড়ি-তৈরি, আর বাড়ি-বদলানো। বৈচিত্র্যলিপ্সু কবির জন্যে বাড়ির পর বাড়ি তৈরি হত। এটাতে কিছুদিন, ওটাতে কিছুদিন থাকতেন। তাঁর ব্যবহারে লাগেনি আশ্রমে এমন পুরানো বাড়ি কমই আছে। দেহলীতে যখন ছিলেন, গ্রীষ্মের দুপুরে বারান্দায় বসে কবিতা লিখতেন। সেই রোদের ঝাঁজ, হা-হা করা গরম হাওয়ায় লেখার আবেশ নাকি গাঢ় হয়ে উঠত। দরজা জানালা বন্ধ, আরামে সবাই বিশ্রাম করছে, আর তিনি তাঁর ঘরে লিখে চলেছেন, হাতে একখানা হাত পাখা; এই ছিল তাঁর আগেকার ধারা। শেষ বয়সেও উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণ আশ্রয় করে গেলেন উদয়নে; গেলেন কোনার্কে; সেখানে ছোটো ছোটো কোঠা, ঠিক একজনের মতোই এক-একটির আয়তন। স্থান নিলেন মৃন্ময়ীতে। তারপরে শ্যামলী—মাটির বাড়ি; সেটা বৃষ্টিতে খানিকটা ধ্বসে পড়ল। তৈরি করালেন নূতন বাড়ি পুনশ্চ;—কিছুদিন থাকলেন, আবার দেখা দিল মনের অস্বস্তি,—গড়ে উঠল উদীচী। এইটিই তাঁর শেষ বাড়ি।

বাড়ি তৈরি করেও কোথাও কি স্থির থাকতে পেরেছেন,—নতুন বাড়িগুলো তাঁর যে-যার-মতো পড়ে থাকতো, তিনি ফিরতেন খুশিমতো এবাড়ি-সেবাড়ি। দেখা গেল—শ্যামলীর বারান্দায় পেতেছেন আসন। লেখার টেবিল, সাজসরঞ্জাম, বইপত্তর সব সামনে সাজানো। কদিন পরেই নেই, সবকিছু নিয়ে গেলেন উত্তরায়ণের দোতলায়, উঠলেন তেতলায়, আবার কবে এলেন একতলায়। কদিন বেশ চলল। একদিন তাঁর বৌমার স্টুডিয়ো

চিত্রভানুতে নিলেন স্থান—নয়তো উদয়নের জাপানী ঘরে (কক্ষটি অধুনা রবীন্দ্রভবনের অধিকার-গত)। কোনো বাড়ির সামনে কাঠ-গোলাপের রাশি রাশি ফোটা ফুল ঝরে পড়ছে, লাল কাঁকরের সড়ক শোভন হয়ে উঠেছে। স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের চাপড়া, পাশে পাশে সারিসারি হিমঝুরি ও মহানিমের গাছ,—বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় তারা শূন্যকে করেছে অধিকার। কোথাও আবার চার-পাশে নয়ন-ভুলানো মাঠ। এক এক জায়গা থেকে বাইরেকার এক এক রকম দৃশ্য।

কেবল বাড়ি-বদলানো নয়,—ঘর-সাজানো নিয়েও আরেক সমস্যা। কতদিন কতরকম ভাবেই না তার দৃশ্য বদলাল। একবার খেয়াল গিয়েছিল শিকে দিয়ে ঘর সাজাবেন। এখানে ওখানে ঝুলানো শিকে, শিকেয়-শিকেয় একাকার। মধ্যে বই, খাতা, বিছানাপত্তর সব কিছু। আবার ঠিক উল্‌টো হল, অনড় অচল ব্যবস্থা। তৈরি করালেন সিমেণ্টের খাট, সিমেণ্টের চেয়ার টেবিল ডেস্ক্। এখনো শ্যামলীর প্রাঙ্গণে তার একটা খাট রাখা আছে।

অভিনয়ে গিয়েছেন কলকাতায়। কি মনে হল—বলে বসলেন, সাদাসিদে ভাবে থাকবেন। কম্বল হবে শয্যাসম্বল। সঙ্গে সঙ্গে কম্বলওয়ালার আমদানি হতে লাগল দলে দলে। মোটা খসখসে দিশি কম্বল। গদি উঠিয়ে পঁচিশ-ত্রিশখানা কম্বল পাতা হল, তৈরি হল বিছানা। শুধু কি তাই, মেজেয় কম্বল, জানালায় কম্বল। কম্বলে জোড়াসাঁকোর ঘর ভরা। এদিকে কদিন পরেই শুরু হয়ে গেল ছট্‌ফটানি। —খেয়ে ফেল্‌লেরে ছারপোকা! ঝাড় বিছানা-পত্তর, রোদে দে, ধুয়ে দে গরমজলে, মেরে ফেল, শিগগির মেরে ফেল ওই আপদগুলোকে ইত্যাদি। করা হল সবই। কোথায় ছারপোকা! আসল কথা, কম্বলের কুট্‌কুটে রোঁয়া-ফোটার জ্বালা। গা উঠল চুলকুনিতে ফুলে। তাঁর ধারণা—এ ছারপোকারই খোঁচা।

চাকরের দল রোজ সেই পঁচিশ-ত্রিশখানা কম্বল রোদে দিতে লাগল, তবু অসোয়াস্তির শেষ নেই। তখন হল মশার দোষ। এল ফ্লীট্, ঘর-দোরে তো দেওয়া হলই, বললেও অবিশ্বাস জাগবে—সোফায় তিনি বসে থাকতেন চোখ বুজে,—আর তাঁর চাকররা তাঁরই হুকুমে দরজা-জানালা সব এঁটে ঘর অন্ধকার করে নিয়ে মশামাছির লোপের জন্য তাঁর অমন গায়ে অবধি ছড়িয়ে দিত সেই অপূর্ব জিনিসটি। পিচ্‌কারী ভরে ভরে প্রায় জবজবে করে ভিজিয়ে তুলত জোব্বাগুলি। এমনি কদিন গেল। তবু রোগশয্যার পূর্ব অবধি কম্বলের গদিই ছিল বহাল। তাঁর প্রতিদিনকার জীবনী আলোচনা করলে টুক্‌রো-টাক্‌রা এমনি কত কথা, কত ঘটনা কতজনের মনে পড়বে।

শুকনো দেশ বীরভূম, ঘরবাড়ি সবই মাটির দেয়াল আর খোড়ো চালের। অগ্নিকাণ্ড তাই এ অঞ্চলের সাধারণ ঘটনা। জলাভাবে আগুন নেবাবারও পথ নেই। এক একবার লোক সর্বস্বান্তও হয়ে যায়। এর থেকে উদ্ধার পেতে হলে একমাত্র উপায়—ইটের ছাদ তোলা। কিন্তু দরিদ্র সাধারণের পক্ষে তা সহজ নয়। কবি এই সমস্যার কথা খুবই চিন্তা করতেন। এ নিয়ে তাঁর শিক্ষা-প্রসঙ্গেও আলোচনা আছে। শেষে তিনি এক পথ বের করেছিলেন। দেয়াল তো মাটির থাকেই, ছাদটিকেও মাটির করে নিলে আগুনেরও ভয় থাকে না, আর সহজেও কাজ চলে। অথচ দেশীয় উপকরণে দেশীয় মজুরের দ্বারা কাজটা হওয়ায় পয়সাও বিদেশে যায় না। আবার বীরভূমের অসহ্য গরমের হাত থেকেও অনেকটা বাঁচা যায়। চরকা-খদ্দরের ধারাতেই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও এতে রয়েছে। খেটেখুটে সাধারণ লোক নিজেরাই অবসর সময়ে বাড়ির সংলগ্ন জমি থেকে মাটিটা তৈরি করে ছাদ গেঁথে নিতে পারে। তবে, পথের কথা বললেই হবে না, হাতে-কলমে সেটা করে দেখালে লোকের যদি গরজ হয়। নিজের ঘরটিকেই তিনি

আগাগোড়া মাটির করতে চাইলেন। পাশের গাঁ ভুবনডাঙা থেকে গৌরদাস মণ্ডল এল মিস্ত্রী। তৈরী হল তার থেকে শ্যামলী। নববর্ষে হল কবির গৃহপ্রবেশ। আশ্রমের ভিতরে কলাভবনের ছাত্রাবাসও তৈরি হয় সেই থেকেই মাটির ছাদ দিয়ে। আগুনের হাত থেকে বাঁচা গেল তো পড়া গেল জলের হাতে। বর্ষায় ছাদ যায় ধ্বসে। কিন্তু কবি দমেননি। নূতন বাড়ি তাঁর জন্য আরো তৈরি হয়েছে। কিন্তু পুরোনো ঐ শ্যামলীর ছাদ আবার তিনি মাটি দিয়েই শক্ত করে গড়েছেন, আবার তাতে বসবাস করেছেন।

শেষ বাড়ি উদীচী, দোতলা দালান। কিন্তু একমাসের মধ্যে তা তৈরি হয়ে ওঠে ঐ নববর্ষের বিশেষ জন্মতিথিটিতে কবির গৃহ-প্রবেশের তাড়াতেই। দিনরাত্রি চলেছিল রাজমিস্ত্রীদের কাজ। শেষে ঘরের মেজেতে আগুন জ্বেলে শুকোতে হয়েছিল ঘরের স্যাঁতসেঁতানি।

খেয়াল-খুশির ভাবটা মানুষের সাধারণ বৃত্তি। কারো কম, কারো বেশি। প্রতিভার খেয়ালের দিকটা চিরকালই লোকের পক্ষে আগ্রহজনক। কুতূহলের সঙ্গে হলেও এই দিক দিয়ে সাধারণ মানুষ তাঁকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে এগোবে। তারপরে তো আছেই তাঁর বড়ো কথা, বড়ো পরিচয়।

ছুটি এলে ছেলেরা ছোটে বাইরে; কবিও তাদের মতোই হতেন উৎসুক—একবার বাইরে ঘুরে আসা যাক্। দার্জিলিং, কালিম্পং, মংপু, পুরী,—না হয় অন্ততঃ বরানগর, চন্দননগর—কিছু না-হয় তো কলকাতার জোড়াসাঁকো, চৌরঙ্গী, খড়দা! গঙ্গায় বোটে থাকতেন। ছুটি কাটত। বাড়ির বহুদিনকার এক বোটের নাম ছিল 'পদ্মা'। একবার সেটা মেরামত হচ্ছিল। খড়দার গঙ্গার উপর এক বড় দোতলা বাড়ি, কবি সেখানে পূজোর সময়টা কাটাচ্ছিলেন। বৌমা প্রতিমা দেবী ও নাতনী পুপে কবির সঙ্গে ছিলেন।…এই সময়টিতেই 'মালঞ্চ' বইখানির অধিকাংশ লিখিত

ও সংশোধিত হয়। শরৎ চট্টোপাধ্যায় মশায় এসেছিলেন সেবার কবি-সাক্ষাতে।

শান্তিনিকেতনে যেবার থাকতে হত, অনেকবার ঠাঁই-বদল হিসাবে শ্রীনিকেতনে নিতেন আশ্রয়। একটা কিছু পরিবর্তন চাই-ই।

আশ্রম থেকে তাঁর যাওয়া মানে,—সে যেন উৎসব ভেঙ্গে দেওয়া। ছুটি থেকে এসে আবার জমাতেন উৎসব। না যেতে পারলে কি করুণ দশা হত! যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁরাই করেছেন উপভোগ। কিছুতে আরাম নেই; ছমছমে ভাব, না হয় অভিমানের আভাস দেখা দিত তাঁর নিরীহ ভাবের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ভাবটা হত এই যে,—এই তো বেশ লাগছে, স্থান কাল পাত্র কিছুরই অপেক্ষা নেই! ছুটি কি শুধু-একটা মানুষের বাইরের জিনিস? সে তো বস্তুলোভীদের জন্যে,—কবির ভাষায় যারা বায়ু-বদলের বায়ুগ্রস্তদল।—তারা ছুটির জানে কি? ছুটি হচ্ছে মনের একটা মুক্তিস্নান; তার জন্যে পয়সা এবং রেল-যোগের চেয়ে চক্ষু এবং মনো-যোগটাই বেশি দরকার। একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় গিয়ে আমরা নূতনকে দেখি, নূতন হই। দেখার চোখ থাকলে দেখা যায়,—গ্রীষ্মে যে শান্তিনিকেতন, বর্ষায় সে কি তাই থাকে? নূতন পুষ্প-পল্লব তার পুরোনো হতে না হতেই শরতের কাঁচা রৌদ্র আভা সোনায় ভরে দেয় তৃণ-প্রাঙ্গণ। হেমন্তের হিম-শুভ্রজালে এই ধূলার রাজ্যেই জাগে মায়াপুরী। শীতের গৈরিক আস্তরণে, বসন্তের হরিৎ মেখলায়, রাগরঙ্গের নিত্য নব আয়োজনে নূতন মহাদেশ সৃজিত হয়ে উঠেছে মাঠে-ঘাটে, এই তো দেখছি কত চোখের উপরই। নূতন কত পাখি, কত গান, আকাশের কত রং—একি শুধু চোখের দৃশ্য-বদল। হাওয়া-বদল যেমন আবহাওয়ায়, তেমনি মানুষের মেজাজে। ছুটির কাজ তো এখানে বসেই হচ্ছে। তবে আর ছুটতে যাই কেন পয়সা খরচ করে? নিকড়িয়া হাওয়া-বদল

হয় ঘরে বসেই। জিত কি কবিরই নয়? পূজোর ছুটিতে বাইরে যাবেন। বারবার বাধা পড়ল, যাওয়া স্থগিত হল, প্রতিক্রিয়া ঘটল ছুটির এই রকম দর্শন-আবিষ্কারে। লেখা হল পত্র, লেখা হল কবিতা।···লেখালেখি চুকে যাওয়ার পর সেবারও বাইরে ছুটলেন—অল্পদিনের জন্যেই, তবু তো বাইরে যাওয়া!

একবার ছুটিতে বাইরে থাকার সময়, চন্দননগরেই চোখে পড়েছিল একটি ঘর;—দেওয়ালে হাঁড়ির গাঁথনি। সেইরকম করে শ্যামলীর পেছনে উত্তরপূর্ব কোণের কোঠাটি তৈরি করালেন, হাঁড়ি-গুলোর পিঠের দিক রইল বাইরে। মুখের দিক দেওয়ালের মধ্যে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল। ওর গহ্বরের মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে আসতে আসতে গরম হাওয়ার ঝাঁজটা মিইয়ে যায়। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসে, ঘর ঠাণ্ডা রাখবার এই অভিনব প্রণালী সমর্থন করেছিলেন।

এ সব তো গেল তাঁর খেয়ালের দিকের কথা। তাঁর মনের মতো কিছু হলে খুশির লক্ষণটি ছিল, চেয়ারে বসা থাকলে, গা একটু এলিয়ে দিয়ে ঘন ঘন পা-দোলানো। প্রস্তুত হয়ে ওঠার লক্ষণ ছিল সশব্দ গলাঝাড়া। যখন-তখন, উত্তরায়ণ কাঁপানো শব্দ আশ্রমের বহুদূর অবধি শোনা যেত।

একটি দৃশ্য প্রায়ই সবার চোখে পড়ত—হাত দুখানি পিছন দিকে, দেহ ঈষৎ সামনে ঝুঁকে আছে, পা অবধি আলখাল্লা—বাসন্তী নয় পলাশ রঙের, সাদা চুল, সাদা দাড়ি, চলেছেন কবি অঙ্গন পেরিয়ে—হয় উদয়ন থেকে শ্যামলীতে, না-হয় শ্যামলী থেকে উদয়নে। মধ্যে কোথাও থামা নেই, গতিতে কোথাও বৈষম্য নেই—একটানা সোজা গন্তব্য তাঁর নিশানা।

চারিদিকের বাগানে ফুল, টেবিলের ফুলদানিতে ফুল, ফুলের মালা, কবির পরিবেশ সুগন্ধে ভরা। প্রসাধনে ওডিকোলন ছাড়া আর কিছুর ব্যবহার ছিল না।

কবিকে গা-খোলা অবস্থায় বাইরে বড়ো একটা দেখা যায়নি। ঘরে কোনার্কে স্নানের পূর্বে একখানি সাদা তোয়ালে গায়ে দিয়ে কবি ওষধি-তেল মালিশ নিতে তৈরি হয়েছেন, সে-ফাঁকে দু-একবার স্বর্ণকান্তিচ্ছায়া নেহাৎ কাছের লোকের চোখে পড়েছে। পা ছুঁয়ে কবির স্পর্শ পেয়েছে লোকে প্রণামে, আর পেয়েছে বৈদেশিকেরা করমর্দনে। প্রসন্ন মনে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন, অনেকের কাছেই সে সৌভাগ্যের স্মৃতি অবিস্মরণীয়।

কবির প্রসন্নতা পাওয়াও সবক্ষেত্রে সহজ ছিল না। শান্তি-নিকেতনে 'রবীন্দ্র-পরিচয় সভা' ছিল। সে সভা একবার স্থির করে কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্ববারের 'জয়ন্তী উৎসর্গে'র মতো করে একখানি সংকলন-গ্রন্থ কবিকে অর্ঘ্য দেওয়া হবে। অনুরাগী ও বিশিষ্ট লেখক-মণ্ডলীর নিকট অনুষ্ঠানটির প্রস্তাব ও রচনা-আহ্বান নিয়ে নিমন্ত্রণ গেল। শুভদিন এগিয়ে আসছে। উদ্যোক্তাদের চেষ্টা বাড়ছে। কথাটা কবি জানতে পারলেন। প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে তিনি বিরক্তি দেখাচ্ছিলেন। ধরে নেওয়া যাচ্ছিল ব্যাপার তাঁকে নিয়ে, সংকোচ তাঁর স্বাভাবিক। সপ্তাহখানেক আগে, কবি দারুণ উগ্র হয়ে উঠলেন। কারু কথায় কান দিলেন না। নিজে ইংরাজি ও বাংলায় পাল্টা চিঠির মুসাবিদা করলেন, আমন্ত্রিতবর্গের নিকট তা ডাকে পাঠালেন। বোধ হয় খবরের কাগজেও তা দিয়েছিলেন। জানালেন, এ অনুষ্ঠান তাঁর অনভিপ্রেত, কেউ যেন রচনাদি না পাঠান। সকলের শুভেচ্ছালাভই তাঁর একমাত্র কাম্য। বলেছিলেন,—শান্তিনিকেতনে কোনোক্রমেই আমার পূজা চলবে না। আগ্রহের মুখে নিগ্রহের চূড়ান্ত। উদ্যোক্তাদের সেবার এক নূতন অভিজ্ঞতা হল। তাঁর নিষেধ-পত্রখানি অনেকের নিকট এখনও থাকতে পারে।

কবি-কথা॥

কবিগুরুর গল্প

নরেন্দ্র দেব

রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনের সবাই বলেন 'গুরুদেব'। আমরা বলি 'কবিগুরু'। বাইরের লোক বলে 'রবীন্দ্রনাথ', 'রবিঠাকুর'। আর বিদেশীরা বলে 'টেগোর'।…একমাথা ঝাঁকড়া বাবরি কাটা সুন্দর কোকড়া চুল ঋষির মতো গোঁফদাড়ি। যোগীর মতো বড় বড় জ্যোতির্ময় চোখ। বাঁশীর মতো নাক। দেবতার মতো লম্বা দেহ। তোমরা তাঁকে দেখতে পেলে না, এই বড় দুঃখ। তাঁর মিষ্টি গলা শুনতে পেলে না। শুনতে পেলে না তাঁর কথা, গল্প, গান, বক্তৃতা, আবৃত্তি। দেখতে পেলে না তাঁর অপূর্ব অভিনয়। হয়ত কেউ কেউ বলবে, হ্যাঁ আমরা কথা কওয়া সিনেমার পর্দায় তাঁর জীবন্ত ছবি দেখেছি ও কথা শুনেছি। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর গান ও আবৃত্তি আমরা এখনও শুনতে পাই। ঠিক কথা। তোমরা ভাগ্যবান। কবির কিছুটা পরিচয় তোমরা আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনার ফলে পেয়েছো। সে সময় 'টেপ রেকর্ডার' যন্ত্রটা ওঠেনি যে। নইলে তোমরা আজ তাঁর মুখের অমৃতময় ভাষণও পরিষ্কার শুনতে পেতে। যাক্‌গে, সেজন্য দুঃখ কোর না। তাঁর লেখা অনেক বই আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যও তিনি লিখেছেন। কিশোর-কিশোরীদের জন্যেও লিখে গেছেন।… শিশু, শিশু ভোলানাথ, সে, খাপছাড়া, ছড়া ও ছবি, কথা ও কাহিনী—কত বই লিখে রেখে গেছেন তিনি তোমাদের জন্য। তোমাদের জন্য নাটকও করেছিলেন তিনি। রাজা, মুকুট, ডাকঘর আরও কত কি।

রবীন্দ্রনাথকে দেশের অধিকাংশ লোক শুধু 'কবি' বলেই জানেন। অনেকে 'বিশ্বকবি' নামও দিয়েছেন। অবশ্য তিনি যে

বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু তিনি কবির চেয়ে কর্মী ছিলেন আরও বেশি। স্বদেশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা এবং স্বজাতির প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতি তাঁকে দেশের শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতি বিধানের কাজে টেনে এনেছিল। ইংরেজ সরকারের অধীনে আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে যে ভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হতো, সেটা রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করেন নি, তাই শান্তিনিকেতনের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রাচীন তপোবনের আদর্শে 'বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেদিনের সেই ছোট্ট পাঠশালাটি আজ 'বিশ্বভারতী' নামে এক সুবৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

এই বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের কাছে কত কি বই পড়ে, গল্প বলে, ছড়া, কবিতা ও গান শুনিয়ে নানা বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতেন। ছেলেমেয়েরা কবিকে ভয়ানক ভালবাসতো। একটুও ভয় করতো না, কিন্তু ভক্তি করতো খুব। এরাই কবিকে গুরুদেব নাম দিয়েছিল। আর এদের প্রভাবেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক ও অধ্যাপকরাও তাঁকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করতে সুরু করেন। তাঁকে গুরুদেব বলাটা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ না-করলেও শিক্ষকতার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করায় ওই 'গুরুদেব' নামটিতে আপত্তি করতে পারতেন না।

তোমরা কি জানো তিনি ছেলেবেলায় পাঠশালার গুরুমশাই সেজে খেলা করতেন? হাতে বেতের বদলে একটা কাঠি নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেন। বারান্দাটা হত তাঁর পাঠশালা। আর বারান্দার রেলিংগুলোকে করে নিতেন তাঁর পাঠশালার পড়ুয়া। খুব উৎসাহে তিনি সেই পাঠশালার পড়ুয়া রেলিংগুলোকে অ-আ-ক-খ শেখাতেন। রেলিং কি পড়তে পারে? কাজেই

তারা পটাপট বেত খেতো। কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে তিনি যখন সত্যি 'বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' নাম দিয়ে শান্তি-নিকেতনে পাঠশালা খুললেন, সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়া না পারলে বেত মারা একেবারে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের ভালবেসে পড়াতেন, আদর করে শেখাতেন। ছেলেমেয়েরাও তাই আনন্দের সঙ্গে হাসিখেলার ভিতর দিয়ে অনেক কিছু শিখতো। পড়াশুনো তাদের কাছে কোনদিনও তাই ভয়ের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি!

তোমরা সবাই নিশ্চয় এই খবর জানো যে, রবীন্দ্রনাথের লেখা গীতাঞ্জলি বইখানির ইংরাজি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়ে ইউরোপের বিদ্বজ্জন সমাজ তাঁকে 'নোবেল পুবস্কার' দিয়েছিলেন। 'নোবেল পুরস্কার' কেবলমাত্র সেই সব মনীষীদেরই দেওয়া হয় যাঁরা তাঁদের অসামান্য প্রতিভার গুণে এমন কিছু সৃষ্টি করে যান যা বিশ্বের লোকের কাছে কল্যাণকর এক অমূল্য সম্পদ্ বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু জানো কি রবীন্দ্রনাথ যখন মাত্র একটি কিশোর বালক তখন তিনি একটি গান লিখে তাঁর মহান্ পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঁচশ' টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। ছোট্ট ছেলে তিনি, ভগবানের উদ্দেশে সে গানখানি রচনা করেছিলেন।

'নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছো নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমায় পায় না জানিতে রয়েছো হৃদয়ে গোপনে।'

সেই বালকের লেখা এই গানটি আজও অনেক ভক্ত সাধকের কণ্ঠে শোনা যায়। কবি ছেলেবেলা থেকেই গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন।

একটা গল্প বলি শোনো। শান্তিনিকেতনে যে সব ছেলেদের অভিভাবকরা পড়তে পাঠাতেন, তাদের কারুর বাড়ীতে বা স্থানীয় স্কুলে কিছুই পড়াশুনো হচ্ছে না দেখে, অশান্ত বালকদের শান্ত করবার একটা বোর্ডিং মনে করে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাই অনেক সময় দুঃখ করে বলতেন, আমার ভাগ্যে এমন একটিও ভাল ছেলে শান্তিনিকেতনে পাইনি যাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মনের মত আদর্শ মানুষ করে দিয়ে যেতে পারি। একটি ছেলে এই সময় বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল, দুষ্ট ছেলে বলে যার খুব-একটা অখ্যাতি ছিল। সে একদিন বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা না মেনে একটা অন্যায় কাজ করে ফেললে। সবাই তাকে ভয় দেখালে, তোমার আজ ভীষণ শাস্তি হবে। সে কিন্তু একটুও ভয় পেল না।

কবির কানে যখন এই খবর গিয়ে পৌঁছলো, তিনি ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। সে নির্ভয়ে কবির সামনে এসে দাঁড়ালো। কবি তার নির্ভীক আর বেপরোয়া ভাব দেখে একটু হেসে বললেন, 'ওহে বীরপুরুষ, তোমার নামে আমার কাছে তোমার সহপাঠীরা একটা গুরুতর নালিশ এনে পৌঁছে দিয়েছে, তারা বলছে তুমি নাকি একটা কিছু ভয়ানক অপরাধ করেছো। আমি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিনি। তোমার মতো একজন সাহসী ছেলে কী কখনো এ কাজ করতে পারে? নিশ্চয় তোমার নামে ওরা মিছে কথা বলেছে।'

ছেলেটি এতক্ষণ মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়েছিল। কবির কথা শুনে তার মাথা এবার হেঁট হয়ে গেল। সবিনয়ে জানালে, 'সহপাঠীদের অভিযোগ মিথ্যা নয়। আমি সত্যই অপরাধ করেছি। হয়ত আমি এ অপরাধ করতুম না। কিন্তু ওরা বললে ও কাজ করা বারণ। এ নিষেধ অগ্রাহ্য করতে কেউ সাহস পাবে না। এই কথা শুনে আমার মাথায় রোক চেপে গেল। কেউ যা করতে সাহস পায় না, আমার তাই করে বাহাদুরী দেখাবার ইচ্ছা হয়। আমি অন্যায় করেছি। আমাকে শাস্তি দিন গুরুদেব।'

কবিগুরু ছেলেটির কথা শুনে খুশী হয়ে বললেন, 'তুমি যে মিথ্যা বলে তোমার অপরাধকে আর বাড়াওনি এবং গুরুতর শাস্তি পাবে জেনেও সত্য স্বীকার করবার সাহস দেখিয়েছ, এতে আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তোমার অপরাধ ক্ষমা করলুম। তোমার উপর

আমার এ বিশ্বাস আছে যে, ভবিষ্যতে তুমি আর কখনো এমন অন্যায় করবে না। নিয়ম অমান্য করায় কোনও বাহাদুরী নেই জেনো। নিয়ম মেনে চলতে পারাটাতেই বাহাদুরী বেশী।'

ছেলেটি গুরুদেবের পায়ে মাথা লুটিয়ে বললে, 'আমি আর কখনো এমন অন্যায় কাজ করবো না।'

কবিগুরু তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'আমি তা জানি। বীরপুরুষেরা কথা রাখে।'

কথা সে ছেলেটি সত্যিই রেখেছিল। বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে সে যতদিন ছিল কখনো আর কোন অন্যায় করেনি। এমনি করে অগাধ বিশ্বাস ও স্নেহ ভালবাসা দিয়েই কবিগুরু দুষ্টু ছেলেদেরও সহজে বশ মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। তারা লেখাপড়াও করতো, খেলাধূলাও করতো, গান গাইতো, ছবি আঁকতো, বাঁশীও বাজাতো। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার দুষ্প্রবৃত্তি তাদের আর হত না। রূঢ় তিরস্কার আর কঠিন শাস্তি অনেক ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণ চরিত্রকে সংশোধন করতে পারে না। জেদী একগুয়ে ছেলেরা মার খেলে আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের সাজা পাওয়ার ও বকুনি খাওয়ার ভয় ও লজ্জা চলে যায়। কবিগুরু তাই বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের অশিষ্ট বা অশান্ত ছাত্রদের কঠোর শাস্তি বিধানের পক্ষপাতি ছিলেন না।

অনেকেরই ধারণা ছেলেমেয়েরা বেশী আদর পেলে বাঁদর হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিগুরু দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আদর পেয়ে কত বাঁদর শান্তিনিকেতনে মানুষ হয়ে উঠেছে।

'মনোনীত হলে ছাপাবেন' মৈত্রেয়ী দেবী

আমার যখন বার বছর বয়স তখন আমি প্রথম তাঁর নিকটে আসবার সুযোগ লাভ করি। তখন কবি বার্ধক্যের সীমায় দাঁড়িয়েছেন, তবু দীর্ঘ দেহ তখনও নুঁয়ে আসেনি। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তখনও তিনি চলাফেরা করেন, সভাগৃহে উদাত্ত কণ্ঠস্বর উর্ধ্বে চলে যায়। অসুস্থতা, জীর্ণতা তখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বেশীর ভাগ সময় শান্তিনিকেতনেই থাকতেন। মাঝে মাঝে কার্যোপলক্ষে কলকাতায় এলে বিচিত্রাগৃহ উৎসবে, পাঠে, আলাপে মুখরিত হ'য়ে উঠত।···আমরা তখন ভবানীপুরে থাকতুম। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (মাসিক 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক) মহাশয় আমাদের বাড়ির কাছেই টাউণ্ডসেণ্ড্ রোডে একটা বাড়িতে থাকতেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই সান্ধ্য ভ্রমণ উপলক্ষে আমাদের বাড়ী আসতেন ও কবির সম্বন্ধে নানা গল্প করতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'কবি' বলেই উল্লেখ করতেন। 'রবীন্দ্রনাথ', 'রবিবাবু' বা অন্য কিছু বলতে বড় শুনিনি। রোজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের তুই অসমবয়স্ক বন্ধুর মধ্যে কবির গল্প হত। প্রথম যখন 'গোরা' উপন্যাসখানি লেখা হয় তখনকার গল্প করতেন। একখানি উপন্যাস সময়মত প্রবাসীর জন্য লিখবেন এই অনুরোধ জানিয়ে অগ্রিম মূল্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তাতেই যে এই বৃহৎ অপূর্ব রচনার জন্ম এজন্য সম্পাদকের মনে আনন্দ মিশ্রিত গর্ব ছিল। কবি তখন মাসে মাসে নিজ হাতে কপি করে 'গোরা' পাঠাতেন—তাঁর স্বহস্ত লিখিত সেই পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে বলে দুঃখ করতেন। যখন এই সব পুরানো দিনের গল্প রামানন্দবাবুর কাছে শুনতাম খুবই ভাল লাগত। কিন্তু তখনও জানতাম না যে প্রবাসীর জন্য লেখা নিয়ে কবির সম্পাদকের দ্বারস্থ হওয়া আমিও শীঘ্রই দেখতে পাব।

সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির কাছে একদিন রামানন্দবাবু বলেছিলেন, 'রোজ আমাদের আপনার গল্প হয়, মৈত্রেয়ী আপনার গল্প শুনতে খুব ভালবাসে, আর আমাকেও যে একটুকু স্নেহ করে সে আমি আপনার গল্প করি বলে।' কবি সে কথা শুনে স্নিগ্ধ হেসে গভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন।··· বাল্যকালের অস্বচ্ছ কুয়াসা ভেদ করেও সে দৃষ্টি আজও আমার স্মরণ আছে। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল। তিনি অধিকাংশ সময়েই কারু দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না। নানা রকম কথাবার্তা আলাপ আলোচনার মধ্যেও দৃশ্যপট ছাড়িয়ে থাকত তাঁর সমুজ্জ্বল দৃষ্টি দূরের দিকে নিবদ্ধ। যা দেখেছেন তাকে অতিক্রম করে যেত সে-দেখা, তাই বোধ হয় এত বেশী করে দেখতে পেতেন। ছেলেবেলায় সেজন্য মনে মনে ভারি অভিমান হত। আমার সঙ্গে কথা বলছেন অথচ সে যেন আমার সঙ্গেই নয়। একই সময়ে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েও অসীমে মুক্ত সেই আত্মা, একই সময় গভীর মমতাপূর্ণ অথচ নির্মম সেই সন্ন্যাসীচিত্তকে বোঝা তখনকার অভিজ্ঞতায় সম্ভব ছিল না। তাই যখন কোনো বিশেষ কারণে তিনি চোখ ফিরিয়ে তাকাতেন, সে দৃষ্টি স্নেহপূর্ণই হোক, ভর্ৎসনাই হোক, বা কৌতুকই হোক মনে তা একটি পুলকিত উত্তপ্ত অনুভূতি নিয়ে আসত। তাই বলছিলুম রামানন্দবাবুর কথা শুনে সেই যে তিনি স্নেহময় হেসে তাকালেন—আজও তা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

তার কিছুদিন পূর্বে মহাসমারোহে নূতন মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হয়েছে, কবির নূতন রচনা 'নটরাজ'কে সঙ্গী করে। তারপর ধারাবাহিক ক্রমে 'যোগাযোগ' প্রকাশিত হচ্ছে বিচিত্রায়। এছাড়াও প্রতিমাসেই থাকছে নূতন নূতন কবিতা। প্রতিদ্বন্দ্বিনীর জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক হয়ত তখন প্রবাসীর তহবিলে কিছু ঘাট্‌তি পড়ছে। সেইসময়ে একদিন গ্রীষ্মকালের

দুপুর বেলা বাইরে তখন চোখ ঝলসানো রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে—সাড়া পেয়ে উঠে এসে দেখি রামানন্দবাবুর বাড়ির ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে। সে বললে, 'বাইরে রবিবাবু এসেছেন।' কয়েক মুহূর্ত নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কী আশ্চর্য! তাও কি সম্ভব, এ কি হতে পারে! এই দুপুরের রোদে এমন হঠাৎ—না না এ অসম্ভব? তবু দ্রুতপদে বাইরে এসে দেখি বারান্দায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

আনন্দে ও বিস্ময়ে বাড়িসুদ্ধু লোক আত্মহারা! অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন অতিথি দ্বারে! তিনি বললেন, 'রামানন্দবাবু অভিমান করেছেন, তাই একটি নূতন লেখা নিয়ে নিজের হাতে তাঁকে দিতে এসেছিলুম। জানতুম তোমরা কাছেই আছ, ভাবলুম একবার দেখে যাই।' আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। তার পূর্বে এবং পরেও অনেকবার দেখেছি, যখন লেখা পাঠাতেন সেই সঙ্গে সম্পাদকের কাছে যে চিঠি থাকত তাতে প্রায়ই লেখা থাকত, 'মনোনীত হলে ছাপাবেন' বা ঐ জাতীয় কিছু! লেখা পাঠিয়ে যে অনুগ্রহ করছেন এমন ভাবতো থাকতই না। একটা পাণ্ডুলিপি প্রবাসীতে প্রেরিত এখন আমার কাছেই রয়েছে তার পিছনে কবি রামানন্দবাবুকে লিখেছেন, শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার এই লেখাটি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে প্রবাসীতে ছাপাবেন। ইতি—৮ই নভেম্বর ১৯২৯। আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।...

একে বিনয় বলব কি না জানি না, এই তাঁর এক আশ্চর্য ক্ষমতা জীবনের নানা দিকে, নানা ব্যবহারে বার বার দেখেছি। নিজকে তিনি তাঁর চারপাশের সাধারণ সকলের সঙ্গে এক ভূমিতে মিলিত করতেন, প্রতিভার যে সুদূর উচ্চতা তাকে যেন আমলই দিতেন না।

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুকে বললাম, 'সম্পাদকের দরজায় লেখক আজ নিজেই লেখা নিয়ে উপস্থিত, অমনোনীত করে দিন!' খুব খুশী ছিলেন সেদিন সম্পাদক মহাশয়,

ঠাট্টা করে বললেন, 'কবি বুঝি তোমায় এই কথা বলেছেন? আমি যদিচ একেবারে অকবি। তবু অমন কথা বলতাম না, বলতাম, 'তোমাকেই দেখতে এসেছিলাম, লেখার কথাটা উপলক্ষ্য।' যতদূর মনে হয় সেদিন যে লেখাটা তিনি নিয়ে এসেছিলেন সেটি 'শেষের কবিতা'র আরম্ভ অংশ, তবে ভুলও হতে পারে।....

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, কবি গল্প করেছেন, সরলা দেবী তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা, আগেই বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছিলেন 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি প্রহসন প্রকাশিত হবে। তারপর চিঠি লিখলেন, বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছি এখন উপায় কি! কবি গল্প করেছিলেন, 'আমি লিখলুম তা যখন ছাপিয়েই দিয়েছ তখন উপায় কি লেখা যাবে!' এই হল 'চিরকুমার সভা'র জন্ম ইতিহাস।

শ্রদ্ধেয় জগদীশচন্দ্র বসু তখন কবিগৃহে অতিথি। তাঁর চিত্ত-বিনোদনের জন্য কবি 'পণ', 'ফেল্' প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট ছোট গল্পগুচ্ছের গল্প লেখেন। কবি বলতেন, 'দুপুরবেলা তিনি (জগদীশচন্দ্র) খেয়ে দেয়ে ঘুমোতেন, আমার উপর হুকুম হোতো ঐ সময়ে একটা গল্প লিখে রাখব, উনি বিকেলে চা খেতে খেতে শুনবেন। করতুমও তাই।'

এমন অপরূপ রসসৃষ্টি এমন সব অদ্ভুত কারণে সুরু হয়েছে। সুধাক্ষরিত তাঁর লেখনীর যেমন বিরাম ছিল না, তেমনি যখন তখন যেমন তেমন আব্দারেও তা অভাবনীয় রসসৃষ্টি করত। আত্মীয় বন্ধু, গণ্যমান্য ব্যক্তির অনুরোধও যেমন, অপরিচিত বালক বালিকার অটোগ্রাফের খাতাও প্রায় একই প্রশ্রয় পেত।

যখন তাঁর নানা দিকের নানা ভাবের বিপুল কর্মপ্রয়াসের কথা ভাবা যায়, তখন এই ছোট ছোট ঘটনাগুলির বিস্ময় মনে ফুরাতে চায় না।

কবি সার্বভৌম ॥

হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সহজ মানুষ হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথের কথা বলি। গল্পে, কৌতুকে, রসালাপে তাঁর মতো আসর জমাতে পারে কারুকে দেখিনি। জীবনে যে-সব মনীষীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, হাস্যরস তাঁদের কার কিরকম তার একটা তালিকা করেছি। পূর্ণমান একশ' ধ'রে রবীন্দ্রনাথকে একশ'র মধ্যে একশ' দিয়েছি। তালিকাতে চিত্তরঞ্জন দাশ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাজশেখর বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের নাম আছে। এঁদের কাকে কত দিয়েছি তা আর প্রকাশ করলুম না।

একজনের হাস্যরস আর একজনের ফুটিয়ে তোলা কঠিন; তবু কয়েকটার উল্লেখ করছি।

বঙ্গভঙ্গ হয়েছে। সুপ্ত বাঙালী জেগেছে! দেশব্যাপী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ মেতে উঠেছেন, সভা-সমিতিতে যোগদান করছেন।

এই সময় নাটোরের মহারাজার কন্যার বিবাহ। রবীন্দ্রনাথ মহারাজার বিশিষ্ট বন্ধু। বিবাহের দিন সন্ধ্যায় মহারাজা দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করছেন। হন্তদন্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন, আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে।

মহারাজা বললেন, 'কবি, আমার কন্যাদায়, কোথায় আপনি সকাল-সকাল আসবেন, তা না, আপনি দেরিতে এলেন।'

কবি উত্তর করলেন, 'রাজন্, আমারও মাতৃদায়, দু'জায়গায় সভা করে আসতে হল।'

এক পঁচিশে বৈশাখ। কবি সেবার কালিম্পঙ-এ আছেন।

সকালে সহচর বললেন, 'গুরুদেব, আজ আপনার জন্মদিন, একটা উপহার দিতে চাই, আপনাকে নিতে হবে।'

'দে, কি দিবি।'

'আজ আপনারই রচিত একটি গান আপনারই দেওয়া সুরে গেয়ে আপনাকে শোনাব।'

'শোনা।'

গান শেষ হল। কবি খুব গম্ভীর ভাব ধারণ করলেন। বললেন, 'তুই আজকের দিনে আমাকে এতোবড় দাগা দিলি; তুই শুধু বললিনি কেন, 'আপনার তৈরি গান', আবার আমার দেওয়া সুর বললি কেন?'

খুব হাসাহাসি পড়ে গেল।

কবি স্মরণে ॥

প্রজাদের সঙ্গে

গীতা মুখোপাধ্যায়

ঠাকুরবাড়ির মস্ত জমিদারী ছিল উত্তর বাংলায়। কবি যখন বড় হলেন তখন বাবার আদেশে এই বিশাল জমিদারী দেখাশুনোর ভার পড়ল তাঁরই উপর। এর মধ্যে কবি ভারতের অন্যান্য জায়গায় গিয়েছেন, একবার বিলেতেও গিয়ে এসেছেন। কিন্তু জমিদারী দেখতে গিয়ে তাঁর সত্যিকারের পরিচয় হোল বাংলা দেশের গ্রামের সঙ্গে, গ্রামের সরল মানুষগুলোর সঙ্গে। কবি যেন দেশের অন্দরমহলে ঢুকতে পেলেন।

জমিদারীতে তাঁদের অনেক বড় বড় কুঠিবাড়ি ছিল। কিন্তু কবি ভালবাসতেন নদীর উপর বোটে করে থাকতে। এই বোটে থেকে দেশের প্রকৃতিকে, দেশের মানুষকে তিনি যেন মনের কাছাকাছি পেতেন। এই সময়ের অনেক কথা তিনি লিখেছেন চিঠিপত্রে। 'ছিন্নপত্র' বইতে এক জায়গায় আছে, 'কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা ও চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেকছে সে আর কী বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বুড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখাসাক্ষাৎ হ'ল। সে ও বললে 'এই-যে'। আমিও বললুম 'এই-যে'। তারপর দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি, আর কোন কথাবার্তা নেই। জল ছল্ ছল্ করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক চিক করছে; বালির চর ধূ ধূ করছে, তার উপর ছোট বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ; এবং ঝাউ-ঝোপ থেকে দুটো-একটা পাখীর চিক চিক শব্দ, সবশুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব। খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু আর কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর।...বড় বড় নদী কাটিয়ে

আমাদের বোটটা একটা ছোট নদীর মুখে প্রবেশ করেছে। দুই ধারে মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে এবং ভিজে কাপড়ে এক-মাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী কাঁখে নিয়ে ডান হাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে; ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্ছে, 'একবার দাদা বলে ডাক্‌রে লক্ষ্মণ।' উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্ছে।'

এমনি করে গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরতে গ্রামের আকাশ বাতাস গ্রামের মেয়ে পুরুষের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ঘটিয়েছিল তা তাঁকে মানুষ হিসাবেও সাধারণ লোকদের কিছুটা কাছাকাছি এগিয়ে এনেছিল।

তখনকার দিনে রাজায় প্রজায় কত না তফাৎ। জমিদার বাবুদের কাছে মনের কথা বলতে কাছে আসতে পর্যন্ত সাহস করত না গরীব প্রজারা। নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, পেয়াদাতে ঘেরা জমিদারবাবু থাকতেন বহুদূরের লোক।

জমিদারী দেখতে গিয়ে কিন্তু পুরানো নিয়ম তিনি বেশ কিছুটা আলগা করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সেই সব ব্যবহারের অনেক গল্প এই এলাকার লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' বই-এ এরকম অনেক গল্প আছে।

তারই একটি গল্প হোল পুণ্যাহ'র কথা। পুণ্যাহ হোল বছরের প্রথম যে দিন জমিদারী কাছারীতে খাজনা জমা নেওয়া হয় সেই দিনটির নাম। ঠাকুরবাড়ির জমিদারীর সদর কাছারিতে শিলাইদহে যখন পুণ্যাহ হোত তখন এক মস্ত জাঁকজমকে উৎসব চলত তিনদিন ধরে। পুণ্যাহর দিন মস্ত এক ঘরের ভিতর পড়ত জমিদারের সিংহাসন। প্রজাদের জন্য থাকত আলাদা আলাদা আসন। বাজনা বাদ্যির মধ্য দিয়ে জমিদার মশাই এসে ঝলমলে সেই সিংহাসনে বসতেন। ভগবানের নাম করে তাঁর কাছে

আশীর্বাদ চাওয়া হোত। তারপর পুরোহিত উঠে প্রজাদের কপালে টিকা পরিয়ে দিতেন। জমিদার মশাই প্রজাদের দুটো মিষ্টি কথা বলতেন। প্রজাদের মধ্যে যাঁরা মোড়ল আর আমলাদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা জমিদারমশাইকে দিতেঁন, 'নজরানা'। নজরানা আবার কি? তার মানে হোল জমিদারের কাছে তাঁদের দর্শনী দিতে হোত। সোনার টাকা, রূপোর টাকা যার যেমন ক্ষমতা জমিদারমশাই-এর মান রাখবার জন্য প্রজারা দিতেন জমিদারের সামনে বিছানো বড় ভারী থালায়। তারপর জমিদারমশাই পুরোহিত ঠাকুরকে দক্ষিণা দিতেন দই, মাছ, নতুন কাপড়, চাদর আর নগদ টাকা। প্রজাদের মধ্যে প্রথম খাজনা দেওয়া সুরু করবার জন্য একজন মোড়ল গোছের লোককে আগে থেকে বেছে রাখা হোত, তাঁকে বলা হোত 'পুণ্যাহ-পাত্র', মানে খাজনা দেওয়ার বউনি করবেন তিনিই। পুণ্যাহ-পাত্র প্রজা উঠে খাজনা দিতেন। তিনি পেতেন জমিদারের কাছ থেকে কাপড়, চাদর, দই, মাছ, পান। জমিদার মশাই তাঁর হাতে দিতেন ফুল, গলায় দিতেন শোলার মালা। এর পর বাকী প্রজারা একে একে খাজনা দিতেন। তিনদিন ধরে চলত গরীব প্রজাদের খাওয়ান দাওয়ান, চলত গান, যাত্রা, আরও কত কি!

কবি যখন প্রথমবার পুণ্যাহের সময়ে শিলাইদহ কাছারীতে এলেন তখন তিনি দেখলেন যে পুণ্যাহ উৎসবের শুভদিনে যে আসন পাতা হয় তারই মধ্যে রয়েছে মানুষে মানুষে তফাৎ করার ব্যবস্থা। জমিদার মশাই-এর জন্য থাকবে সিংহাসন। আবার বড়লোক গরীব-লোকেরা বসবেন আলাদা আসনে। বামুন, কায়েত, শূদ্র বর্ণ হিসাবে তাঁদের জন্যও আলাদা আলাদা আসন। হিন্দু মুসলমান তাঁদেরও আলাদা আলাদা আসন। এমনি করে পুণ্যাহের সুরুতে মানুষের সঙ্গে মানুষের হাজার রকম ফাঁক যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা!

কবি তো এ ব্যাপারে কোনও মতে সায় দেবেন না। বাজনা বাদ্যি বাজছে, সিংহাসন সাজানো রয়েছে, আসন ভর্তি—জমিদার মশাই রইলেন বাইরে দাঁড়িয়ে। কি ব্যাপার, কি ব্যাপার! মানুষে মানুষে আসনের এত তফাৎ তুলে দিতে হবে! নায়েব, ম্যানেজার বড় বড় আমলারা তো চোখ কপালে তুললেন। সে কি কথা! বাপ পিতামহের আমল থেকে চলে আসছে যে ব্যবস্থা তার কি নড়চড় করা যায়! প্রজারাও এই ব্যবস্থাই বরাবর মেনে নিয়েছেন, তাঁরা অবধি অবাক। যুবক জমিদারবাবুর মত ফেরাবার জন্য সবাই মিলে ঝুলোঝুলি! শেষে অনুরোধ উপরোধে যখন ফল হোল না, বড় বড় আমলারা হুমকি দিলেন। জমিদার যদি পুরানো আদব-কায়দা এমনি ভাবে ভাঙতে চান তো কাজ ছেড়ে দেবেন তাঁরা। কবি তবুও অটল রইলেন।

শেষ পর্যন্ত কবিরই জয় হোল। তাঁর অনুরোধে তুলে দেওয়া হোল আসনের তফাৎ। উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব, বামুন-কায়েত, হিন্দু-মুসলমান, জমিদার-প্রজা—সকলে এসে বসলেন মস্ত এক জাজিমের উপর। তবে সুরু হোল পুণ্যাহের কাজ। লোকে বুঝল ঠাকুরবাড়ির জমিদারীতে এবার এল এক নূতন আমল!

নায়েব ম্যানেজারের কাছে কোনও মতে সুবিধা করতে পারত না যে প্রজারা, তারা আকুল হোত কেমন করে 'বাবুমশাই'কে সামনাসামনি ধরা যায়। প্রজাদের কাছে কবি ছিলেন বাবুমশাই। গরীব বামুন চক্রবর্তী মশাই কি রকম ভাবে বাবুমশাইয়ের কাছে পৌঁছলেন সে আর এক গল্প।

চক্রবর্তী মশাই ছিলেন গ্রামের পুরোহিত। বেচারী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পূজো করে যা পেতেন তাতে তাঁর দিন চলত না। গরীব বামুনের না ছিল এক ছটাক জমি, না ছিল জমি করবার মত পয়সা। এদিকে ছেলেমেয়ে নিয়ে করেন কি? অনেক দিন

ধরে বামুন ভাবছেন কি করে বাবুমশাই-এর কাছে পৌঁছবেন। বাবুমশাই-এর বোট লাগানো থাকে নদীর উপর। ডাঙা থেকে জলের বাধাই তো শুধু নয়। মাঝখানে আছে নায়েব আর আমলারা, আছে দারোয়ান আর চৌকিদারের পল্টন! শেষকালে মরিয়া হয়ে বামুন একদিন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাতে সুরু করলেন। সাঁতরে গিয়ে বাবুমশাই-এর নৌকোর এক কিনারা ধরে ঝুলে পড়লেন চক্রবর্তী!

বোটের ভিতর হৈ হৈ! হল কি, হল কি? একদিকে কাত হল কেন নৌকো? কবি বলিলেন, দেখ দেখ। মাঝি মাল্লা দেখে নৌকোর কিনার ধরে ঝুলছে একটি লোক। বাবুর হুকুমে তাঁকে নৌকোয় তোলা হল! ভিজে কাপড় বদলাবার পর বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি?

বামুন বললেন, 'বাবুমশাই' দেবতার দুয়োরে মন্তর পড়ি ফুলজল ঢালি, তবু পেটতো ভরে না!' রসিক কবি বামুনের কাণ্ড দেখে মনে মনে হেসে বাঁচেন না! পরীক্ষা সুরু হোল বামুনের। যত মন্তর জানা আছে একে একে আওড়ালেন চক্রবর্তী। যদিও বিদ্যে পেটে নেই। তবু বাপ পিতামহের আমল থেকে মুখস্থ করা মন্তর, তার মানে সব জানেন বই কি? হাত পা ছুঁড়ে বুঝিয়ে দিলেন গণেশ পূজার মন্তর। দুর্গার খোকাটির বেঁটে, মোটা, হাতীমুখো চেহারাটি মন্তরের মধ্যে ঠিক ঠিক বলে গেলেন বামুন। দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরের লড়াই ডেকে-হেঁকে শুনিয়ে দিলেন চক্রবর্তী। কবি তো কেরামতীতে হেসে আকুল। বামুনের নতুন নামকরণ করলেন 'শিরোমণি মশাই'। সেই থেকে 'শিরোমণি মশাই' নামেই সবাই জানল চক্রবর্তীকে।

বামুন বললেন, 'হুজুর মন্তর তো হোল কিন্তু জমি একটু না হ'লে যে বামুন বাঁচে না।' কবি হুকুম লিখে দিলেন কাগজে, 'শিরোমণি মশাইকে বিনা নজরে পাঁচ বিঘা জমি দিতে হবে।'

সেই হুকুমনামা নিয়ে চক্রবর্তী মশাই যখন নায়েবের কাছে পৌঁছলেন তখন আর তাঁকে পায় কে ?

এমনি করে 'শিরোমণি মশাই'-এর জমি হোল। আবার জমির উপর ঘর তুলবার পয়সাও আদায় হ'ল বাবুমশাই-এর কাছ থেকে !

পথে ঘাটে দেখা হ'লে কবি বামুনকে চিনতে ভুলতেন না। 'ভাল আছত শিরোমণি মশাই'—কবির ডাকের উত্তরে মাথাটি হেলিয়ে সে কি গর্বের হাসি বামুনের !

ঠাকুরবাড়ি জমিদারী এলাকায় বিরাট বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যখন প্রজারা কষ্টে পড়ল তখন কবি বহু চেষ্টায় সকল শরিককে বুঝিয়ে একলক্ষ টাকা খাজনা মাপের হুকুম দিয়েছিলেন তাঁদের জমিদারীতে, সেকালের প্রজারা সেকথা ভুলতে পারেনি।

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ ॥

মা বিষাদ

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

শীতকাল। সকালবেলা 'শ্যামলী'তে গিয়েছি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি একলা বসেছিলেন বারান্দায়, সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে। প্রণাম করে একটা মোড়া টেনে নিয়ে পাশে বসলাম। কথাবার্তা চলছে, এমন সময় হঠাৎ তিনি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'বারণ করে দাও, চলে যেতে বল ওকে।'

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। আশেপাশে কেউ নেই। রাস্তার দিকে তাকিয়েও কাউকে আসতে দেখলাম না। এদিকে তিনি অধৈর্য হয়ে বারবার বলছেন, 'চলে যেতে বল, এক্ষুনি যেতে বল।'

তাঁর চোখেমুখে, গলার স্বরে ক্রোধ না বিরক্তি, না আর কিছুর লক্ষণ? মনে হল, ক্রোধবিরক্তি দুই-ই হয়ত আছে, কিন্তু সে গৌণ। একটা অসহ্য বেদনা-বোধ যেন তাঁর মুখের সমস্ত শিরা উপশিরাকে আকুঞ্চিত করে তুলেছে। খুব একটা নির্মম করুণ দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়লে আচম্‌কা আমাদের সমস্ত অনুভূতি শিউরে উঠে যে অবস্থা হয়, এও ঠিক তাই! অথচ, কোথায় কি ঘট্‌ল, কিছুই ঠাহর করতে না পেরে আমার অবস্থা হয়ে উঠল অত্যন্ত করুণ।

কেউ যেন না মনে করেন যে, তত্ত্বান্বেষী দর্শকের মত তখন আমি তাঁর চোখমুখের ব্যঞ্জনা থেকে ধীরেসুস্থে মনোভাব বিশ্লেষণ করার বিলাস উপভোগে নিবিষ্ট ছিলাম। তাঁর উত্তেজনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজের অজ্ঞাতসারে তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে পড়েছি এবং যন্ত্রচালিতের মত তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের রাস্তার দিকে রওনা হয়েছি, ফটকের কাছে আসতে বোধ হয় আমার এক সেকেণ্ডের বেশি লাগেনি আর ঐ এক সেকেণ্ডের মধ্যেই উল্লিখিত চিন্তাধারা তড়িৎপ্রবাহে মাথায় ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করেছে।

ফটকে এসেও কোন উল্লেখযোগ্য দৃশ্য চোখে পড়ল না বা লোকজন কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু একটি নিরীহগোছের চাষাভূষো শ্রেণীর গাঁয়ের লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল। আমি আবার যন্ত্রচালিতের মত একবার ঐ লোকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসুভাবে ফিরে তাকালাম গুরুদেবের দিকে। তিনি অস্থিরভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ লোকটিকেই। ওকে এক্ষুনি যেতে বল এখান থেকে।'

লোকটিকে বিদায় করে দিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা গেল না। একটি অতিসাধারণ গ্রাম্যলোক, দড়িবেঁধে কতকগুলো মুর্গি ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে বিক্রী করতে। অস্বাভাবিক কিছুই না দেখে ভাবলাম, হয়ত আগে কোনদিন এই লোকটি অন্যায় কিছু করে থাকবে। সেই কথা মনে পড়াতেই তিনি এত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ফিরে এসে কাছে বসতেই বললেন, 'এ আমি সইতে পারিনে। নিরীহ পাখীগুলোকে নির্দয়ভাবে বেঁধে রেখে আমার চোখের সামনে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কতদিন বারণ করেছি এদিকে আসতে।'

তখনো তাঁর চোখমুখে ক্লিষ্ট বেদনাবোধের চিহ্ন সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারলাম।

গ্রাম থেকে মুর্গিওয়ালা মুর্গি বেচতে আসে—পায়ে দড়ি বাঁধা, মাথা নীচের দিকে ঝোলানো, মুগি কোঁ কোঁ করছে, হয়ত বা আতঙ্কে আর যন্ত্রণায়। এ দৃশ্য ত আমরা অহরহ চোখের সামনে কতই দেখছি। আমাদের চোখে অস্বাভাবিক কিছু ঠেকে না। মনে ভাবান্তরও কিছু ঘটে না। কিন্তু এতে যে একটা নিষ্ঠুর, করুণ মর্মান্তিক দিকও আছে, আর মানুষের অনুভূতি যে তাতে কতো গভীরভাবে বিচলিত হয়ে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথকে সেদিন ঐ অবস্থায় না দেখলে হয়তো চিন্তাও করতে পারতাম না।

দুর্বল, অসহায়ের প্রতি সবলের যে পীড়ন, তাতে বীর্য নেই

আছে নিষ্ঠুরতা, মর্মান্তিকতা এবং পৌরুষের লজ্জাকর গ্লানি। একথা রবীন্দ্রনাথ আজীবন কতোভাবেই বলে এসেছেন। কিন্তু তার পিছনে আন্তরিকতা যে কতো গভীর ও ব্যাপক, তার একটু ইঙ্গিত পাওয়া গেল সেদিন।

মনটা যখন শান্ত হল, তখন তিনি ধীরে ধীরে বললেন তাঁর বাল্যকালের এক দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা। সে কত দীর্ঘকাল আগের ঘটনা, কিন্তু বলতে গিয়ে তার ক্লেশকর স্মৃতি পঁচাত্তর বৎসরের রবীন্দ্রনাথকে যেন আবার নতুনভাবে উদ্বেলিত করে তুলল। আমাদের পক্ষে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

কাব্যের ভিতরে রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি আমরা বহু বিচিত্ররূপে। দেখেছি সেখানে তাঁর মর্মভেদী হৃদয় বেদনা অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের জন্য সম্প্রসারিত। দেখেছি, ধর্মের নামে মানুষের নৃশংস রক্তলোলুপতার বিরুদ্ধে তাঁর রুদ্রমূর্তি, অসহায় মূক পশুদের দুঃখে বিগলিত তাঁর করুণার বাণী।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবজীবনের করুণার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারিক জীবনের কতটুকু ঐক্যসূত্র ছিল? যে দরদী মনের পরিচয় পাই তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে, দৈনন্দিন জীবনের আচারে ব্যবহারে তার সঙ্গে কতটা মিল ছিল? এসব কথা জানবার আগ্রহ সকলের পক্ষেই থাকা স্বাভাবিক।

পাখী, খরগোশ প্রভৃতি নিরীহ প্রাণীশিকার রবীন্দ্রনাথ সইতে পারতেন না। এই ধরনের শিকার সম্বন্ধেই তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ঘটেছিল বাল্যকালে। তার কাহিনী সেদিন তন্ময় হয়ে বসে বসে শুনলাম তাঁর নিজের মুখ থেকে।

রবীন্দ্রনাথ তখন এগারো-বারো বৎসরের বালক। উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে হিমালয়ে যাবার পথে শান্তিনিকেতনে এসেছেন। সেই তাঁর প্রথম শান্তিনিকেতনে আসা। সেখানে মহর্ষির পরিচারক ছিল হরিশ মালী। এই হরিশ মালী একদিন

তাঁকে বলল, 'বাবু শিকার করতে যাবে নাকি, চল।' শিকার সম্বন্ধে বালক রবীন্দ্রনাথের তখন যে অস্পষ্ট ধারণা, তাতে আছে শুধু নির্ভীক সাহস এবং সুনিপুণ তৎপরতার গৌরব; এর যে একটা নিষ্ঠুরতার মর্মান্তিক দিকও থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে তখনও তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অত্যন্ত উৎসাহে হরিশ মালীর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চললেন তার সঙ্গে।

শান্তিনিকেতন থেকে মাইল দুয়েক দূরে সুরুল গ্রামের পাশে চিফ সাহেবের কুঠির ধ্বংসাবশেষ লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। পিছনে খোয়াই, তার গা ঘেঁসে চলে গেছে যে পথ, একদিন লোক চলাচলের কলরবে যা ছিল মুখর, আজ তা অনাদৃত, স্তব্ধ। নির্জন প্রান্তরের বুকে ভগ্ন প্রাসাদের ঐশ্বর্যকে আশ্রয় করে ঘিরে উঠেছে ঘন বন, সেখানে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বাসা বেঁধেছে নানা জাতের পাখী, মাটিতে ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে চলাফেরা করছে খরগোশ। চূণবালিখসা জীর্ণ অট্টালিকার শূন্য ঘরে ঘরে মানুষের বসবাসের স্মৃতি যেন নিশ্চিহ্ন-প্রায় অতীত যুগের অন্তরাল থেকে কথা বলে উঠতে চায়, কিন্তু ভাষা গেছে হারিয়ে, তাই দাঁড়িয়ে আছে বোবার মত। চারদিক থেকে লতাজাল এসে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার পূর্ব ইতিহাসকে। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন এই লোকবর্জিত বাড়িটি তার সমস্ত অস্পষ্ট রহস্যের পরিবেশ নিয়ে রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীর মত রবীন্দ্রনাথের কিশোর কল্পনাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে তুলল। তিনি শিকারের কথা, হরিশ মালীর কথা, এমন কি এই পরিদৃশ্যমান জড়জগতের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মত কী যে ভাবতে আরম্ভ করলেন তিনিই হয়তো জানেন না।

ঝোপের মধ্য থেকে হঠাৎ একটি সন্ত্রস্ত খরগোশ যেমনি বেরিয়ে দৌড়ে গেল অমনি হরিশ মালীর অব্যর্থ লক্ষ্যে তার দৌড় বন্ধ হল। ঘন বনের মধ্যে এই ছোট্ট চঞ্চল প্রাণীটির চকিত পলায়ন দৃশ্যের এই প্রথম অভিজ্ঞতা যেমন তাঁকে বিস্মিত করেছিল তেমনি এক মুহূর্তে

তার এই হঠাৎ জীবনের অবসান তাঁকে কঠোর আঘাত দিয়েছিল, কেন না এর নিষ্ঠুরতা তিনি ঘটনার পূর্বে স্পষ্ট করে কল্পনা করতে পারেননি। তারপরে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে দীর্ঘপথ হরিশ মালী এই খরগোশের মৃতদেহ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল, বালককে তারই অনুবর্তন করে চলতে হল। এই পথ তাঁর পক্ষে দুঃসহ বেদনার পথ হয়েছিল।···

তারপর তাঁর জীবনে একবার মাত্র যে শিকার তাঁকে দেখতে হয়েছিল সে বাঘ শিকার। তখন তিনি ছিলেন তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে। খবর এল পাড়ার বনে বাঘ আশ্রয় নিয়েছে। দাদা চললেন বন্দুক নিয়ে শিকারে। এই বিপজ্জনক অধ্যবসায়ে তাঁর বালক ভ্রাতাকে সঙ্গে নিতে দ্বিধা করলেন না। বোধকরি ভয়ভাঙানোর শিক্ষায় তিনি তাঁকে দীক্ষিত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সঙ্গে ছিল রাজবংশী বিখ্যাত শিকারী ভৃত্য। তার হাত থেকে কোনদিন কোন বাঘ কখনও নিষ্কৃতি পায়নি।

বনের মধ্যে একটা মোটা বাঁশের শাখা কেটে কেটে সোপানের মত করা হয়েছে। সেই কাটা ডাল বেয়ে গাছে চড়লেন দু-জনে। পূর্বরাত্রে বাঘের জুটেছিল ভূরিভোজন। আরামে জঙ্গলের মধ্যে যেখানে সে ছিল নিদ্রামগ্ন সেখানে আলোছায়ার ধাঁধায় তাকে স্পষ্ট দেখা দুঃসাধ্য ছিল। শিকারী গাছের তলায় বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল। বারবার তার সংকেতের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঘের দেহের একটা অংশ দেখতে পেলেন। সাবধানে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়তেই তার মেরুদণ্ডে লাগল গুলি। সে আর উঠতে পারল না। শুয়ে শুয়ে ল্যাজ আছড়িয়ে গর্জন করে ঝোপটাকে আন্দোলিত করে তুললে। আহত বাঘের ছটফটানির মধ্যে করুণা ছিল না, ছিল ব্যর্থ ক্রোধের আস্ফালন। আরও দুই একটা গুলি মারার পর যখন নিশ্চিত হল তার মৃত্যু, তখন শঙ্কাযুক্ত গ্রামবাসীদের আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হ'ল চারদিক।

উপরের কাহিনীটি শোনার দু'তিন বৎসর পর লিপিবদ্ধ করে সংশোধনের জন্য গুরুদেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম। লেখাটি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই গুরুদেব সংশোধন করে দিয়েছিলেন। আর এই সম্পর্কে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন—

'বালককালে চিফ সাহেবের ভাঙা কুঠিতে খরগোশ শিকারের নিদারুণতা চিরকালের মতো আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।'

ঐ চিঠিতে আরো লিখেছিলেন, 'আমাদের চরে পাখী মারা সম্বন্ধে আমার নিষেধ ছিল।'

এই নিষেধ প্রথম প্রবর্তন করা সম্বন্ধেও একটি কাহিনী আছে। শুনেছিলাম শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে।

ছেলেবেলায় রথীন্দ্রনাথ একটু ক্ষীণস্বাস্থ্য ছিলেন। এই কারণে স্নেহশীল পিতার মনে উদ্বেগ ছিল যথেষ্ট। রথীন্দ্রনাথের বয়স যখন দশ-বারো বৎসর তখন একবার তিনি শিলাইদহে ছিলেন কিছুকাল। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেখানে। শিলাইদহে এসে রথীন্দ্রনাথ পদ্মার উন্মুক্ত চরে খুব ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদেরই জমিদারীর অন্তর্গত বিস্তীর্ণ সেই চর—তৃণশস্যহীন, নির্জন, জল বেধে আছে এখানে সেখানে। জলচর পাখীদের নির্ভয়ে বিচরণ সেই লোকালয়বহির্ভূত নিভৃতে। স্বভাবতই শিকারীদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল সেই সব জায়গায়। রবীন্দ্রনাথের অনুচরদের মধ্যেও এরূপ সন্ধানী শিকারীর অভাব ছিল না। তাদের প্ররোচনায় পদ্মাচরের বিলে পাখী শিকারের নেশা সহজেই সংক্রামিত হ'ল রথীন্দ্রনাথের মনে। তিনি প্রায়ই বন্দুক ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়তেন শিকার অন্বেষণে। পুত্রের এই পাখী শিকার প্রবৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ণ হতেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। তাঁর এই নীরবতার কারণ আর কিছুই নয়—শিকার উপলক্ষ্যে দৈহিক পরিশ্রম অভ্যাস, মনের স্ফূর্তি উপভোগ এবং পদ্মার জলসেবিত স্বাস্থ্যবহ বায়ুসেবন, এই সমস্ত অনুকূল

পরিবেশের সংযোগে ক্রমেই রথীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যোন্নতি হচ্ছিল যথেষ্ট। কিন্তু অবশেষে একদিনের একটি ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ পিতৃস্নেহের দুর্বলতা পরিহার করে শাসনমূর্তি প্রকাশ করলেন কঠিনভাবে।

রথীন্দ্রনাথের শিকার অভিযানের প্রধান সহচর ছিল তাঁদের বোটের মাঝি একজন। সে ছিল অত্যন্ত উৎসাহী ও নিপুণ শিকারী। কিছুদিন থেকে চরে একজোড়া চখাচখির গতিবিধি শুরু হয়েছিল আনন্দকলরব নিয়ে। তাদেরই একটিকে একদিন প্রাণ হারাতে হল মাঝির অব্যর্থ গুলির সন্ধানে। অন্য পাখীটি প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু তারপর থেকে তার অবিশ্রাম করুণ বিলাপ যেন নির্জন চরে গুম্‌রে গুম্‌রে অবোধ কান্নার ঢেউ জাগিয়ে তুলল।··· বেদনার তীব্র গভীর অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁদের চরে পাখী শিকার নিষেধ করে দিলেন কড়া অনুশাসনের সঙ্গে।

রবি-তীর্থ॥

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শান্তিনিকেতনের শিক্ষায়তনের সঙ্গে আমার অনেক দিনের নাড়ীর টান আছে। ১৯০৩ সনের কথা বলছি। তখন এখানে এসেছিলাম এক গ্রীষ্মের ছুটিতে, আমার হাতের তৈরি (অর্থাৎ মিস্ত্রির হাত আর আমার বাৎলানো) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে, সেই ছুটির সময় সখের মাস্টারি করতে। তখন সরকারী অধ্যাপকের পদে বহাল হইনি। এইখানেই হয় আমার অধ্যাপনার হাতেখড়ি। তখন আমি নববিবাহিত, সস্ত্রীক এই আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। গুরুদেবের সঙ্গে নিকটতর পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই প্রথম। কিন্তু তু-দিনের জন্যে। কন্যার রোগবৃদ্ধির তুঃসংবাদ পেয়ে তিনি আলমোড়া পাহাড়ে চলে গেলেন। কিন্তু সেই তু-দিনের স্মৃতি অমর হয়ে আছে। প্রথম দিন সন্ধ্যার পর আমাদের ঘরে এসে তাঁর 'বিনি-পয়সায় ভোজ' শীর্ষক রচনাটি আবৃত্তি ক'রে একটা হাসির ঢেউ তুলে দিয়ে গেলেন।

শান্তিনিকেতনের পুরানো বড়কুঠির অদূরে, কবির সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সেই নবোদ্ভিন্ন রূপটি মনে পড়ে।

খোলার চালে আর মাটির দেওয়ালে তৈরি ছোট ছোট ঘরের লাইনবন্দী একটি লম্বা কুটীর। সামনে মাটির দাবা; তার পাশে ছিল একটি একতলা পাকা বাড়ী, কতকটা সরকারী ডাকবাংলার মত। তিনখানি ঘর পাশাপাশি, মাঝের ঘরটা বড়। সামনে ধূ ধূ করছে কাঁকর-ভরা খোলা মাঠ। বাড়ীর এক পাশে ছিল একটা বেঁটে ত্রিভঙ্গ খেজুর গাছ। সেই বাড়ী এখন দ্বিতল লাইব্রেরি গৃহে পরিণতি লাভ করেছে। মাঝের ঘরটি ছিল আমাদের বিজ্ঞানাগার, বাঁ-দিকের ঘরটা হ'ল আমাদের আস্তানা,

আর ডানদিকের ঘরটিতে মাতুর পাতা। তুপুরে সে ঘরে আমাদের সাহিত্যিক মজ্‌লিশ বসত।

সকালবেলা ঐ মাঝখানের বড় ঘরটিতে চলত আমাদের বিজ্ঞানচর্চা। ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রির ছোটখাটো পরীক্ষা, আর সেই সঙ্গে তাদের ব্যাখ্যা; কতকটা কিণ্ডারগার্টেনের মত। কুয়োতলায় হ'ত স্নান, জল তুলে দিতেন ছাত্ররা।

তুপুরবেলা অসহ্য গরম। ডানদিকের ঘরে বসত আমাদের বৈঠক। একটা খসখসের পর্দা ছিল দরজায় ঝুলানো। বালতিতে থাকত জল, মাঝে মাঝে পিচকারি নিয়ে পর্দার সঙ্গে বিনা আবীরে হোলি খেলে আসতাম। বৈঠকে চলত পাঠ, কাব্যালোচনা ও গল্প। সেক্সপীয়রের তিনখানি নাটক—কীং লীয়র, সিম্বেলিন ও ম্যাক্‌বেথ পড়া হয়ে গেল মাসখানেকের মধ্যে, কতক বোঝা কতক না-বোঝার ভিতর দিয়ে। আমাদের প্রধান পাঠক ছিলেন আশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী।

সকালবেলা আমি ছিলাম বিজ্ঞানের উপাধ্যায় এবং তুপুরবেলা কাব্যালোচনায় ছেলেদের সতীর্থ। রোদ পড়ে এলেই আমরা দল বেঁধে বাহির হতাম মাঠে। প্রায় প্রত্যহই সেই সময়ে দেখা দিত বৈশাখী ঝড়। আমরা খালিপায়ে কোচার কাপড়ে মুখ ঢেকে সেই ঝড়ে উধাও হয়ে ছুটতাম। ঝোড়ো হাওয়ার প্রকোপ বেশী হ'লে উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে থাকতাম পড়ে, আর খেতাম বালি-কাঁকরের ছর্‌রাগুলি। মাঝে মাঝে তু-এক দিন অদৃষ্টে শিলাবৃষ্টিও জুটত। এই ধূলোতে মাষ্টার ছাত্রে ভেদাভেদ ছিল না।

স্নানের পর সবাই মিলে বসতাম মাঠে-ফেলা মস্ত একটা পুরানো তক্তাপোষের উপর। ছারপোকার দৌরাত্ম্য তাতে ছিল বলে তাকে রৌদ্রবৃষ্টির অন্তরায়ণে রাখা হয়েছিল। এই তক্তাপোষটি ছিল আমাদের গীতিবিতান। দিনুর (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) হাতে এস্রাজ, কণ্ঠে অমৃতলহরী। গানের পর গান চলেছে, বিরাম

নেই। খোলা আকাশের তলে সমুৎসুক শ্রোতৃবৃন্দের মাঝখানে সে গান অনির্বচনীয় মাধুর্য লাভ করত। এই ছিল মোটামুটি তখনকার রোজনাম্‌চা।

মনে পড়ে এক দিন দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে বসেছি আমাদের পাঠচক্রে, এমন সময়ে দিনু বললেন—আজ পড়া নয়। সকলে মিলে চাঁদা ক'রে একটি কবিতার মক্‌স করা যাক্। তথাস্তু। হঠাৎ কবিত্বের ভূত চাপল ঘাড়ে। এই পয়ারীয় চাঁদার ফণ্ডে প্রস্তাবক দান করলেন ঃ

এস্রাজ, শোনা আজ সুমধুর তান।
মধুর সঙ্গীতে তোর ভরে যাক্ কান।

সবাই চুপ। মনে মনে কিন্তু কবিতার জাঁতাকল ঘুরছে। দিনুর পাশেই বসেছিলেন সতীশচন্দ্র। তিনি আকর্ণসন্ধানে তাঁর জ্যা আকর্ষণ ক'রে ছাড়লেন মর্মভেদী বাণ ঃ

কহিল এস্রাজ শত কান করি খাড়া
এ গরমে গান কিরে, ওরে লক্ষ্মীছাড়া!

তার পরেই বসে আছি আমি। নাচার, গণ্ডায় আণ্ডা দিতেই হবে। বলতে হ'ল ঃ

তবে যদি শালী বলি মলে দাও কান,
গান বাহিরিতে পারে দুই-চারিখান।

সবাই মিলে হো হো ক'রে অট্টহাস্য। অতঃপর পাঠারম্ভ।

আর এক দিন মনে পড়ে, ঘোর ঘনঘটা, আমরা ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাঁপ দেবো ব'লে বাহির হয়েছি। এমন সময় মনে হ'ল, আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ে মাথায়। ঠাণ্ডা দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে নামল বৃষ্টি, সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের ঝিলিক আর হুঙ্কার। বুকে বাজ পেতে নেবার মত মরীয়া আমরা কেউ হইনি। সুতরাং একছুটে উত্তীর্ণ হওয়া গেল কুঞ্জবাবুর কুটীরে। তিনি সে সময়ে আশ্রমের সহযোগীদের মধ্যে এক জন। তাঁর কুঁড়ে ঘরের দাবায়
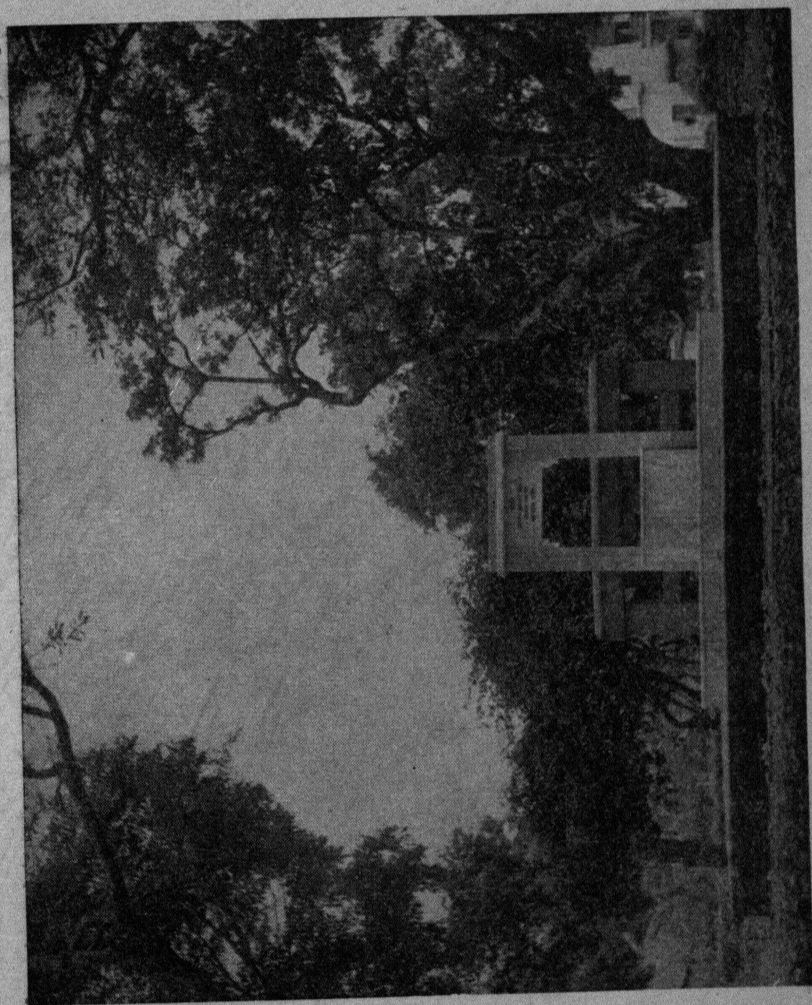
সকলে নিলাম আশ্রয়। মুষলধারে বৃষ্টি নামল! সময়টা কাটে কী করে। খেয়াল হ'ল একটা শারাদ (charade) অভিনয় করা যাক্। তাড়াতাড়ি দুই অঙ্কের এক নাটিকার খসরা ঠিক হয়ে গেল। গল্পটি নেই স্মরণে এইটুকু শুধু মনে আছে, সে হেঁয়ালী নাট্যের উত্তর হচ্ছে—'বিদ্যুৎ'। প্রথমাঙ্কে আছে 'বি' এবং দ্বিতীয় অঙ্কে 'দ্যুৎ'।

সেই সব দিনের স্মৃতি আজ জাগছে মনে। জ্যোতির্বিদের মুখে শুনি, এমন সব তারা আছে, যারা নিবে গেছে অনেক দিন, তবু তাদের দীপ্তি এখনও আমাদের চোখে অনির্বাণ। জীবনেও তাই হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনা, যারা কালের প্রবাহে ভাসমান নৌকার মত কোন্ দিগন্তে লীন হয়েছে, স্মৃতির সাগরে ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেসে আসে দীর্ঘ দেশ কাল পার হয়ে, তাদের গতিধারার উজান পথে।

পুরানো ফটোর অ্যালবমে আলেখ্যগুলি প্রায় সব যখন লুপ্ত-প্রায়, তখন দু-একখানা ছবি চোখে পড়ে যা কালের রবারের সংঘর্ষে একেবারে মুছে যায়নি, তাদর মুখশ্রী সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হয়ে আছে।

বিচিত্রা ॥

কঠোর শীত, কুয়াসার রাত। হাওয়ায় হাওয়ায় হু হু হাহাকার। দিকে দিকে শুষ্কতা শূন্যতা। এরই মধ্যে বীরভূমের প্রান্তরে জমে ওঠে জনতার ভিড়। বর্ষে বর্ষে আসে ৭ই পৌষ, পৌষ-সংক্রান্তি; পথে পথে চলে মানুষের সার, শোনা যায় গোযানের একটানা শব্দ। অজয়ের তীরে বাজে দেশী বাউলের একতারা, ভুবনডাঙার মাঠে মেলে ত্রিভুবনের বিচিত্র সুর। দেশী ও বিদেশী, পুরোনো আর নতুন, বিভিন্ন ধারা এক হয়ে যায় উৎসবে ;—কবি ও সাধকের তীর্থ শান্তিনিকেতন আর কেন্দুলি!

স্মরণীয়কে শ্রদ্ধা দেখাবার এটি আমাদের দেশী প্রথা। সভাসমিতি নয়, লেখালেখি নয়, বক্তৃতার ছড়াছড়ি নয়—সারা দেশ মিলে স্মরণতিথি উদ্‌যাপন। নানা উপলক্ষ্যে ভারতের অঞ্চলে অঞ্চলে মেলা বসে। দেশের প্রাণধারা সঞ্চালিত হয়। ভারতের সেই ধারাতেই চলে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসব।

৭ই পৌষ—তিনটি পবিত্র তিথির সংযোগ-দিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা-দিন বাংলা ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ। ৪৮ বছর পর এই দিনটিতেই শান্তিনিকেতনে মহর্ষিদেব মন্দির স্থাপনা করেন বাংলা ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ। পরমাত্মার পায়ে কেবল তাঁর একার আত্ম-নিবেদন নয়, বিশ্বের সাধকদের জন্য তিনি ক্ষেত্র তৈরি করে গেলেন। মহর্ষিদেবের ট্রাষ্টডীডে লেখা আছে—"ধর্মজ্ঞান উদ্দীপনের জন্য ট্রাষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাতপুরুষেরা আসিয়া ধর্মপ্রচার ও ধর্মালাপন করিতে পারিবেন। * * * এই ট্রাষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য

আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর ক্রয় করিয়া দিবেন।”

দশ বছর পর। রবীন্দ্রনাথ এই দিনটিকেই বেছে নিলেন। আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হল ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ। দিনটির তাৎপর্য গুরুদেব নানাস্থানেই ব্যক্ত করেছেন। একস্থলে বলেছেন,—‘শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি, তবে দেখতে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে, যে-বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে; সে হচ্ছে সেই দীক্ষা গ্রহণের বীজ।.........

এই সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন-আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন সৃষ্টি ক'রে তুলছে।”

মহর্ষিদেব ধর্মসাধকদের নিয়ে উৎসব শুরু করেছিলেন, গুরুদেব সেই উৎসবে ডেকে আনলেন বিশ্ববাসীকে। বহুপূর্বে আশ্রমে এ তিনদিন বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রগণ ষ্টেশনে যেত, আগন্তুকদের মোট বয়ে আনত। এখন যানবাহনের দিন। দুর্মূল্যের বাজার। আহার ও বাসস্থানের সদাব্রত আর তেমন সম্ভব নয়। কিন্তু ছাত্রছাত্রীগণ এখনো তেমনি সেবা-তৎপর। চারিত্রিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করিবার এই একটি বিশেষ সুযোগ। এটি তাদের পরম লাভ।

উৎসবের ক'দিন আশ্রমের আর-সব বিভাগই বন্ধ থাকে; শুধু কলাভবনের চিত্রপ্রদর্শনী এবং রবীন্দ্রভবনও কিছু সময়ের জন্য সাধারণকে দেখানো হয়। সকলের পক্ষে মেলাটাই একমাত্র সর্বক্ষণের অবাধ অনুষ্ঠান। দেশীয় প্রথায় বার্ষিক স্মরণতিথি পালন করাই এর সব নয়। মেলা-অনুষ্ঠানের আর-এক উদ্দেশ্য—মেলার পরিচ্ছন্ন আনন্দ-রূপটি ফোটানো। মহর্ষিদেবের ট্রাষ্টডীডে লেখা আছে—“এই মেলার উৎসবে কোনো প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস

ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে।”

গুরুদেব লিখেছেন—“আমাদের দিশী লোকের সঙ্গে দিশীধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ্য হইতে পারে···এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কী করিয়া যে দেশব্যাপী মঙ্গল-ব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

“আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষার আকর হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।”

দেশের ভদ্র শিক্ষিত এবং ধনীশ্রেণীর সঙ্গে দেশের বিপুল জনসাধারণের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সভাসমিতি করে সে যোগ সম্পূর্ণ হয় না। মেলার মাধ্যমে সে অভাব অনেকটা পূরণ হতে পারে। কিন্তু সে মেলা আজকালকার দূষিত মেলা নয়। শান্তিনিকেতনে ধনীনির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ সবার সমাগমের আয়োজন রয়েছে।

এখানে আশ্রমের কলাভবন থেকে ছবি মুখোশ মডেল প্রভৃতির দোকান দেওয়া হয়। কর্মবিভাগ শ্রীনিকেতন আনে হাতের কাজ, চামড়া ও বাতিকের কাজ; খোলে তাঁতের কাপড়, বইপত্র ও মাটির জিনিসের প্রদর্শনী। মহিলাসমিতি থেকে বসে সূচিশিল্প এবং খাবারের দোকান। বাইরের থেকে আসে বিশেষ বিশেষ কারুশিল্প, বয়নশিল্পের নিদর্শন। সিউড়ির মোরব্বা-মেঠাই আসে, মুর্শিদাবাদের তসর, গরদ, রেশম আসে; আসে বিহারের খদ্দর, পাবনার গেঞ্জি; খাগড়ার কাঁসা-পিতল, কৃষ্ণনগরের পুতুল, গয়ার পাথরের শিল্পনমুনা। এরই পাশে থাকে সাধারণের কাজ—সাঁওতালী

রুপোর গহনা, মাটি ও কাঠের জিনিস—হাঁড়ি-কলসী, দরজা-জানালা, নাগরদোলা আরো কত কী! পথঘাট মেঠাই-মণ্ডার দোকানে ভরে যায়। ভদ্রজন ভুলে যায় মান অহংকার; জনসাধারণ ভোলে কুণ্ঠা।...দেশের কবিগান, বাউলগান, যাত্রা, বাজিপোড়ানো তারই সঙ্গে সিনেমাও চলে। স্থানীয় সাঁওতাল ছেলেদের সঙ্গে সমবেতভাবে আশ্রম-বালকদের খেলাধূলা সকলের কৌতূহল বৃদ্ধি করে। বাইরের অনেক শিক্ষায়তন থেকেও ছাত্রদল আসে। গ্রামবাসীরাও এই ক্রীড়ামোদে যোগ দেন। একটা প্রদর্শনী খোলা কিংবা সভাসমিতি ডাকার চাইতে এ রকম সুন্দর একটি মেলার উপভোগ্যতাও যথেষ্ট।

একসময় ৭ই পৌষ উৎসবই ছিল আশ্রমের একমাত্র উৎসব। এখনও এটিই বৃহত্তম অনুষ্ঠান। প্রায় পাঁচ দিন ধরে এ উৎসব সম্পন্ন হয়। ৬ই পৌষ রাত্রিবেলা থেকেই মেলা-প্রাঙ্গণ সরগরম হয়ে ওঠে। নৈশ আহারের পর ন'টার বৈতালিক-গানে শালবীথি পরিক্রমা হয়। উৎসবের আমেজ লাগে।

৭ই পৌষের ভোর। সবে দু-একটি পাখি ডাকে, অন্ধকারে উঁকি দেয় অরুণরেখা, নিদ্রিতের সুপ্তিভেদ ক'রে বৈতালিকদলের আহ্বান বাজে—"জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী।"

সকালে মন্দিরে উপাসনা—উৎসবের শুভ উদ্বোধন হয়। পূর্বতোরণে এবার দীপ্তরশ্মি দেখা দেয়, মুক্ত দ্বার-পথে রোদ এসে পড়ে; মন্দিরের শুভ্র মেঝের উপর আলপনা শোভা পায়। ভিতর বাহির আলোয় আলোময়।

মন্দিরের অনুষ্ঠান শেষ হয়; গান গেয়ে সকলে আসেন ছাতিমতলায়। এখানেই মহর্ষিদেব তাঁর "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি" লাভ করেছিলেন। গুরুদেব থাকতে এখানেই গান শেষ হত। এখন উত্তরায়ণে কবির বাসগৃহ 'উদীচী'র কাছে গিয়ে গান থামে।

এরপরে মেলা আরম্ভ। মন্দিরের সামনে আমলকী বীথি, উত্তরায়ণের পুবদিকের মাঠ মেলার কলরবে মুখর হতে থাকে। বিকালে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থা 'আশ্রমিক সংঘে'র অধিবেশন হয়। এই উৎসবে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং কর্মীদলের অনেকে এসে একত্র হন। দেখাসাক্ষাৎ হয়, পরিচয় জমে, সম্মেলন-সভার শেষে সকলে মিলে গান :

আমাদের শান্তিনিকেতন
আমাদের সব হতে আপন।
আমরা হেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে।

৮ই পৌষ সকালে বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভার অধিবেশন হয় কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাতে অভিভাষণ দান করেন। এর পর ঐ সভাস্থলেই একই সঙ্গে হয় বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব। আম্রকুঞ্জে এই অনুষ্ঠান। প্রাচীনধারার অনুসরণ ক'রে অভিজ্ঞান-পত্রের সঙ্গে স্নাতকগণ সপ্তপর্ণী অর্থাৎ ছাতিমপাতার গুচ্ছ আশীর্বাদ পান। বিশিষ্ট কোনো অতিথির হাত থেকে এটি ছাত্র-ছাত্রীগণ গ্রহণ করেন। বিকালে চীনাভবনে চীনভারত মৈত্রী সমিতির বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়!

৯ই পৌষ আশ্রমিক মৃতব্যক্তিদের শ্রাদ্ধবাসর। একবেলা ভাতে-সেদ্ধ দিয়ে নিরামিষ আহারের রীতি।

১০ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর। যিশুখৃষ্টের জন্মদিন, বড়দিনের আরম্ভ। মহামানবকে স্মরণ ক'রে উৎসবে শেষ দিনের সন্ধ্যায় আবার সবাই মিলেন এসে মন্দিরে। কোনো কোনোবার ৯ই পৌষেই খ্রীষ্টোৎসব হয়ে থাকে।

সূর্য বিদায় মাগে, উৎসবের সুরে বাজে পূরবী। গোধূলির

ধূসর আলোয় মন্দিরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে গান—মানবপুত্র এসেছিলেন অমৃত হাতে নিয়ে। পার্থিব 'এ পাত্র বিষে ভরা'। তিনি ফিরেছেন ব্যথিত হয়ে। যুগে যুগে অমৃতের অধিকারীদের এমনিতরো লাঞ্ছনা।

উত্তুরে বায়ু। পৌষের আর্তসন্ধ্যা। জনবিরল মেলার মাঠ। গানের রেশ কেঁপে কেঁপে ফিরতে থাকে আকাশে বাতাসে। কুয়াসার ফাঁকে ক্ষীণরেখায় জ্বলতে থাকে ভাঙামেলার কোণে কাদের 'আগুন-পোহানোর' আলোকশিখা।

৭ই পৌষের ইতিহাস॥

গুরুদেবের চিত্রকলা

নন্দলাল বসু

সাহিত্যে তখন তাঁর জগৎজোড়া সুনাম, ধর্ম-রাজনীতি-সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তাশীল বলে তিনি পরিগণিত, শিক্ষাবিষয়ে তাঁর দুঃসাহসিক নিরীক্ষা দেশবিদেশের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং গানে-গানে তিনি জয় করেছেন জনগণের হৃদয়; ঠিক এই সময়ে গুরুদেব সুরু করলেন ছবি আঁকতে। তাঁর চিত্রকলার অন্দরমহলে যাঁরা প্রবেশ করতে চান, তাঁদের এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

বয়স সত্তরের সীমা ছুঁয়েছে, গুরুদেব হাতে তুলে নিলেন চিত্রকরের তুলি। সাহিত্য-সংগীতের সিদ্ধ শিল্পী তিনি জেনেছেন সামঞ্জস্য ও নির্বাচনের আন্তরতথ্য এবং গতি ও যতির সার্থক মূল্য। শিল্পের পক্ষে এই গুণগুলি অপরিহার্য, যা (জনৈক ইংরেজ সমালোচকের ভাষায়) 'প্রত্যক্ষ ও অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টি'-র পরিপোষক, যার সাহায্যে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। নট ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের এই সাধারণীকৃতীর ক্ষমতা প্রচুর ছিল। সুতরাং তুলি হাতে নেবার আগেই শিল্পীর তিনটি অপরিহার্য গুণ আয়ত্ত করেছিলেন—ছন্দের চেতনা, সামঞ্জস্যের চেতনা, আত্মলীনতার চেতনা।…

গুরুদেব প্রথম যৌবনে ছবি আঁকার চেষ্টা একবার করেছিলেন। সেসব ছবি, আমার মনে হয় খুঁজলে এখনও পাওয়া যেতে পারে। তবে পাকাপাকিভাবে ছবির হাতে ধরা দিলেন একেবারে সত্তরের সীমানায় এসে। সকলেই জানেন, কোনরকম অপরিচ্ছন্নতাই তিনি পছন্দ করতেন না, রচনার কোন অংশ কাটতে হলে পরিচ্ছন্নভাবে তার ওপর ঘন কালি লেপে দিতেন। ক্রমশঃ দেখলেন—ঐ অবগুণ্ঠিত কাটাকুটিগুলির মধ্যে ছন্দের বেশ একটা
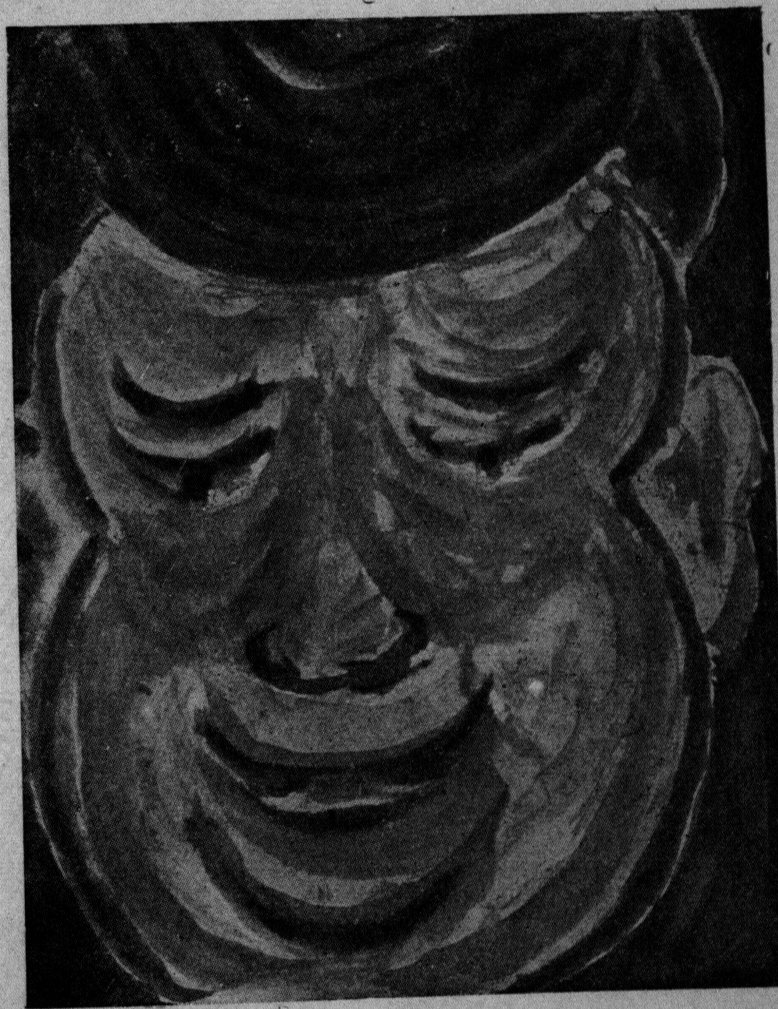
রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি

আদল ফুটে উঠেছে এবং ওদের এখানে-ওখানে একটু-আধটু কলমের আঁচড় দিলেই সেগুলি আকার নিচ্ছে, ফুল পাখী কিংবা জন্তুর রূপ ধরছে। এইভাবে ছবি আঁকার তাগিদ এল মনের মধ্যে এবং ধীরে ধীরে তা রূপ নিল রীতিমতো চিত্রশিল্পায়নে।

ছন্দ কবিতার সম্পদ্, কিন্তু কেবলমাত্র কবিতারই সম্পত্তি নয়। সব শিল্পেরই একটি ক'রে নিজস্ব ছন্দ আছে, যা না থাকলে তারা সার্থক হতে পারত না! ছবির যে সৌন্দর্য তাও বিভিন্ন ছন্দের সমীকরণের ফল। প্রয়োজন অনুযায়ী ছন্দের অদলবদল হয়, শিল্পী নতুন নতুন পন্থায় সমন্বয়ের পথ খুঁজে ফেরেন। আত্মপ্রকাশের জন্যে ছন্দের একটি স্বগত শক্তি থাকা দরকার, তা তার প্রাণশক্তি। গুরুদেবের ছবিগুলিতে ছন্দের এই প্রাণশক্তি দুর্মর বলিষ্ঠতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য ক্রমস্ফূত জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচারিতা, যে জীবন ক্লান্তিতে শীর্ণ নয়, সংগ্রামশক্তিতে উজ্জীবিত। তাঁর রেখা ও রঙ বিন্যাসে অবসাদ তাই অনুপস্থিত। এক আশ্চর্য সজীব প্রাণময়তা ছবিগুলির সহজাত গুণ। ভারতীয় শিল্পে এটি তাঁর একটি বিশিষ্ট অবদান।

রবি-বাউল

কালিদাস নাগ

বীরভূম জেলার আর এক নাম হবে কবি-ভূম। লক্ষ্মণ সেন যুগের অমর কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ রচনা করে নিখিল ভারতীয় মর্যাদা পান; উড়িষ্যা থেকে কেরল দেশ পর্যন্ত যেখানে গিয়েছি, স্থানীয় ভাষায় গীতগোবিন্দ গান করছে শুনেছি। তারপর বীরভূমেই দেখা দিয়েছেন দ্বিজ, দীন বা বড়ু চণ্ডীদাস নামে হয়ত তিনজন কবি যাঁদের পদাবলী বৈষ্ণবমাত্রেরই আদরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালে বিলাত যাত্রার পূর্বে এঁদের রচনা পড়েছেন ও 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' প্রবন্ধ লিখেছেন। তার আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কবি-পুত্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বেড়িয়ে গেছেন ও ছাতিম (সপ্তপর্ণী) গাছের তলায় বসে ব্রহ্ম-সাধনে গভীর শান্তি পেয়েছেন; তার পরিচয় রয়ে গেছে অধুনা বিশ্ব-বিদিত "শান্তিনিকেতন" (Abode of peace) নামে ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত সব গ্রন্থে ছাতিম পাতার নক্‌শায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শুধু নাম নয়, প্রথম অতিথিশালা স্থাপন ও তিনদিন অতিথি পরিচর্যার ব্যবস্থাও করে গেছেন, তাঁর রচিত Trust deed পড়ে আমরা সে সব জানতে পাই। ব্রহ্মোপাসনার মন্দিরও তিনি স্থাপনা করেন, সেখানে প্রতি বৎসর দেবেন্দ্র-দীক্ষা-দিন ৭ই পৌষ পালিত হয় এবং এখনো বিশ্বভারতীর সমাবর্তন ঐ দিনেই হয়।

১৯১০ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে I. A. পাশ করে বিবেকানন্দের কলেজে (Scottish Church) B. A. পড়া শুরু করি; তখন অগ্রজদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক-নট শিশির ভাদুড়ী ও ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি চাটুজ্যে; আরও ছিলেন ৺দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অরুণ সেন ও তাঁর বন্ধু সুধীরঞ্জন দাস (বর্তমান

উপাচার্য); এদের দুজন গুরুদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যরূপে শান্তিনিকেতনের ও সেকালের কথা অনেক শোনাতেন।

তার আগে বন্ধুর দল আমাকে টেনে নিয়ে যান City College তেতলার হল ঘরে। পুরনো সিঁড়ির ভিড় ঠেলে উপরে ওঠা এক সমস্যা, কারণ সবাই উৎসুক রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শুনতে। ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজর্ষি রামমোহন রায়ের তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে কবি তাঁর নিজস্ব প্রাণদীপ্ত ভাষায় বলে গেলেন, তার অনুলেখন রাখা হয়নি কিন্তু আমাদের মনে প্রাণে গাঁথা হয়ে গেল তাঁর ভাষণ। লেখার সঙ্কেত ও সামর্থ্য সেকালের কারো ছিল না তাই ভাষণ দিয়ে কবি নিজেই তার মর্মার্থ লিখে পাঠাতেন ও প্রধানত প্রবাসী পত্রিকায় আমরা পড়তাম।···

৮০ বছরের মধ্যে জীবনের শেষ ৪০ বছর (১৯০১-৪১) রবীন্দ্রনাথ এই শান্তিনিকেতনেই প্রধানত কাটিয়েছেন ; রবি-বাউল মার্গ-সঙ্গীত ছেড়ে অজস্র সহজ গান লিখেছেন,

'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে'

পদ্মার স্নিগ্ধ কোল ছেড়ে কবি আমাদের দেখালেন বোলপুরের পারুল-বন, উদাস করা সূর্যাস্ত, ঘন-সবুজ শাল-বীথিকা। আদিবাসী সাঁওতাল গ্রাম ও তাদের চিত্রিত কুটির যেন ছবির মতন তাঁর গদ্যে পদ্যে গানে নাট্যে চিরন্তন রূপ পেয়েছে।···

রবীন্দ্রনাথের ভাইবোনদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) ও স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)-দেরও বহুদিন দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ; বিশেষত এঁদের সর্বজ্যেষ্ঠ "বড়দাদা" শান্তিনিকেতন আশ্রমে বহুকাল কাটিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) তাঁর স্মৃতি অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন ; এক দিকে শিশুর মত সরল, কাঠবিড়ালী ও পাখীদের খাইয়ে আনন্দে বিভোর,

অন্যদিকে বঙ্কিম-যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি…এবং বাংলা short-hand 'রেখাক্ষর' বর্ণমালার প্রবর্তক এই বড়দাদা—ছিলেন যেন দুই শতাব্দীর যোগসেতু।

এই সব ভাইবোনদের একত্র দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯০৯ সালে ৬ই মাঘ, জোড়াসাঁকো-ভবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে। ১৯০৬ সালে স্বর্গারোহণের পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ দেখে গিয়েছেন—তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবি শুধু বাংলার নয় সারা ভারত-গগনের রবি ও গদ্যে পদ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, এবং মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের প্রাণস্বরূপ ও "স্বদেশী সমাজ" (১৯০৪) তথা জাতীয় পরিকল্পনার (planning) জনক ও বরেণ্য দেশনেতা। পারিবারিক শোক ও দাহনে যেন বিশুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি সোনা; সারা দেশকে তিনি মাতিয়েছেন তাঁর গানেঃ 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' পিতৃবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচিত গান শ্রাদ্ধবাসরে তিনি গাইলেন,

'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আসো।'

গানের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁরই প্রেরণায় কবি সুরকার ও নাট্যকার হয়ে ওঠেন…

পৈতৃক অর্শরোগে ভুগে কবি এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে বিলাত গিয়ে চিকিৎসা করাবেন তাই Mayo হাসপাতালের প্রধান সার্জন ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গেই কবি ভাসবেন সব ঠিক। কিন্তু আবার অসুখ বাড়ল ও ডাক্তার মৈত্র চলে গেলেন (১৯শে মার্চ, ১৯২২) এবং একটু সামলে নিয়ে কবি তাঁর পুত্র ও পুত্র-বধূর সঙ্গে বোম্বাই থেকে তৃতীয় বার বিলাত যাত্রা করলেন (১২ই মে, ১৯২২)। বিলাতে operation-এর ফল হয়েছিল কিন্তু ১৯৪১ সালের অস্ত্র

চিকিৎসা শোচনীয় ব্যর্থতা আনে ; তবু মাঝে ত্রিশ বছর (১৯১১-৪১) দেশে ও পরিবারে, নানা বিচ্ছেদ, সঙ্কট ও উৎকণ্ঠার মধ্যেও সতেজে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট সৃষ্টি করে গেছেন বিচিত্র ক্ষেত্রে। দেশে বিদেশে তাঁর সন্ধান সুরু হয়েছে এই জন্ম শতাব্দী উৎসব উপলক্ষ্যে।

এখন আমরা ফিরে তাকাই ১৯১১-২২ সালে ; বুঝতে চেষ্টা করি বাংলার রবি ক্রমশঃ কেমন করে ভারতের তথা জগতের রবি তিনি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেবার বিলেতে মিলিত হন তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (যুগান্তর, ৪ঠা ডিসেম্বর দ্রষ্টব্য), নববিধান আচার্য প্রমথলাল সেন, ডাঃ দ্বিজেন মৈত্র ও তাঁর দাদা অধ্যাপক সুরেন মৈত্র (ইনি শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে বিজ্ঞান শিখিয়েছেন এবং এঁরই শিষ্য সত্যেন বসু “বিশ্ব-পরিচয়” লেখায় কবিকে সাহায্য করেন)। ১৯১৩ সালে শরৎকালে দেশে ফেরার আগে আমার দুই বন্ধুও কবির বিলাতে তোলা ফটোতে দেখা দেন : হাস্যরসিক শিল্পী সুকুমার রায় (আমাদের ‘তাতাদা’ ও সত্যজিৎ রায়ের পিতা) এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

১৯১২ সালে ছড়িয়ে পড়ার আগে আমরা সবাই কবিগুরুকে ঘিরে দুইটি স্মরণীয় উৎসব করেছি। ২৫শে বৈশাখ, ১৩১৮ শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসব (৮ই মে, ১৯১১) এবং কলকাতা টাউন হলে ২৮শে জানুয়ারী, ১৯১২তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিমন্ত্রণে দেশজোড়া কবি সংবর্ধনা। সেই উপলক্ষ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন—

> “জগৎ কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব
> বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব্ব।”

“তত্ত্ববোধিনী” সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের উপযুক্ত পৌত্র সত্যেন দত্ত ও তাঁর বন্ধু সুসাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কত বার নিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের আজ

স্মরণ করি, যেমন করি প্রশান্তচন্দ্রের (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ) সুযোগ্য নেতৃত্ব; তিনি ছেলে মেয়ে কত জনের দায়িত্ব নিয়ে এই জন্মোৎসবে আমাদের নিয়ে গেছেন ভাবলে বিস্ময় জাগে। কারণ সেই পল্লীগ্রামে কোন খবর না দিয়ে কত বার হঠাৎ আমরা হাজির হয়েছি—কবির সংকীর্ণ ভাণ্ডারে জুলুম করেছি···কিন্তু বাণীর বরপুত্র স্নিগ্ধহাস্যে সবাইকে তুষ্ট করেছেন—কি খেলাম কোথায় শুলাম সব ভুলে গেছি! কিন্তু ভুলিনি তাঁর বদান্যতা আর আশ্রমবাসী শিক্ষক ও ছাত্রদের অক্লান্ত সেবা যা সত্যি অমূল্য।···

১৩১২-১৩১৮ (অর্থাৎ ১৯০৫-১১) রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া' রচনা শেষ করে 'গীতাঞ্জলি' রচনামধ্যে এক নূতন শক্তির সন্ধান পেলেন ও দেশবাসীদের দিলেন। আমরা তরুণ তরুণীদের দল—তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনে চেপে হাওড়া থেকে বর্ধমান (সীতাভোগের দেশ!) উৎরে দুপুর রৌদ্রে বোলপুর পৌঁছাতাম—রবীন্দ্র সঙ্গীতই সে আনন্দ-যাত্রার সাথী। বন্ধু প্রশান্ত ও তাঁর ভগ্নীরা যেমন আমাদের খাইয়ে তাজা রাখতেন, তেমনি তাঁর অনুজ প্রফুল্ল (বুলা) ভাল বাঁশী বাজিয়ে ব'লে, ট্রেনে গান শোনাবার ব্যবস্থা ছিল, সে গানের ঝর্ণাধারা প্রাণকে স্নিগ্ধ করত; মনেও পড়ত না যে বীরভূমের কাঁকুরে মাটি আমাদের পাগুলো কামড়াচ্ছে আর মাথা ফাটাচ্ছে বৈশাখের রোদ্দুর! আশ্রম কুটিরে উঠতেই ছাত্রদের স্নিগ্ধসেবায় মন ভরে উঠত; মাথা গরমের দাওয়াই কুয়োর ঠাণ্ডা জল ঢেলে আমাদের শান্ত করত ছাত্ররা, আবার তাদের তক্তাপোষ ইত্যাদি দিয়ে আমাদের বোঝাত গুরুদেবের আশ্রমে আতিথ্যের মান কত উঁচু। তিনি তখন নিজে ছাত্রদের আবাসে এসে তাদের সঙ্গে জলখাবার খেতেন—গল্প বলতেন, গান শেখাতেন, আমরাও তার ভাগ পেতাম—সে কত বড় সৌভাগ্য।···প্রত্যেক গীতাঞ্জলির গান সুর ও রচনার তারিখ মনে রেখে বুঝতে চেষ্টা করতাম কেমন করে বীরভূমে বাঙালী কবি বিশ্বকবি হয়ে উঠেছেন। তাই ১৯১৮-

২৫শে বৈশাখ উৎসবে শুধু বাঙালী নরনারী নয়, অবাঙালী পূরণচাঁদ নাহার ও খৃষ্টান মিশনারী Rev. Milburn—রবীন্দ্রনাথ-সংবর্ধনায় যোগদান করেন।…

শেষে মনে করিয়ে দিই যে প্রাক্তন ছাত্রদের শিরোমণি বন্ধু সুধীরঞ্জন দাস (শান্তিনিকেতনের বর্তমান উপাচার্য) 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ' বেয়ে ন্যায়াধীশের সর্বোচ্চ পদে উঠেছেন এবং তিনিও তক্তাপোষের আসবাব, মোটা চালের ভাত দাল খেয়ে শান্তিনিকেতনে মানুষ হয়েছেন। ভাল গান করতেন বলে গুরুদেব তাঁর নবরচিত "রাজা" নাটকের প্রযোজনায় (নারীশিল্পীর অভাবে) রানী সুদর্শনার ভূমিকায় অভিনয় করতে সুধীরঞ্জনকে নামান। তাঁর পরে অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী সুদর্শনারূপে দেখা দেন; আর আঁধার ঘরের রাজা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—বেশীর ভাগ পর্দার আড়ালে কিন্তু জনতার দৃশ্যে আলখাল্লা পরে 'দাদাঠাকুর' রবি-বাউল দিব্যকণ্ঠে ছাত্রদের সঙ্গে গানের পর গান গেয়ে চলেছেন:

'আজি দখিন দুয়ার খোলা
এস হে এস হে,
আমার বসন্ত এসো'
'আজি কমল মুকুল দল খুলিল'
'বসন্তে কি শুধু কেবল
ফোটা ফুলের মেলারে
দেখিস নাকি শুকন পাতা
ঝরা ফুলের খেলা রে॥'

ছোট প্রবন্ধে সেই সব সুরের তাৎপর্য বোঝান যায় না।

গল্প-ভারতী। পৌষ, ১৩৬৭।

গানের রাজা

শান্তা দেবী

মনে পড়ছে ৪৫।৪৬ বৎসর পূর্বে (১৩২২ সালে) বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীদের সাহায্যের জন্য যখন রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'ফাল্গুনী'র অভিনয় করেন। বসন্তের দিনে ফুলের ঐশ্বর্য যেমন স্বচ্ছন্দে অনায়াসে শুষ্ক পৃথিবীকে প্লাবিত করে দেয় তেমনি করে ওই চিৎপুরের গলির ভিতরের পুরানো বাড়ীর দালান উঠান সুরে গানে রঙে ভরপূর হয়ে উছ্‌লে উঠেছিল। তার আগে কলকাতায় এমন দৃশ্য কেউ দেখেনি। শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলে এক-প্রাণ হয়ে গানে নাচে সাজে রঙ্গমঞ্চ মাতিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনকার সুরস্রষ্টা কবিগুরুর সঙ্গে মনে পড়ছে সুরশিল্পী দিনেন্দ্রনাথকে, মনে পড়ছে রাজবেশে সজ্জিত রং ও রেখার যাদুকর গগনেন্দ্রনাথকে; সেনাপতি পিয়ার্সন ও শিশুগায়িকা রমা মজুমদারকে। সে আসর ভেঙে গিয়েছে, আজকার দিনের তরুণ শিল্পীদের অনেকেই তাঁদের কোনও পরিচয় পাননি, যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মনের মণিকোঠায় সে সুর ও রঙের সম্পদ্ এখনও মহামূল্য রত্নের মতই সঞ্চিত আছে। ভাষায় সে ছবি এঁকে দেখাবার দিন আজকে নয়, সে শক্তিও নেই, আজ শুধু স্মরণ করছি সেইসব দিনগুলিকে। সেই সময়েরই কাছাকাছি সময়ে আমরা কিছুদিন ছিলাম শান্তিনিকেতনে। তখন সন্ধ্যায় দিনুবাবুর বারাণ্ডায় যখন গানের ক্লাশ বস্‌ত, একএক দিন একএকটি বা কখনও তিনচারটি নূতন গান দম্‌কা হাওয়ার মত এসে যেন সভায় পড়ত, তার পর ঘূর্ণিবায়ুর মত সকলকার মন ঘিরে আনন্দনৃত্য করে দিকে দিকে কুটিরে কুটিরে মাঠে বনে ছড়িয়ে পড়ত। একপালা নূতন গানের নেশা কাট্‌তে না কাট্‌তে তার উপর আর একপালা

নূতন গানের ঢেউ এসে পড়ত। সমুদ্রস্নানের সময় যেমন একটা ঢেউ-এর আনন্দপ্লাবনের শেষ রেশটুকু যাবার আগেই আর একটা ঢেউ এসে নূতন আনন্দে ডুবিয়ে দেয়, এ যেন অনেকটা তেম্‌নি।

এমনি অকস্মাৎ-প্লাবনের একদিন দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল,

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥
কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইলো না
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥

তখনকার বয়সে কথা ও সুরের নেশায় মন মেতেছিল, কিন্তু নানান রঙের দিনগুলির প্রকৃত অর্থ বোঝবার সময় হয়নি ; আজ আমাদের সোনার খাঁচা ভেঙে সেই দিনগুলি পলায়িত, আজ গানের সুরের সঙ্গে অর্থ মনকে একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনায় সিঞ্চিত করছে। এখন বিশেষ দিনে বিশেষ আয়োজন করে পুরাতন গানকে কত রিহার্সাল দিয়ে আমরা একটি আসরের আয়োজন করি। তখন ঋতুতে ঋতুতে দিনে দিনে নূতন আকাশ নূতন বাতাসের মত নূতন গানের পসরা অনায়াসে অনাহূত এনে আমাদের কবি আমাদের শ্রুতির দুয়ারে উপহার দিতেন। কত সহজে কত দুর্লভ জিনিস একসময় প্রতিদিন পেয়েছি। বিশেষ করে বর্ষা ও শরৎকালে আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম মেঘগর্জনের মাদলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কবির কণ্ঠ থেকে কত নূতন নূতন গান ঝরে পড়বে। সেখানে যখন শান্তিনিকেতনের নাট্যঘরে 'অচলায়তন' অভিনয়ে কবি কিশোর-ছাত্রদের নিয়ে নৃত্যোৎসবের সঙ্গে স্বয়ং গেয়েছিলেন "উতল ধারা বাদল ঝরে" তখন সেই অন্ধকার পল্লীর খড়ের চালের নীচে যেন ইন্দ্রসভার উৎসব মনে হয়েছিল। উৎসবান্তে অন্ধকার মেঠোপথে যে মুগ্ধতা নিয়ে আমরা ফিরে যেতাম তার রেশ কতদিন মনে লেগে থাকৃত। নূতন নূতন সৃষ্টিকে এমন করে বারেবারে পাবার অবসর আর কোনও দিন আসবে না, কিন্তু

ধন্য আমরা যে আমাদের সেদিন কত দীর্ঘকাল ধরেই এসেছিল, দুঃখ শুধু যে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের ভাগ্যে সে আনন্দশিহরণ নেই! শরতে আকাশে যেমন ঝাঁক বেঁধে বলাকা উড়ে যায়, তেমনি ঝাঁক বেঁধে শরতের শারদীয় গান ও প্রতি বর্ষায় বর্ষাকালের গান কবির কণ্ঠ হতে বেরিয়ে আস্‌ত ; কত বিচিত্র তার সুর, কত অনির্বচনীয় তার ভাষা ও ভাব। যে সব গান আমরা সেকালে তাঁর মুখে প্রথম শুনেছি তার প্রতিটির সঙ্গে যেন এক একটি ছবি গাঁথা আছে। বসন্তের দিনে পারুল বনের মাঠে জ্যোৎস্নারাত্রে একটার সময় "কমল মুকুল দল খুলিল" কি "পুষ্প ফোটে কোন্ কুঞ্জবনে" যখন শুনেছিলাম তখনকার দিনের সেই মাঠের পথ, বালির ঢিপি, পায়ে পায়ে কাঁটার আঘাত, কবির সূক্ষ্ম রহস্যালাপ, তাঁর অক্লান্ত ধৈর্য, সস্নেহ আতিথ্য, সমস্তই যেন একসূত্রে গাঁথা একটি মালার মত স্মৃতির কুঠরিতে দুলছে। বর্ষার দিনে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ 'দেহলি'র ছোট ছাদের উপর যেন ঝুঁকে পড়ত, কবি পিছনে হাতদুটি রেখে ঘর থেকে ঝুঁকে বারাণ্ডায় এসে স্তব্ধ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়াতেন, যখন সজোরে বৃষ্টি নেমে আসত, আমাদের ঘরের খড়ের ছাঁচ বেয়ে বর্ষার জল মুক্তোর পরদার মত দুল্‌ত, তখন আর তাঁকে দেখা যেত না। সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে জলস্রোতের কুল্‌কুল্ ধ্বনির সঙ্গে "ওরে বৃষ্টিতে মোর মেতেছে মন", কিংবা "বাদল মেঘে মাদল বাজে", "আবার এসেছে আষাঢ়" কত নূতন গানের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ত। ছেলের দল সদ্য-শেখা গান গাইতে গাইতে মাঠে মাঠে খোয়াইয়ে খোয়াইয়ে পাগলামি করে ঘুরত। তার প্রতিধ্বনি কবির ক্ষুদ্র কক্ষে বাজ্‌ত আবার নূতন গানের প্রেরণা দেবার জন্য।

গানই ছিল সেকালের আশ্রমের প্রাণ, তখন আশ্রমে লোকের কোলাহল ছিল না, নানা বিভাগ ছিল না, নৃত্য চিত্রের ব্যবস্থা ছিল না। ছিল খোলা মাঠ, মুক্ত আকাশ, ছোট ছোট কুটির আর অজস্র গানের ঐশ্বর্য। আমরা প্রথম যখন বাংলা ১৩১৭ সালে ফাল্গুন

মাসে 'রাজা' অভিনয় দেখতে যাই তখন দিনেন্দ্রনাথ ছাড়া কবির গানের সহায় ছিলেন কয়েকটি ছোট ছোট শিশু। কবির একলার কণ্ঠস্বরে আকাশ কেঁপে উঠত, এক আসনে বসে করুণ, মধুর, চঞ্চল, নৃত্যোচ্ছল কত সুরে তিনি গান গেয়ে যেতেন, মাঝে ফাঁক পড়ত না, কথা বলবার অবসর হত না; বিস্মিত মুগ্ধ শ্রোতারা সময়ের হিসাব ভুলে যেতেন।

এইসব যুগে গানের ভাণ্ডারের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল 'ফাল্গুনী'র দিনে। আনন্দের এই বিরাট যজ্ঞ খোলা হয়েছিল নিরানন্দ যখন দেশে নিরন্নের ক্ষুধার রূপ নিয়ে নাম্‌ল। ধনীর রসসম্ভোগের আনন্দ কবির কৃপায় দরিদ্রের অন্ন হয়ে নাম্‌ল তাদের কাতর ক্রন্দনকে হাসিতে রূপান্তরিত করবার জন্য। আজ আমরা দেখছি তার চেয়েও অনেক বড় দুঃখের ও নিরানন্দের ছবি আমাদের চারিপাশে। আজ আমাদের আনন্দের উৎসবের প্রেরণা যদি আবার নিরন্নের জন্য কিছু অন্ন ও গৃহহীনের জন্য কোন আশ্রয় এনে দিতে পারে, তবেই কবির স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান করা হবে।

গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০ ॥

বাল্মীকি, কালিদাসের পর আমাদের দেশে জগৎপূজ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যেহেতু আমার অতি নিকট আত্মীয় (অর্থাৎ তিনি মাতামহীর সহোদর) সেইজন্যই হয়ত দেখিনি ভালো করে চেয়ে তাঁর প্রতি, তাঁর ভিতরকার বিরাট পুরুষটিকে। আজ···তাঁর বিষয় লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছি আমার অক্ষমতা কতটা তাঁকে বা তাঁর কথা-গুলিকে—যা তাঁর শ্রীমুখে শুনেছি, তা' বুঝে সুষ্ঠু করে ফুটিয়ে তোলার!···রবিদাদা 'জীবন-স্মৃতি' আর 'ছেলেবেলা' নামে দুটি গ্রন্থে সুন্দর ভাবে তাঁর জীবনের অনেক কথাই লিখে রেখে গেছেন। আমি কেবল তাঁর মেজদিদির (আমার দিদিমা) কাছে শোনা তাঁর ছেলেবেলার দু-একটি কাহিনী গোড়ায় বলব।

রবিদাদা ছিলেন শৈশবে বাড়ীর সকলেরি প্রিয়, বিশেষ তাঁর বড় ভাইবোনদের কাছে। শুনেছি (পরে রবিদাদাও রসদৃপ্ত স্মিতমুখে বলেছিলেন) তাঁর অন্নপ্রাশনের সময় তাঁকে চন্দন-চর্চিত ক'রে, তাঁর আসনের চারধারে আল্‌পনা কেটে এবং দীপ্ত দীপের সার দিয়ে সাজিয়ে ধূপবাসিত করা হয়েছিল। জাতিস্মর তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর সর্বকনিষ্ঠ (এঁর পরে বুধেন্দ্র শৈশবেই স্বর্গত হন) পুত্রের ভগবৎ উপাসনা অন্তে নামকরণ করলেন—'রবীন্দ্রনাথ'। পবিত্র মনে তাঁর পিতা বলেছিলেন, "এই শিশুর নাম 'রবীন্দ্রনাথ' রাখা হোল, এঁর চারধারে স্থাপিত দীপ শ্রেণীর মতই ইনি উজ্জ্বল প্রতিভায় জগৎ উদ্ভাসিত করবেন এবং ধূপবাসিত এই কক্ষের মত এঁর যশ-গৌরব জগতে বিস্তারিত হবে।" পিতার এই আশ্চর্য ভবিষ্যৎ বাণী রবিদাদা তাঁর জীবনে সফলতা মণ্ডিত করে রেখে গেছেন। এই ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যখন অমরকোটে আকবর জন্মালেন, তখন নিঃস্ব পলাতক তাঁর

পিতা সম্রাট্ হুমায়ুন পুত্রের জন্মোৎসবে একমাত্র সম্বল কস্তূরী নিকটবর্তী কয়েকটি বিশ্বস্ত সহচরদের বিতরণ করে বলেছিলেন, "এই কস্তূরীর গন্ধের মতই জাতকের নাম পৃথিবীতে বিকীর্ণ হবে।" কথা প্রসঙ্গে নিজের ছেলেবেলার কথা বোলে আমাকে উৎসাহিত করবার জন্য একবার কবি বলেছিলেন, "অপরে তোর কাজের প্রশংসা করবে এই ভেবে কাজ করিসনে। ধর যদি কেউ বাল্যে আমার পিঠ চাপড়ে উপদেশ দিতেন, 'রবি কবি হবি, কবিতা লেখ'—তাহলে কি আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হতুম? জানিস—যখন কিছু বড় কাজে হাত দিতুম, দিদিদের বলে রাখতুম! যেমন বাঘের খাঁচায় খাবার দেয়—তেমনি আমাকে না ঘাঁটিয়ে আমার ঘরে একবাটি শুধু ডাল রেখে যেতে।"

দিদিমার কাছে শুনেছি রবিদাদা ছেলেবেলা থেকেই ভাবপ্রবণ এবং কল্পনার মধ্যে সর্বদা ডুবে থাকতেন। তরুণ বয়সে কবিতা লেখা তিনি আরম্ভ করেন। সোমদাদা (কবির ঠিক উপরের ভাই—সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলতেন, "জানিস রবির ছেলেবেলার প্রথম কবিতার বই আমি ছাপিয়েছিলুম।" আর আদর করে বলতেন, "রবি কেরাণী—উদয়-অস্ত কলম পেষে।" সোমদাদা যে কাব্যের কথা বলেছিলেন সে বই বোধহয় ১৮৭৮-এ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত 'কবি কাহিনী'রও আগে ছাপা হয়েছিল। তার কোন চিহ্নই নেই। দিদিমা বলতেন, "রবি খুব ছোটবেলায় আমাদের সবাইকে ডেকে দেখাতেন তাঁর নাটক—গোল-কামরার ধারে লতাপাতা বেঁধে রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে। ভাইপো, ভাইঝি এবং ভাগ্নীদের নিয়ে নিজে করতেন অভিনয়। মেজ বৌঠান (দিদিমার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী) কবিকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।" দিদিমা এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিকট শুনেছি—কবি বাল্যে একপ্রকার ভাব কল্পনার আতিশয্য বশতঃ কখনো কখনো রাত্রে স্বপ্নঘোরে বিছানা থেকে

উঠে তেতলার ছাদের উপরে বেড়াতেন। পাছে কার্নিসে উঠে পড়ে না যান, সেইজন্য রাত্রে তাঁর দিদিদের সতর্ক পাহারায় থাকতে হতো। রবিদাদাকে এই গল্পটি পরবর্তীকালে বলায় তিনি সকৌতুকে হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন, ছেলেবেলার সে কথা তাঁর আদৌ মনে নেই।...

বাল্যজীবনী যা রবিদাদা লিখেছেন তা থেকে সকলেই জানেন মহর্ষি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে অল্প বয়সেই দুরূহ উপনিষদ এবং গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কবির মন তাই কোমল বয়সেই পরিণত হয়ে উঠেছিল। তাঁর তরুণ বয়সে লেখা 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তরুণ কবিকে অভিনন্দিত করেছিলেন একটি কবিতা লিখে। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীস্বরূপা প্রতিভাদেবী সরস্বতীর ভূমিকায় এবং আমার মা সুপ্রভা দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি কবির অন্যান্য শিশু ভাইঝি-ভাগ্নীদের বনবালা সাজিয়ে স্টেজে উপস্থিত করেছিলেন। এই সব কথা মা, মামী ও মাসীদের মুখে বহুবার শুনেছি ছেলেবেলায়। একটা কথা, বাল্মীকি প্রতিভা নিয়ে ১৪ বৎসরের বালক কবি যে গীতিনাট্য রচনা করেন তার ভিতব তাঁর অপূর্ব বিষয়বস্তু নির্বাচন-শক্তি প্রকাশ পায়।...এতটুকু বালক কবি যে কি করে নির্বাচন করলেন এও এক বিস্ময়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণেই আরো তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন ...।

রবিদাদার স্বনামধন্য পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ী এবং বসত বাড়ী নিয়েই তাঁদের এ-বাড়ী ও-বাড়ী, আলাদা হলেও একই বাড়ী ছিল। যতদিন মহর্ষি জীবিত ছিলেন একান্নবর্তী পরিবার থাকায় বনেদী নিয়ম কানুন সমান ভাবে বজায় ছিল। কোন বিষয়ে যেমন তাঁদেব অভাব ছিল না—তেমনি কোন বিষয়ে ক্রুটিও ঘটতো না! কোন রুচিবিরুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ বা

গালি দেওয়া তাঁরা জানতেন না। এর একটি মজার উদাহরণ মনে পড়ে গেল। দিদিমাকে একবার দেখেছি, একটা উড়ে চাকরকে ছেলেদের খাবার জন্য গজা কিনতে পয়সা দিয়ে বাজারে পাঠিয়েছিলেন, বুদ্ধিমান উৎকলবাসী গাঁজা এনে হাজির করলে। দিদি রেগে গিয়ে মুখ লাল করে ভর্ৎসনা দিয়ে কেবল বললেন, বেটা উড়ে, একে বাঁদর তার উপর পায়ে গোদ, তাতে বিষ ফোড়া—দেখ্ না হতভাগার বুদ্ধি।"—বলেই চুপ করে গেলেন। এই হল খুব জোর তাঁদের ক্রোধের অভিব্যক্তি। তপঃনিষ্ঠারত জনক-ঋষি তুল্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সকলের প্রতি সম-দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর পুণ্যশীল ওজগুণের ফলে ঘরে একটি বিরাট শান্তি বিরাজ করতো। অশান্তভাব কারু থাকলেও দমিত হতো আপনা থেকেই।

নিয়ম ছিল নবপ্রসূত শিশুদের তাঁর কাছে নিয়ে আসা এবং তার আশীর্বাদ গ্রহণ করানো। তাছাড়া প্রতিদিন নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে চাকর দাসীরা সঙ্গে করে বালকবালিকাদের তাঁর নিকট আনলে মহর্ষি তাঁদের যথাযোগ্য উপহার দিতেন এবং নানা প্রকার প্রশ্নের দ্বারা উপদেশ দিতেন। দিদিমা বলতেন, একবার নাকি তাঁর নাসিকা ভেদ করা হয়েছে দেখে মহর্ষি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন দেশের প্রথার রুচিবিরুদ্ধ বলে।…তাঁদের বাড়ীর তখন একটা নিয়ম ছিল প্রাতে শয্যা ত্যাগ এবং রাতে শয়ন করার পূর্বে পিতা মাতা বা পিতৃমাতৃস্থানীয়দের প্রণাম করতে হতো। শান্তিনিকেতনে সেই প্রকার গুরুস্থানীয়দের পদধূলি নেবার প্রথা আজও চলে আসছে। হিন্দুগৃহে যেমন শয়ন-কক্ষে জুতা নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না, সেই প্রথাও পূর্বে ঠাকুরবাড়ীতে দেখেছি।

মহর্ষি সর্বদাই বারবাড়ীর তেতলায় থাকতেন এবং এক মুহূর্ত-কালও মৌন অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তা ছাড়েননি। কেবল কখনো প্রয়োজন হলে শুনেছি তিনি রত্নগর্ভা সৌভাগ্যবতী পত্নীর নিকট

অন্দর মহলে যেতেন। তাঁর সেখানে আগমনের সূচনা হতো ঘর দুয়ারে সারা পথ ধূপ-বারি সেচন-সুবাসিত করার দ্বারা। মহর্ষির ছেলেমেয়েরা তাঁকে 'কর্তা মশাই' এবং নাতিনাতনীরা 'কর্তা দাদা' বলতেন। দিদিমাকে বলতে শুনেছি, তাঁদের ছেলেবেলার কথা, যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা স্বনামধন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিলাত থাকার কালে বহু ব্যয় এবং তাঁর সেখানেই সহসা মৃত্যু হওয়ায় তখন বিষয়-আসয় ব্যাপারে মহর্ষি বিব্রত হয়ে পড়েন ঋণের দায়ে। তাঁদের ব্যয় সঙ্কোচন দ্বারা কিভাবে দৈনিক প্রত্যেককে চার আনা মূল্যের মাত্র খাদ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং স্নানের ব্যবহারের জন্য সাবান পর্যন্ত পাননি, আর চাকর দাসী ছাড়িয়ে কিভাবে নিজেদের সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়েছিল তার সব কথা দিদিমা আমাদের বলতেন। মহর্ষি শুধু তাঁর তরফের কৌসুলীর পরামর্শ মত "ঋণ বিষয় কিছু জানি না" বললে হাইকোর্ট থেকে নিষ্কৃতি পেতেন এবং বিষয়-আসয় বজায় থাকতো সরকারের নিয়োজিত Trustee-দের হাতে। কিন্তু তিনি সত্যভ্রষ্ট হননি। এই ব্যাপার শুনে (তখনকার লোকদের মুখে শুনেছি) তাঁর প্রতি সহানুভূতি-নিষ্যন্দিত অশ্রুবর্ষণ হয়েছিল বিচারালয়ে এবং তার বাহিরের জনতার মধ্যে। দেবেন্দ্রনাথের 'মহর্ষি' নাম সেই থেকে মুখে মুখে প্রচারিত হল এবং জগৎ সমাজে বিদিত রইল। রবিদাদাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর মত উদার পিতা পেয়েছিলেন এবং সেই কারণেই ধর্মজ্ঞান ও চরিত্র গুণে জগৎমাঝে অলঙ্কৃত হয়েছিলেন।...

এই দুই মহাত্মা পিতাপুত্রের যে সূতিকাগৃহে জন্ম, তা প্রথম দেখার সুযোগ হয় যখন আমি ৯।১০ বৎসরের বালক। বড়দিদিমা (সৌদামিনী দেবী) আমাকে কেন জানি না, একদিন নিয়ে গেলেন জোড়াসাঁকোর অন্দর মহলে আলো আঁধারে সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায়।....বড়দিদিমা বললেন, "অসিত, দেখ, এখানে কর্তামশাই
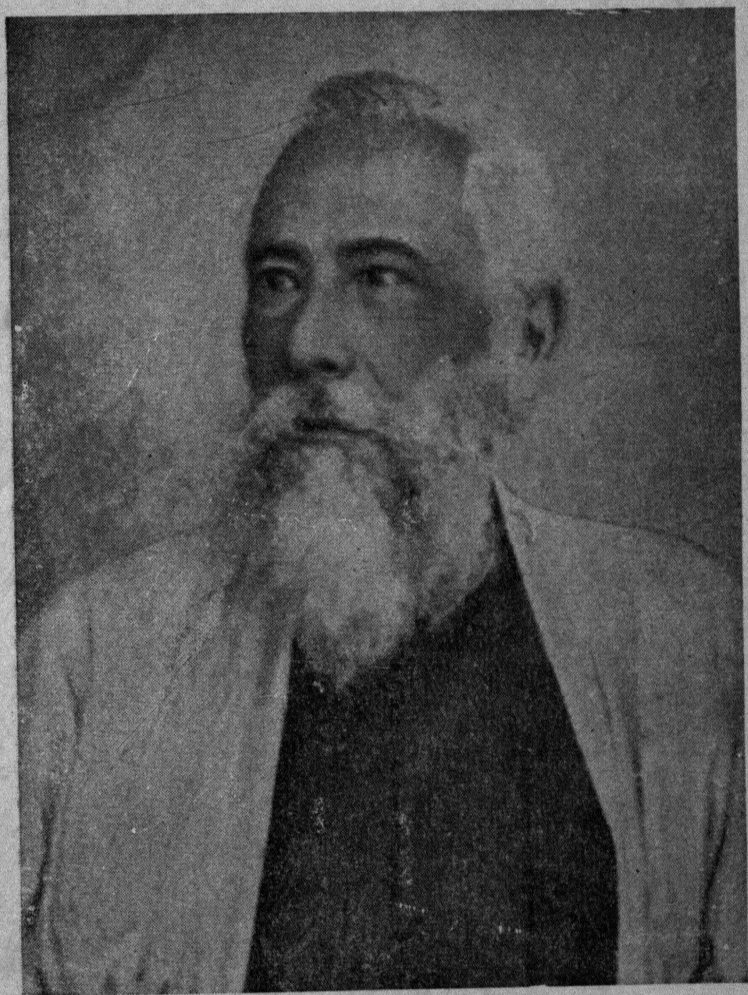
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবং আমরা সবাই জন্মেছি, তোর মা আর তুইও এই ঘরে জন্মেছিস্।" শৈশবে তখন শুনে আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হয়েছিল তা' মনে নেই, কিন্তু এখন ভাবি, যদি সেই পুণ্য স্থানের মর্ম তখন হৃদয় স্পর্শ করতো হয়তো আমার বাকী জীবন পুণ্যাত্মাদের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করতে বা গড়ে তুলতে পারতুম।....

অল্প বয়সেই রবিদাদা গান রচনা করতেন। জ্যোতিদাদা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) তার স্বরলিপি করতেন। ইন্দিরা দেবী, আমার ছোট মামা (যশোপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়) আর বড়মাসী (সুশীলা দেবী) এবং সরলা দেবী প্রভৃতিকে তাঁর গান শেখাতেন। ছোটমামার কণ্ঠ খুব মিষ্টি ছিল এবং রবিদাদার কাছে শুনেছি তিনি খুব শীঘ্রই গানের সুর আয়ত্ত করতে পারতেন। পরবর্তীকালে দিনুদাদা (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বড় হ'লে তাঁকেই তিনি তাঁর গানের ভাণ্ডারী করেছিলেন। দিনুদাদারও ছিল অসাধারণ ক্ষমতা সুর শিখে নেবার।

রবিদাদার শিশুদের প্রতি ভালবাসার কথা এবার বলি! আমি এবং আমার ভাইয়েরা বাল্যকালে যখন মা বাবার সঙ্গে কখনো কখনো জোড়াসাঁকোয় এসে দিদিমার (শরৎকুমারী দেবী) কাছে থাকতুম তখন আমাদের আকর্ষণ ছিল রবিদাদার প্রতি। তাঁর আমাদের নিয়ে একটা খেলা ছিল, এক নিঃশ্বাসে 'ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে' ধরনের অনেক লম্বা লম্বা সমাসযুক্ত কথা বলার অভ্যাসের দ্বারা আমাদের জিভের জড়তা কাটানোর খেলা। আবার আমাদের সহজবুদ্ধির পরীক্ষার ছলে নানা প্রকার প্রশ্ন করতেন, যেমন: "পরস্মৈপদী ভাল না আত্মনেপদ?" "কান বড় কি চোখ বড়?" ইত্যাদি। গল্পবলার এক কৌশল ছিল তাঁর, প্রথমে তিনি নিজে হয় তো আরম্ভ করলেন 'এক ছিল রাজা, এক ছিল রাণী' তারপর আমাদের একে একে এক জনের পর একজনকে বাকি গল্পটা বানিয়ে জুড়ে দিয়ে বলে যেতে হতো;

তারপর শেষ করতে না পারলে তিনি নিজে গল্পটাকে সীমানায় এনে দিতেন। বহুকাল পরে আশ্রমে তাঁর নিকট থাকার কালে সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে শিশুবিভাগে শালবীথীকাগৃহে গিয়ে রবিদাদা আর আমি···শিশুদের কাছে এই প্রকার গল্পরচনার খেলা করতাম।···

একটি ৯।১০ বৎসরের শিশু কন্যার কাছে বুড়ো বয়সে রবিদাদা ধরা পড়েছিলেন। সে তাঁকে সুদূর পশ্চিম থেকে 'ভানুদাদা' নাম দিয়ে কাঁচা হাতে আধ-আধ ভাষায় বড় বড় অক্ষরে পত্র লিখতো। রবিদাদা স্মিতহাস্যে তার পত্র এলেই আমাকে দেখাতেন। পরে মেয়েটি বড় হয়ে আশ্রমে পিতামাতার সঙ্গে আসে এবং বিরাট নামী পরিবারের পুরলক্ষ্মী এখন।

মা'র কাছে শুনেছি রবিদাদার বিবাহিত জীবন খুবই আনন্দের ছিল। তাঁর পত্নী (ছোটদিদিমা) আমার মার প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং আমার মাকে (ভাগিনেয়ীকে) বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন। মা বলতেন, বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে তিনি খুব শান্ত স্বভাবের ছিলেন। আমার তাঁর কথা খুবই আবছা মনে আছে।

রবিদাদার খাবার টেবিলে ছোটদের আকর্ষণ ছিল রবিদাদার মাখা ফলার। মা'রাও উপভোগ করেছেন, আমরা তাঁর নাতিরাও উপভোগ করেছি। ক্ষীর, কমলালেবু, কলা, পেস্তাবাদামের সঙ্গে জ্যাম, জেলি বা আমসত্ত্ব মেখে উপাদেয় খাদ্য তৈরী করতেন।··· ভালো রান্না, ভালো পোশাক সর্বপ্রকার সৌকুমার্যই তাঁদের বাড়ীর ছিল বৈশিষ্ট্য। রান্নার জন্য ব্রাহ্মণ পাচক ছাড়াও মগ-খানসামা এমন কি—ফরাসীদেশের পাচক নিযুক্ত ছিল।

মহর্ষি জীবিতকালে, পূর্বে তার পত্নী এবং পরে দিদিমা এবং বড়দিদিমা বড় হলে তাঁরাই রান্নাঘর বিভাগের তদারক করতেন এবং মহর্ষির আহারের সময় উপস্থিত থেকে তাঁকে পাখা করতেন, আর প্রত্যেক দিনের নতুন নতুন রান্নার 'মেন্যু' বলে দিতেন।

আমার দিদিমা এইভাবে নিজে রান্নাতে এত সিদ্ধহস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর রান্নার সুনাম তখন খুব ছিল। পরে রবিদাদার সঙ্গে খেতে বসলে তিনি বলতেন, "সেজদিদির হাতের রান্না খাস অসিত, বনমালীর রান্না তোর ভাল লাগবে কি করে ?"

তাঁদের তখন গানের মজলিসে ভারতবর্ষের এমন গুণিগায়ক বা বাদক কেহ ছিলেন না যাঁরা তাঁদের বাড়ীতে না এসেছেন। রবিদা গান শিখেছিলেন সুবিখ্যাত গায়ক যদুভট্টের নিকট আর সুবিখ্যাত রাধিকা গোঁসাই নিযুক্ত ছিলেন বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের গান শেখাতে।

মা'রা বলতেন, "গাইতে গিয়ে যাতে আমরা মুখ বিকৃত না করি তার জন্য রাধিকাবাবু আমাদের সামনে আয়না রাখতেন।"

শুনেছি তখন জ্যোতিদাদা পোশাক সংস্কারের চেষ্টা করছিলেন অনেক প্রকারে। কোঁচানো ধুতি যাতে প্যাণ্টের মত চট্ করে পরা যায় বার বার না কুঁচিয়ে তার জন্য ক্লীপ, বোতাম লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন নতুন নতুন সাইকেল উঠেছে, বড়দাদা মহাশয় ব্রাউন পেপারে জামা তৈরী করে সাইকেল চড়ে সারা চৌরঙ্গী পরিভ্রমণ করেছিলেন। এইসব থেকে তাঁদের সংস্কারমুখী প্রতিভার কথা জানা যায়। গতানুগতিকতার তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন না— ধর্ম ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতির মূলে সেই জন্য সর্বদা তাঁরাই ছিলেন অগ্রণী।

রবি-তীর্থে॥

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে 'গানের রাজা' আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিক সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙলা দেশে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এত অধিকসংখ্যক এবং এত বিচিত্র ভাবপূর্ণ গান পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন কবি রচনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এই সংগীতাবলীর মধ্যে আবার জাতীয় সংগীত বা স্বদেশপ্রেমের সংগীতের সংখ্যা প্রচুর। স্বদেশী যুগে কয়েক সহস্র জাতীয় ভাবপূর্ণ সংগীত বাঙলা দেশের কবিগণ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একা রবীন্দ্রনাথের দানই সর্বাধিক। দেশমাতৃকাকে তিনি যে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিলেন, জাতীয় আন্দোলনে যে ভাবে নিজের মনপ্রাণকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন—সেই প্রেম, সেই আত্মোৎসর্গ ই সহস্র ধারায় তাঁহার গানের মুখে উৎসারিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গান একদিকে যেমন গভীর দেশপ্রেম, অন্যদিকে তেমনি অপূর্ব উদ্দীপনায় পূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙলার সর্বত্র সহস্র সহস্র জনসভায়, হাটে, মাঠে, ঘাটে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত গান গীত হইত। দেশবাসীর চিত্তে স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশী ভাবের সঞ্চারে উহা যে কতদূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার সমগ্র স্বদেশী সংগীতের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সামান্য কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

দেশমাতৃকা যে গাছপালা, মাটি, জল, আকাশ, গ্রাম-নগর, লোকসংখ্যার সমষ্টিমাত্র নহেন, ইহার অন্তরালে তাঁহার যে চিন্ময়ী রূপ আছে, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, হাজার হাজার বৎসরের সুখ-দুঃখ বেদনা, ইতিহাসের ভাঙাগড়া উত্থানপতন--সমস্ত মিলিয়া সহস্রদল পদ্মে সেই চিন্ময়ী জননীর পাদপীঠ রচনা করিয়াছে, এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "বন্দে

মাতরম্” সংগীত সেই চিন্ময়ী দেশ-জননীর ধ্যান। বঙ্কিম-শিষ্য রবীন্দ্রনাথও মাতৃভূমির এই চিন্ময়ী রূপকেই অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,
অয়ি নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী ॥
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী ॥
* *
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা,
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী ॥

বঙ্গজননীর এই ভুবনমোহিনী রূপ কবি যেন আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তিনি যেন ধ্যাননেত্রে এই অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অথবা—

ও আমার দেশের মাটি
তোমার ’পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি
মর্মে গাঁথা ॥ ইত্যাদি।

এখানে দেশজননীর মূর্তিকে কবি বিশ্বজননীর মূর্তির মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছেন। আবার—

আজি বাঙলা দেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী?
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥
তোমার মুক্ত-কেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে,
রৌদ্র-বসনী!…

স্বদেশী আন্দোলনে জাতির চিত্তে যে প্রলয়ের ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে এই ভীষণ-মধুর-রূপে বঙ্গমাতার আবির্ভাব। কবি সেই জ্যোতির্ময়ী কল্যাণময়ী মাকেই এই গানে ধ্যান করিয়াছেন।

দেশের প্রতি অণু-পরমাণু, তাহার আকাশ জল বাতাস, শ্যামল বনানী, আম্রবনঘেরা নদীকূল, নিভৃত পল্লী—সকলের সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের যে নিগূঢ় যোগ, যে মমতার বন্ধন—কবি তাঁহার অমর সংগীত 'সোনার বাংলা'য় সেই ভাব অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

* *

ও মা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায়, হায় রে)—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা কী ছায়া গো,
কী স্নেহ কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী, আমার কানে
লাগে সুধার মতো (মরি হায়, হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

* *

ধেনু-চরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা-আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মরি হায়, হায় রে)—

ও মা, আমার যে ভাই, তা'রা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

*　　*

অথবা—

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মাগো,
তোমায় ভালোবেসে। ইত্যাদি

ইহাতে কবির সেই স্বদেশপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্য এক শ্রেণীর গানে কবি জাতিকে স্বাধীনতার তপস্যায় সর্বস্ব ত্যাগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন, অত্যাচারীর রক্তনেত্র, নির্যাতন, নিপীড়ন উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক উন্নত শিরে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রেরণা দিয়াছেন—

(১) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলো রে। ইত্যাদি

(২) তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে।
তা ব'লে ভাবনা করা চ'লবে না।
তোর আশালতা প'ড়্‌বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফ'ল্‌বে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।
আস্‌বে পথে আঁধার নেমে,
তাই ব'লেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বালাবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্ব'লবে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'লবে না॥ ইত্যাদি

(৩) এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা ব'লে ভাসা তরী॥

ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই, ডাক্ দে আজি ;
তোরা সবাই মিলে' বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥

(৪) আপনি অবশ হ'লি, তবে
বল দিবি তুই কারে
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্ না রে ॥

* *

বাহির যদি হ'লি পথে
ফিরিস্‌নে তুই কোনো-মতে,
থেকে থেকে পিছনপানে
চাস্‌নে বারে বারে।
নেই-যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয়-চরণ শরণ ক'রে
বাহির হ'য়ে যা রে ॥

(৫) আমি ভয় ক'র্‌বো না, ভয় ক'রবো না
দু-বেলা মরার আগে
ম'রবো না, ভাই, ম'রবো না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে ;
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধ'রবো না ॥ ইত্যাদি

(৬) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা ॥

আমি তোমার চরণ ক'র্‌বো শরণ,
আর কারো ধার ধার্‌বো না, মা ॥ ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের যে দুইটি বিখ্যাত জাতীয় সংগীত আজ সর্বত্র গীত হয়—

(১) দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই? ইত্যাদি

(২) জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!

এগুলি তাঁহার পরিণত বয়সের অপূর্ব সৃষ্টি। এই সব সংগীতে ভারতের স্বাধীনতার সাধনাকে বিশ্বমানবের মুক্তি-সাধনার মধ্যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্‌" ব্যতীত আর কোন জাতীয় সংগীত এই সব সংগীতের মতো জাতির চিত্তের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করে নাই।

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ॥

অভিনয়ের স্মৃতি

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনিশশো সতের সাল, তখন সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছি এমন সময় রবীন্দ্রনাথ এলেন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ের আয়োজন করতে। সেই সময়েই কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, আর এ্যানি বেসণ্ট কংগ্রেসের সভানেত্রী হন।···সেই কংগ্রেসের অধিবেশনেই আমরা 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি গাই। এই অধিবেশনের সময়েই রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করেন। বাড়ীতে আমি, আমার দিদি রমা, আর দাদা দিনেন্দ্রনাথ প্রথমে গানটি শিখি ও প্রকাশ্য জনসভায় সর্বপ্রথম সেবারে কংগ্রেসের অধিবেশনেই এই গানটি গাওয়া হয়।

'বিচিত্রা'র আসর তখন সবে সুরু হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, কবি সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায়, ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, যতীন বাগচী প্রভৃতি কলাবিদ্, কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক ও সমালোচকদের নিয়ে 'বিচিত্রা'র সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ। রসবিদ্ রসস্রষ্টাদের আসর তখন একটিও ছিলো না। কলকাতার মতো এতোবড় সহরে এমন একটি জায়গা ছিলো না যেখানে মনের অন্দরমহল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রসিকদের সমাবেশ হতে পারতো কিংবা যেখান থেকে খাঁটি সাহিত্য-রসের পরিবেশন করা যেতে পারতো রসপিপাসুদের। 'বিচিত্রা'র আসর সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ সেই দৈন্য ঘোচালেন। কতো গান যে এই সময়ে তৈরী করলেন তার শেষ নেই। দাদা দিনেন্দ্রনাথ, দিদি রমা আর আমি কতো গান যে গেয়েছি 'বিচিত্রা'র আসরে তার অন্ত নেই। দিদি রমার গলায় 'এই যে কালো মাটির বাসা', 'নাগো এই যে ধূলা আমার নাএ',

'সাঁজের রঙে রঙিয়ে গেলো হৃদয়গগন', 'সন্ধ্যা হোলো মা বুকে ধরো' এই গানগুলো যারা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা কখনো ভুলবে না! রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে তাঁর গানগুলো আমার দিদি রমার গলায় যেমন রূপ নেয় এমন খুব কম লোকের গলাতেই নেয়। মনে পড়ে একটি তুপুরের কথা। ঘুরঘুর করতে করতে আমি 'বিচিত্রা'র ঘরে গিয়ে হাজির। দেখি রবীন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজাচ্ছেন আর গুন্‌গুন্‌ করে গাইছেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলুম। 'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী' এই কবিতাটির কিছু অংশ নিয়ে সুর দিয়ে গান রচনা করছিলেন তিনি। 'বিচিত্রা'র আসরে সত্যেন দত্ত পড়লেন তাঁর কবিতা, প্রমথ চৌধুরী করলেন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, আর রবীন্দ্রনাথ শোনালেন তাঁর 'পলাতকা'র কবিতাগুলো আরো কত শত কবিতা আর গল্প। 'বিচিত্রা'র আসরে যোগদান করবার সুযোগ লাভের জন্য কলকাতার সাহিত্য-রসিকেরা তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে রসের পর্দা-বাঁধা 'বিচিত্রা' কলকাতার রসিক-সমাজে রসের রুচি সৃষ্টি করতে যে কি অসামান্য কাজ করেছে তা বলে শেষ করা যায় না।···

'ডাকঘর' অভিনয়ের কথা বলছিলুম। 'বিচিত্রা'র ঘরে রিহার্সালের পালা সুরু হোলো। 'অমল' সাজলো শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র বালক আশামুকুল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার অংশ গ্রহণ করলেন। গগনেন্দ্রনাথ সাজলেন অমলের পিসেমশায়, অবনীন্দ্রনাথ মোড়ল আর বৈদ্য, রথীন্দ্রনাথ রাজবৈদ্য, দাদা অসিতকুমার দইওয়ালা আর অবনীন্দ্রনাথের ছোটো মেয়ে সুরূপা সাজলো সুধা। ভিতর থেকে গাওয়া হোলো 'হ্যাদে গো নন্দরানী', গাইলেন দিদি রমা আর আমার জ্যাঠতুতো বোন হাসি আর বাঁশী বাজালুম আমি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকায় নেচে নেচে গাইলেন 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' আর আমি বাজালুম

বাঁশী তাঁর গানের সঙ্গে। 'বিচিত্রা'র ঘরের পশ্চিম দিকে স্টেজ বাঁধা হোলো দড়মা দিয়ে, তার উপরে আঁকা হোলো আল্‌পনা। ঘরের কোণে রাখা হোলো পিলসুজ আর খড়ের চালের উপরে বাবুই পাখীর শূন্য বাসা। সাতদিন ধরে অভিনয় হয়। একদিন কংগ্রেসের নেতারা অভিনয় দেখতে আসেন। সেদিন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গান্ধীজি, লোকমান্য তিলক, মালবীয়জী, এ্যানি বেসণ্ট আরো অনেক নেতা।

আমাদের বাড়ীতে আমি অনেক অভিনয় দেখেছি, ইয়োরোপে থাকা-কালীনও প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের অভিনয় আমি দেখেছি ও মুগ্ধ হয়েছি। সে সব অসাধারণ অভিনয়ের কথা স্মরণ রেখেও আমি বলছি যে, 'ডাকঘরে'র যে অভিনয় আমি দেখেছি তার মতো আশ্চর্য অভিনয়, সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত অভিনয় আমি মাত্র আর একবার দেখেছি জীবনে, আর সেটা হচ্ছে মস্কোর ভাগ্‌তান্‌গভ থিয়েটারে 'প্রিন্সেস্ তুরেনদতে'র অভিনয়। 'ডাকঘর' নাটিকায় অবনীন্দ্রনাথের 'বৈদ্য' আর 'মোড়ল' এই দুই চরিত্রের অভিনয় সে যে কি অপূর্ব, আশ্চর্য সৃষ্টি তা' যে না দেখেছে তার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। আমার মতে অভিনেতা হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড়ো। যে অংশই গ্রহণ করুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে যেতেন, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সচেতন সত্তা বিলীন হোতে পারতো না যে চরিত্র অভিনয় করতেন তার মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ আশ্চর্য ভাবে সে চরিত্র বনে যেতে পারেন। 'ডাকঘরে' অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় রবীন্দ্রনাথের অভিনয়কে ছাপিয়ে চলে গিয়েছিলো। তার আর একটি প্রমাণ এই যে অন্য সকলের অভিনয়ের স্মৃতি কিছু-না-কিছু ম্লান হয়েছে কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের অভিনয়ের স্মৃতি জ্বলজ্বলে হয়ে রয়েছে মনের মধ্যে, তার রঙ্ এতোটুকুও ফিকে হ'য়ে যায়নি।

যাত্রী॥

ছেলেবেলা

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবার···একটি পাটকিলে রঙের বুড়ো ঘোড়া ও পালকি-গাড়ি ছিল। বিকেল হলেই তিনি আমাদের নিয়ে রওনা দিতেন তাঁর মেজদার (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বাড়ি। জোড়াসাঁকো থেকে বালিগঞ্জ বুড়ো ঘোড়া ঠুক্‌ঠুক্ করে যেতে সময় নিত অনেক। কিন্তু তখনকার দিনে সময়ের তেমন মূল্য ছিল না, লোকের ধৈর্যও ছিল যথেষ্ট।···

খেলাধূলো সামাজিকতা গল্পগুজব করতে করতে কখন রাত হয়ে যেত খেয়াল থাকত না। আবার গাড়িতে চড়ে বসা ও ঠুক্-ঠুক্ করে বাড়িতে ফেরা। কলকাতার রাস্তায় তখন এত ভিড় ছিল না, মোটরচলন হয় নি, আমরা যখন ফিরে আসতুম তখন চারদিক নিঝুম, লোকজন গাড়িঘোড়ার চলাচল সব বন্ধ হয়ে গেছে, কেবল কানে আসছে আমাদেরই ঘোড়াটার টগ্‌বগ্ পা ফেলার ঢিমে-তেতলা শব্দ। রাস্তার গ্যাস-ল্যাম্পের আলোতে গাছপালার ছায়া একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে পাশ ফিরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ছে—তার বিরাম নেই। সেই অন্ধকার রাত্রে আলোছায়ার এই অবিশ্রাম মোড়-ফেরা দেখতে দেখতে কত-না ভূতপত্রী-দেশের কথা মনে পড়ত। তারপর ঘুমিয়ে পড়তুম মায়ের কোলে। চিরপরিচিত জোড়াসাঁকোর গলিতে ঢুকতেই মায়ের স্নেহকণ্ঠের ডাকে আবার ঘুম ভেঙে যেত।

যে সময়কার কথা বলছি তখনকার একটি গল্প উল্লেখযোগ্য। আমার মনে থাকার কথা নয়—বড় হয়ে বাবার মুখে শুনেছি। কলকাতায় সেবার কংগ্রেস হচ্ছে। নানান প্রদেশ থেকে বড় বড় নেতারা এসেছেন। দেশোদ্ধার কি করে করা যায় তাই নিয়ে ক'দিন ধরে তেজস্বী বক্তৃতা অনেক হয়ে গেছে কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্ম

থেকে। হাট ভাঙার আগে স্যার তারকনাথ পালিত ঠিক করলেন তাঁর বাড়িতে নেতাদের ডিনার পার্টি দেবেন। উদ্দেশ্য, পরস্পরকে সাধুবাদ দেওয়া। আমার পিতাকে পালিত সাহেব কেবল সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, বিশেষ করে অনুরোধ করলেন নেতাদের বিনোদনের জন্য গান গাইতে হবে। গগনদাদাদের তিন ভাইয়েরও (গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ) নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল জোড়াসাঁকো-বাড়ি থেকে যে চারজন যাবেন একেবারে বাঙালী দস্তুরে ধুতি চাদর পরে ডিনারে হাজির হবেন। ইংরেজি কায়দায় ডিনার পার্টি কী ধরনের হবে বাবা সহজেই অনুমান করেছিলেন—সেই বিদেশী আবহাওয়ার মধ্যে স্বদেশী গান গাইতে তাঁর একটুও ইচ্ছা করছিল না। উতলা মন নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। যেতে যেতেই একটা নতুন গান রচনা করে সঙ্গে সঙ্গে তাতে সুর দিলেন। গানটা বেঁধে তাঁর মন তবু শান্ত হল। ধুতি-পরা বাঙালী বাবুদের ডিনারে যোগ দেওয়া বিদেশী-ভাবাপন্ন কংগ্রেস-নেতৃবর্গের কাছে কিরকম উপহাসের বিষয় হয়েছিল অনুমান করতে পারা যায়।

আহারান্তে বক্তৃতা যখন চলেছে, তার মধ্যে একসময় বাবাকে গান গাইতে বলা হল। বাবা গাইলেন—

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
একি শুধু হাসির খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা ?
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসির খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা ?

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে
করতালি—
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশি যাপনা।

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে
জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের
কামনা ?
এ কি শুধু হাসির খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা ?

গান শুনে সকলে স্তব্ধ। ডিনার পার্টি মাটি হয়ে গেল। মুখ বিষণ্ণ করে একে একে সবাই চলে গেলেন।

বসুধারা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ ॥

ঔঁ

6, DWARKANATH TAGORE LANE
CALCUTTA
PHONE B. B. 3005

কল্যাণীয়েষু

যখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম

এমন সময় হঠাৎ দেখি তোমার
ছন্দ গাঁথা দুখানি চিঠি প্রাবরণগ্রস্ত
অবস্থায় সেক্রেটারীর ভারে আমার
টেবিলে পড়ে আছে। অন্যান্য নানা
বিষয়ের মধ্যে সে ছিল অনাবিষ্কৃত -
দৈবাৎ আমার হাতে পড়ল — পড়ে
লাগল ভালো। বোধ হচ্ছে ওর মধ্যে
তোমার একটি আবেদন জড়িত ছিল -
আমার দেখা পেতে চেয়েছিলে। তখন
আমি পালাব ভেবেছি। তোমার ইচ্ছাটা
অন্যমতে পূর্ণ হোক - আশীর্বাদ করি।
ইতি ১০।৯।৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনির্মল বসুকে লেখা
কবির একটি চিঠি ॥

দেবী মৃণালিনী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী দেবী মৃণালিনীকে খুব ছোট বেলায় দেখেছি। তাঁর সম্বন্ধে সত্যকাহিনী সংগ্রহ করাও কষ্টকর, কেউ কিছু সংগ্রহ করেছেন কিনা জানি না। দেবী মৃণালিনীর আসল নাম ছিলো ভবতারিণী। তিনি ছিলেন খুলনা জেলার মেয়ে, দক্ষিণডিহির স্বর্গীয় বেণীমাধব চৌধুরীর কন্যা। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বংশের সেকালের ঘরণীরা অনেকেই ছিলেন যশোর ও খুলনা জেলার মেয়ে। ঠাকুর বংশের আদি নিবাসও যশোর জেলায়।

১৩০২ কি ১৩০৩ সাল হবে। সে সময়ে কয়েক বছর ধ'রে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে বাস করতেন। তখনকার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি তাঁর ছেলেমেয়ে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সমাগমে গম্‌গম্‌ করতো। সে যেন একটা সোনার যুগ ছিলো। সারা ভারতের কত বিখ্যাত মনীষী ঐ সময়ে শিলাইদহে পদার্পণ করতেন। বাংলার অধিকাংশ অভিজাত জমিদারই শহরবাসী, পল্লীর জমিদারী তাঁদের পায়ের ধূলা বড় একটা পায় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে রকমের ভূস্বামী ছিলেন না। পল্লী প্রকৃতিকে ভালবেসে সাহিত্য-সাধনার জন্যেই হোক্ বা জমিদারীর কাজকর্মের দায়িত্ববোধেই হোক, তিনি ছায়াঘেরা পাখীডাকা পল্লীতে বহুদিন বাস করতেন,—এমন কি সপরিবারে,—অনেকটা স্থায়িভাবে বল্লেও চলে।

সে সময়ে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে যে কয়েকজন দারোয়ান আর বরকন্দাজ থাকতো, তাদের মধ্যে দু'জন ছিলো শিখ। তাদের নাম শরণ সিং আর গণপৎ সিং। তারা স্থানীয় হিন্দু মুসলমান বরকন্দাজের চেয়ে বেশি মাইনে পেতো। সেকালের বরকন্দাজদের

মাইনেও কম ছিলো, তবু তাদের খাওয়া-পরার কোন কষ্ট ছিলো না।

শরণ সিংহ আর গণপৎ সিং অনেক দিন থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে চাক্‌রী করছিলো—তাদের মাইনে ছিলো মাসে ২০৲ কুড়ি টাকা ক'রে। তারা প্রথমে ১৪৲ টাকায় বহাল হয়েছিলো। সেই সময়ে গণপৎ সিংএর একজন আত্মীয় দারুণ অভাবের জ্বালায় দেশ ছেড়ে নানা জায়গায় চাক্‌রীর চেষ্টা করছিলো। কোথায়ও কোন স্থবিধা করতে না পেরে সে শেষে শিলাইদহে এসে চাক্‌রীর প্রার্থনা জানালো। এ পাঞ্জাবীটার নাম ছিলো মুলা সিং। মুলা সিং যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তার ছিলো বীরের মত বিরাট দেহ, তেম্‌নি জম্‌কালো চেহারা। শিলাইদহ কুঠির হাটের মধ্যে যখন সে দাঁড়াতো, তখন লোকের ভিড়ের মাথার উপরেও একহাত উঁচুতে মাথা দেখা যেতো। তার যেমন বিরাট দেহ—তার আহার ছিলো তদনুরূপ,—এমন কি রাক্ষসের মত।

মুলা সিং যেদিন নিযুক্ত হলো, সেদিন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে উপস্থিত ছিলেন না। গণপৎ সিং তার দুর্দশা দেখে এস্টেটের ম্যানেজারবাবুর কাছেও না নিয়ে গিয়ে একেবারে তাকে কুঠিবাড়ির দোতলায় তাদের 'ছোট মাইজীর' কাছে নিয়ে হাজির করলো। মুলা সিং কেঁদে কেটে তার দুঃখদুর্দশার বর্ণনা ক'রে প্রার্থনা জানালো, তাকে যেমন ক'রেই হোক্‌ পালন না করলে তাকে সপরিবারে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চলে যেতে হবে। করুণাময়ী মৃণালিনী দেবী নিজেই তাকে দারোয়ানের কাজে বাহাল ক'রে দিলেন। সেইদিনই তা'র পনেরো টাকা মাসিক মাইনে ধার্য হলো। জমিদারগৃহিণী বল্‌লেন, "বাবু এলে তাঁকে ধরে পরে মাইনের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।"

মুলা সিং অকূল সাগরে কূল পেলো,—বেশ হাসিখুশি হ'য়ে কাজে লেগে গেলো—কিন্তু বেচারী যে মাইনে পেতো, তার প্রায়

সবই খরচ ক'রে ফেল্‌তো—আটা, অড়হরের ডাইল আর 'ঘেউ' খেয়ে। তার ঐ অমানুষিক বিরাট দেহখানাকে চালু রাখবার জন্য তা'র খোরাক ছিলো সে যুগের বৃকোদরের মত। সবাই মুলা সিংকে 'ভীম সিং' ব'লে ডাকৃতো আর তার তৈরী চাপাটীর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকৃতো।

বেচারা মূলা সিং বেশ ফূর্তির সঙ্গেই কাজকর্ম ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু মাসের শেষে তা'র মুখখানা বড়ই মলিন হয়ে গেলো, কাজের উৎসাহও যেন নিবে যাবার মতো হলো; রাত্রে দেউড়ীতে ব'সে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তো। তার এই বিমর্ষভাব কি কারণে সকলেই জান্‌তো,—তা দেবী মৃণালিনীর দৃষ্টিও এড়ায়নি।

একদিন ছোটমা মুলা সিংকে ডেকে তার বাড়িঘরের অবস্থা সব জিগগেস করলেন। শরণ সিং ছোটমাকে জানালো,—"মাইজী, মুলা সিংএর রোজ তিন সের ক'রে আটা লাগে দু'বেলায়। ও খেয়েই সব শেষ করে। বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারে না।" দেবী মৃণালিনীও শুনে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন।

ঠাকুর এস্টেটে চিরকালই নিয়ম-কানুনের বড় কড়াকড়ি। ছোটমা তো হঠাৎ এস্টেটের ধরাবাঁধা আইনের ব্যতিক্রম করতে পারেন না। মুলা সিংএর কাজ দু'মাসও হয়নি। তার মাইনে বাড়াবার কী উপায় হবে,—বিশেষ রবীন্দ্রনাথ তখনও শিলাইদহে আসেননি। তার পরদিন ভোরে ছোটমা তাঁর সংসার থেকে তিন সের আটা মুলা সিংকে পাঠিয়ে দিলেন।

মুলা সিং ছোট মাইজীর চাকর বিপিনের হাতে তিন সের আটা পেয়ে অবাক্ হয়ে গেলো। বিপিন তাকে জানিয়ে দিলো—এখন থেকে রোজ সকাল বেলা তিন সের ক'রে আটা দারোয়ানজীকে দেবার বরাদ্দ হয়ে গেছে।

মুলা সিং তিন-চার মাস বেশ ফুর্তিতে কাজ ক'রে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলেই মৃণালিনী দেবী তার মাইনে বাড়াবার

জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। ম্যানেজারবাবুর মন্তব্যাদি শুন্‌বারও সময় হলো না,—মুলা সিংএর মাইনে বেড়ে কুড়ি টাকা হলো। মুলা সিংএর আনন্দ-উৎসাহ আর ধরে না!

সবাই ভাবলো এইবারে মুলা সিংএর দৈনিক বরাদ্দ তিন সের আটা বন্ধ হবে। বিপিন গিয়ে ছোটমাকে পরামর্শ দিলে যে, এখন সংসার-খরচ থেকে তাকে আটা দেওয়া বন্ধ করা হোক। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না; পাচক ঠাকুরও ঐরকম প্রস্তাব করতে গিয়ে উপর থেকে তাড়া খেয়ে এলো। এত ক'রেও দৈনিক আটার বরাদ্দ বহাল তো রইলোই, উপরন্তু ছোটমা প্রায়ই তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন—"খাওয়ার তো কষ্ট হচ্ছে না?—বাড়িতে ছেলেমেয়েরা ভাল আছে তো?" মুলা সিংএর মত দর্শনধারী দারোয়ান শিলাইদহে বড় একটা দেখা যায়নি।

সেই সময় মৃণালিনী দেবী শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একটি সুন্দর শাক-সব্‌জীর বাগান করেছিলেন। নিজে ঐ বাগানে কাজকর্ম দেখ্‌তেনই, অনেক সময় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাগানের কাজকর্ম করতেন। তিনি নিজে উদ্যোগ ক'রে ঐ বাগানের শাকসব্‌জী ও তরকারী কর্মচারীদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। সে সময়ে যে সমস্ত আমলা সপরিবারে বাস করবার সুবিধা পেতেন না, তাঁদের জন্য একটা মেস খুলবার প্রস্তাব হয়; এস্টেট থেকে মেসের ঘরদোর ক'রে দেওয়া হোল; আবার অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য যাতে এস্টেট থেকে একজন পাচক দেওয়া হয়, মৃণালিনী দেবীই তার ব্যবস্থা ক'রে দেন; পরে একটি চাকরও এস্টেটের খরচে মেসে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কুঠিবাড়ির বাগানের তরিতরকারী সপ্তাহে দু'দিন ক'রে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দেন।

বিদেশী আমলাদের প্রায়ই কুঠিবাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকতো। ছোটমা প্রায়ই নিজে উদ্যোগ ক'রে নানারকমের পিঠে পরমান্ন

তৈরী করতেন এবং আমলাদের ডেকে এনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে 'এটা দাও, ওটা দাও' ক'রে সবাইকে পরিতোষ ক'রে খাওয়াতেন। সে সময়কার লোকেরা বলে যে তিনি খুব ভাল গৃহিণী ছিলেন এবং গৃহস্থঘরের খুঁটিনাটি সমস্ত গৃহস্থালী নিজ হাতে করবার জন্য সব সময় আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

কিছুদিন পরে যখন দেবী মৃণালিনী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিলাইদহ ছেড়ে চ'লে যান, তখন কুঠিবাড়ির চাকর দারোয়ানদের মন একেবারে ভেঙে গেলো। শরণ সিং, গণপৎ সিং বিশেষ ক'রে মুলা সিংএর সে কি কান্না! বিজয়া দশমীর দিনে যেন মায়ের বিসর্জন হবে! বিদায়ের আয়োজনের সোরগোলের মধ্যে যেন বিরাট হাহাকার ডুকরে কেঁদেছিলো—ছোট বড় কোন আমলা চাকরদের মনে আর আনন্দ ছিলো না। মুলা সিংএর কান্না দেখে ছোটমা তাদের সবাইকে ডাকলেন নিজের কাছে, তাদের বল্লেন, "আবার তোদের কাছে ফিরে আসবো। তোদের কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না।" তাদের অশ্রুসজল মুখের সেই বিদায়; সেই বিদায়েই শিলাইদহ থেকে মায়ের বিসর্জন হয়েছিলো। দেবী মৃণালিনী স্বামী পুত্রকন্যা রেখে ১৩০৯ সালে ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। সে দুঃসংবাদ শিলাইদহ পৌঁছিলে শিলাইদহ কাছারী আর কুঠিবাড়ির ছোট বড় সকল কর্মচারীই অশ্রুজল ফেলেছিলো।

শিলাইদহের অনেকেই বলেন যে, স্ত্রী-বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথকে এখানকার সবাই সন্ন্যাসীর বেশেই দেখতেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের শোক কোন দিনই বাইরে প্রকাশ পায় নি। সেকালকার পুরানো কর্মচারীরা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে থাকতেন না,—তাঁর বোটেই বাস করতেন, নিতান্ত কোন উপলক্ষ্য না হলে কুঠিবাড়িতে যেতেন না।

মুলা সিংএর কথা আর একটু ব'লে গল্প শেষ করবো। মৃণালিনী

দেবী শিলাইদহ ছেড়ে যাবার পর মুলা সিংএর মাইনে বেড়ে পঁচিশ টাকা হয়েছিলো,—সেই নজীরে শরণ সিং আর গণপৎ সিংও বেতন বৃদ্ধি পেয়েছিলো। দেবী মৃণালিনী চারিদিকে করুণ ছলছল চোখে চেয়ে যেন শিলাইদহের কাছ থেকে সেদিন চিরবিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পাল্কীতে উঠেছিলেন।

দেবী মৃণালিনী এত বড় অভিজাত বড় ঘরের ঘরণী হয়েও বাংলাদেশের নিষ্ঠাবান গৃহস্থ বধূর মত ছিলেন। তাঁর ব্যবহারে ছিল সুন্দর সারল্য, মধুর সামাজিকতা আর শ্বশুর কুলের উপর অবিচলিত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা। তাঁর শ্বশুর ছিলেন মহর্ষি, তাঁকে রাজর্ষি বলা যেতে পারে। শ্বশুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে তাঁর মন ভ'রে থাকতো, মহর্ষিদেবের কনিষ্ঠ পুত্র-বধূটির উপর স্নেহের অন্ত ছিল না। শ্বশুর যেটা পছন্দ করতেন না তিনি সযত্নে পরিহার ক'রে চল্‌তেন। "বাবা মশাই-এর এটা মত নয়। এটা তাঁর পছন্দ নয়; এটা আমি ক'রবো না।" সত্যিকার হিন্দু কুল-বধূর মত, সেবাপরায়ণা গৃহিণীর মত তিনি নিজ হাতে সংসারের কাজ করতে ভালবাসতেন। রান্নাতে তিনি অসাধারণ পটু ছিলেন। তাঁর গার্হস্থ্য জীবন রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রভাব পড়ে অপূর্ব হ'য়ে উঠেছিলো। সংসারের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমস্তই তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরুদ্বিগ্ন মনে সাহিত্য ও দেশ সেবার সুযোগ ষোল আনা পেয়েছিলেন।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশাল সাহিত্য-সাধনায় সুযোগ্য সহধর্মিণীই পেয়েছিলেন।...সহধর্মিণীর অকাল-মৃত্যুশোকে কবি "স্মরণ" কবিতাগুচ্ছ রচনা করেছিলেন, কিন্তু শোকের ব্যাকুলতা বা সামান্য হতাশা কোন রচনাতেই প্রকাশ করেন নাই। তাঁর প্রিয়বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন :—

"ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়েছেন, তাহা যদি নিরর্থক হয়, তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু

করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপনার জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্ট কালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণকর্মের নিত্য সহায় হইয়া বলদান করিবে। ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সাল।"

রবীন্দ্রনাথ চাইতেন তাঁর গৃহিণী ও পুত্র কন্যারা পল্লীর সরল আবেষ্টনীর মধ্যে, জীবন-ধারণের আড়ম্বর-শূন্য স্বল্প উপকরণের মধ্যে নিঃস্বার্থ কল্যাণময় জীবন গড়ে তুল্‌বেন! তাই তিনি পত্নীকে লিখেছেন—"সেই জন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃতে পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আস্‌তে এত উৎসুক হয়েছি। এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না।" স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে শিলাইদহের নিভৃত পল্লী-নিকেতনে সংসার বাঁধবার জন্য তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল গভীর।

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে কবিগৃহিণী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে অতি সুন্দর একটি ফুলের ও সব্‌জীর বাগান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একখানা চিঠিতে তাঁর সযত্নে গড়া বাগানের গাছগাছালির কুশল সংবাদ জানাচ্ছেন অপরূপ ভাষায়। শাক, ডাঁটা, বেগুন, কুমড়া, গোলাপ, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুম্‌কো, মেদি, হাস্‌নুহানা প্রভৃতি তাঁর মানসপুত্রকন্যারা কে কেমন আছে তা খুঁটিয়ে লিখে শেষে জানিয়েছেন, "সবাই জিজ্ঞাসা করছে মা কবে আসবেন? আমরা আসবো না শুনে এখানকার আমলারা সব দমে গিয়েছিল। তাতো হবারই কথা, কারণ আমলা ববকন্দাজদের কোন না কোন ছুতোয় প্রতি সপ্তাহেই কুঠিবাড়িতে নিমন্ত্রণ ফ'স্‌কে যায় যে।"

দেবী মৃণালিনী পাকা গৃহিণী ছিলেন। সংসারের ব্যবহারের জন্য তাঁর ঘি-এর ফরমাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সে চিঠিখানিতে জমিদারীর গোয়ালাদের কাছ থেকে "ঘেরতো" সংগ্রহ ক'রে

কবি, তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী ও শিশুকন্যা

পাঠাবার খবর লিখেছেন, সে চিঠিখানি পড়লেই কবির রহস্য-প্রিয়তার অপরিসীম আনন্দে মন ভ'রে ওঠে। শান্তিনিকেতনের সেকালের ছাত্ররা তাঁর কাছে সত্যিকারের মাতৃস্নেহ পেয়ে যেন আশ্রম-লক্ষ্মীর কোলে মানুষ হ'য়ে উঠ্‌ত। শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা ও চালাবার জন্য কবিগৃহিণীর নানাভাবে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার ও হাসিমুখে দুঃখবরণও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য সহধর্মিণীর পরিচয় দিচ্ছে। সেই গৃহলক্ষ্মীর বিচ্ছেদে কবিগুরুর প্রাণেও প্রশ্ন জেগেছিল—

"আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণি! গেলে যদি, গেলে মোর আগে;
মোর লাগি কোথাও কি দু'টি স্নিগ্ধ করে
পাতিয়া রাখিবে শয্যা চিরসন্ধ্যা তরে?"

রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে॥

অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ

সীতা দেবী

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম অভিনয় করিতে দেখি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে। তাহার পর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল নানা ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বেশীর ভাগই তিনি তাঁহার জীবনের পরিণত বয়সে রচিত নাটকগুলিতে অভিনয় করিতে নামিতেন। কখনও সন্ন্যাসী, কখনও ঠাকুরদাদা, কখনও বা ধনঞ্জয় বৈরাগী বা আচার্য অদীনপুণ্য। পোশাক পরিচ্ছদ সাধারণত যা পরিতেন, তাহার বেশী অদল বদল হইত না, রঙ্গমঞ্চে তাঁহাকে কবি রবীন্দ্রনাথই মনে হইত, তাঁহার নিজের কথা নিজের স্বাভাবিক সুরেই বলিয়া যাইতেন। ভাবিতাম রবিকে গোপন করা কোনো ভূমিকার কর্ম নয়, তাঁহার ভাস্বর দীপ্তি ছদ্মবেশের আড়াল মানে না। ভুলিয়া যাইতাম, যে-সকল ভূমিকায় তাঁহাকে অভিনয় করিতে দেখিতাম, সেগুলি তাঁহারই প্রতিরূপ, রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া তিনি নিজের ভূমিকারই প্রায় নিজে অভিনয় করিতেন, তাঁহাকে অন্য রূপ দেখাইবেই বা কেন ?

কিন্তু তিনি যে কত বড় দক্ষ ও কুশলী অভিনেতা তাহা বুঝিবার ও দেখিবার সৌভাগ্য দুই তিনবার ঘটিয়া গেল। ১৩২২ সালে বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটে। ইহারই সাহায্যকল্পে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে "ফাল্গুনী" অভিনয় করা হয়। "ফাল্গুনী" ইতিপূর্বে "ইষ্টারে"র ছুটিতে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াও আসিয়াছিলাম। শুনিলাম কবি "বৈরাগ্য সাধন" নামক একটি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিয়া "ফাল্গুনী"তে জুড়িয়া দিয়াছেন, দুইটির অভিনয় একসঙ্গেই হইবে।

"বৈরাগ্য সাধনে" রাজসভার দৃশ্যটি হইয়াছিল অপরূপ। যেন কালিদাসের কাব্যের একটি দৃশ্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ

যখন কবিশেখর সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। নিতান্ত জানিতাম যে কবি স্বয়ং কবিশেখর সাজিয়াছেন, না হইলে বিশ্বাসই করিতাম না বোধ হয়। সে কি আশ্চর্য উজ্জ্বল রূপ, কি অভিনব দীপ্তিময় আবির্ভাব! কোন্ মন্ত্রবলে যে তিনি নিজের বয়স হইতে অর্ধেক খসাইয়া ফেলিলেন, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। কথা বলিতে যখন আরম্ভ করিলেন, তখন কবিশেখরের ভিতর কবি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাইলাম।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে, তখনকার আল্‌ফ্রেড্ থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের "শারদোৎসব" অভিনয় হয়। নাটকটির নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল, আখ্যানবস্তুরও সামান্য কিছু অদলবদল ঘটিয়া থাকিবে। এখানেও কবি রাজকবিশেখররূপে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রথমবার এ বেশে তাঁহাকে দেখিয়া দর্শকবৃন্দ যতখানি চমৎকৃত হইয়াছিল, এবারে অবশ্য ততটা আর হইল না।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের শেষে পুরাতন এম্পায়ার থিয়েটারে "বিসর্জন" নাটক অভিনীত হয়। অনেকদিন ধরিয়া কবির জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ইহার রিহার্সাল চলিতেছিল। কয়েকবার গিয়া তাহা দেখিয়াও আসিয়াছিলাম। প্রথমে স্থির ছিল যে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতি সাজিবেন। পরে উপযুক্ত 'জয়সিংহ' না পাওয়া যাওয়ার জন্যই বা অন্য কোনো কারণে তিনি রঘুপতির ভূমিকা দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়া স্বয়ং 'জয়সিংহে'র ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর। কিন্তু যুবক-জয়সিংহ সাজিয়া যখন দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার বয়স যে ত্রিশ বৎসরের বেশী তাহা কাহারও মনে হয় নাই। কি সতেজ গতিভঙ্গী, কি দৃপ্ত কণ্ঠস্বর! কবিশেখর যদিও চক্ষুকে ভুলাইয়া দিতেন, কিন্তু কর্ণকে ভুলাইতে পারিতেন না, মহার্ঘ্য সজ্জায় সজ্জিত যুবক শেখরের কণ্ঠে আমরা আমাদের অতি পরিচিত কবি রবীন্দ্রনাথের

কথাই শুনিতাম, তাঁহাকে চিনিতে কিছুই বিলম্ব হইত না। কিন্তু "জয়সিংহে"র মূর্তি শুধু নূতন ছিল না, তাহার কথাবার্তা চালচলন সবই আমাদের কাছে নূতন। ইহার ভিতর কবি ধরা দিলেন না। রবীন্দ্রনাথের দীপ্তি ব্যক্তিত্বকে ঢাকিয়া জয়সিংহই সত্য হইয়া দাঁড়াইলেন। ইহা যে কতবড় অভিনয়দক্ষতা তাহা কেবল তাঁহারাই বুঝিবেন, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল অত্যন্ত নিকট হইতে দেখিয়াছেন। মধ্যাহ্ন গগনের দীপ্ত ভাস্করকে যেমন আড়াল করা যায় না, তাঁহার জ্যোতির্ময় সত্তাকেও তেমনি আড়াল করা অসম্ভবই বোধ হইত। দেখিলাম এ ক্ষেত্রেও কবি ঐন্দ্রজালিক।

বহু বৎসর পূর্বের কথা, কিন্তু এখনও "বিসর্জনে"র রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য চোখের উপর ভাসিতেছে।...

দুঃখ হয় যে, এই নাট্যাভিনয়গুলি কেন চলচ্চিত্রের সাহায্যে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও স্থায়ী করিয়া রাখা হয় নাই। আমরা যাহারা চোখে দেখিয়াছিলাম, কানে শুনিয়াছিলাম, তাহাদের দিন ত শেষ হইতে চলিল, পরবর্তী কালের রিক্ততা খানিকটা হয়ত মোচন হইত, কিন্তু তাহাও দেশবাসীর অদূরদর্শিতার জন্য হইল না।

গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০ ॥

ভানুসিংহ

সুশীল রায়

"ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারিপ্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খ্রীষ্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খ্রীষ্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্বলোকপূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ হয় খ্রীষ্টশতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্বে নাহয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোনো সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোনো কোনো মূর্খনির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোনো বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।"

তথাকথিত পণ্ডিতদের গবেষণা কতটা হাস্যকর হতে পারে এই উক্তিটি তার একটি দৃষ্টান্ত। বস্তুতপক্ষে অসার গবেষণার প্রতিই এটি একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ।

আজ আমরা নিশ্চয় করে জেনেছি ভানুসিংহ কে। প্রকৃতপক্ষে ইনি তিনিই যিনি '১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন'। ভানুসিংহের জন্ম অবশ্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু তাঁর আবির্ভাব ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতী পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হয় এই বছর; ভারতীর প্রথম বর্ষেই ভানুসিংহের কবিতা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবং ধারাবাহিক ভাবে তা প্রকাশিত হতে থাকে।

এ কবির বয়স তখন প্রকৃতপক্ষে ষোলো, কিন্তু গবেষকদের মতে বয়স তাঁর নানা রকম—এমনকি কেউ কেউ তাঁকে যিশুখৃষ্টের প্রায় সমবয়সী বলেও সম্ভবত মনে করেছিলেন।

যে উদ্‌ধৃতিটি দিয়ে এই লেখা আরম্ভ করা হয়েছে তা আর-একটি বেনামীতে স্বয়ং ভানুসিংহেরই লেখা। বেনামীতে, অর্থাৎ লেখাটি ছিল স্বাক্ষরহীন। ১২৯১ সালে (১৮৮৪) শ্রাবণ সংখ্যা 'নবজীবন' মাসিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটি প্রকাশিত হয় "ভানুসিংহ-ঠাকুরের জীবনী" শিরোনামায়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেইশ। তাঁর ষোলো-সতেরো বছর বয়সের লেখাগুলি একত্র করে এই বছরই বের হয়, 'ভানুসিংহের কবিতা' নামে গ্রন্থ।

বালক-বয়সে রবীন্দ্রনাথের মনে পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। এই কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে তিনি চেষ্টা ও যত্ন করেছিলেন। সেই ব্রজবুলির শব্দগুলি নিয়ে তিনি তার অর্থ নির্ণয়ের জন্য নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন অনেকদিন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর দাদাদের ডেস্ক থেকে পদাবলীর বই নিয়ে একা-একা পড়তেন। চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলের কাছে সেসব পদাবলীর সব ভাবের কথা দূরে থাক্—সব অর্থ ধরাই কষ্ট। তবুও তিনি তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন সম্ভবত তার সুরে তার ধ্বনিতে এবং তার ভাষার লালিত্যে। পদাবলী নিয়ে কিশোর গবেষক অনেক দিন ধরে একা-একা গবেষণা করতে থাকেন।

তাঁর মনের মধ্যে যে-সুর রণিত হত, এই সব পদের মধ্যে তিনি অবশ্যই সন্ধান পেয়েছিলেন সেই সুরের। সেই জন্যই এই ভাষার রহস্য সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত হন। এ'কে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে, তাঁর মনের তন্ত্রীতে এইসব পদাবলী ঝংকার তুলেছিল। তন্ত্রী যদি এক সুরে বাঁধা না থাকে তাহলে সুরেলা ঝংকার তাতে বাজে না।

এর থেকে রবীন্দ্রনাথের মনের পরিচয় আমরা সম্ভবত একটু পেতে পারি। তাঁর মনের সঙ্গে দেশের মাটির সম্পর্ক যেমন গভীর দেশের মাটির সুর তেমনি তাঁর মনের সুরের সহচর। যে-ধ্বনি

এবং যে-সুর মানুষের মনের অকৃত্রিম প্রতিধ্বনির রূপ নিয়ে পদাবলীর আকার ধারণ করেছে, সেই পদাবলী তাই আকর্ষণ করল বালক-রবীন্দ্রনাথের মনকে। তিনি একা-একা তাই পদকর্তাদের রচিত কথা নিয়ে নিরিবিলি সময় কাটাতে লাগলেন। এই পদাবলীর মধ্যে পেলেন যেন তাঁর খেলার সঙ্গী। ইংরেজি সেই প্রবচনটির কথা এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে—A man is known by the company he keeps. আমরাও তাঁর এই সঙ্গী নির্বাচন দেখে যেন অনেকটা তাঁকে চিনতে পারছি; এবং বুঝতে পারছি যে, একটি গীতিপ্রবণ মন নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন; এবং সেই জন্যেই ব্রজবুলির অন্তরস্থ সংগীতকে তিনি অন্তরঙ্গ বলে গ্রহণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে অবশ্য বলেছেন যে "ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাঁহার লেখা যদি বর্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয় ঠকিতাম না, একথা জোর করিয়া বলিতে পারি।" এ কথা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বলা সোজা। কিন্তু সে আমলে যাঁরা বলেছিলেন "এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না" তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। এবং যিনি* জর্মনিতে থাকাকালে ভানুসিংহকে প্রাচীন পদকর্তারূপে প্রচুর সম্মান দিয়ে গ্রন্থ রচনা করে ডাক্তার উপাধি পেয়েছিলেন, তাঁকেও আমাদের বিদ্রূপ করা বুঝি সাজে না।

রবীন্দ্রনাথ জানেন, এ রচনা তাঁর, এই সব কবিতা রচনা করতে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার সঙ্গেও তিনি অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত, প্রকৃতই প্রাচীন পদাবলীর থেকে তাঁর রচিত এই সব পদের পার্থক্য কোথায়, এ কথাও তাঁর কাছে জ্ঞাত, সুতরাং উত্তরকালে তিনি সেই স্মৃতির উপর নির্ভর করে এর ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে ভেবেছেন, এবং সেইজন্যেই তিনি বলতে পেরেছেন যে, তিনি ঠকতেন না। কিন্তু ভানুসিংহ ঠকিয়েছে অনেককে। লোকে ঠকে কিনা, তা পরখ করে দেখার

* ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২—১৯১০)

জন্যেই তো রবীন্দ্রনাথের এইরূপ নাম গ্রহণের পরিকল্পনা, এবং "সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া"র কাহিনী প্রচার করা—

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গেল রয়ণী,
নহি নহি আওল কালা।...

এই পদের সঙ্গে আমরা আর-একটি পদ এখানে উদ্‌ধৃত করতে পারি—

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম
দিবস লেখি লেখি নখর খেয়ায়লুঁ
বিছুরল গোকুল নাম।

এই দুইটির কোন্‌টি নূতন কোন্‌টি পুরাতন, কোন্‌টি কৃত্রিম কোন্‌টি অকৃত্রিম—আমাদের পক্ষে সহজে তা ধরা বুঝি সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয়—

গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত
বিষম বেদনা কহিলে কি যায়
পরাণে সহিছে যত

এবং

সতিমির রজনী সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষণ্ণ।

পদদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি একালের এবং কোন্‌টি সেকালের, তা ধরা।

সুতরাং আমরা এ-পরীক্ষায় নিজেদের আর লিপ্ত করতে ইচ্ছে করি নে। আমাদের ইচ্ছে, ভানুসিংহের পদাবলী পাঠ করে তার কৃতিত্ব স্বীকার করা।

এ কথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ যদি ঐসব পদ রচনা করার পর ঘোষণা করতেন যে এগুলি তাঁর রচিত, তাহলে এই পদাবলী নিয়ে সে-আমলেও কোনো রহস্যের সৃষ্টি হত না, এবং এ-আমলে আমরাও সম্ভবত এগুলি ভিন্ন চোখ ও ভিন্ন মন নিয়ে দেখতাম। তা অবশ্য দেখতাম, কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত অবশ্যই আমরা হতাম না।

রহস্যের সৃষ্টি করে এই রচনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছে তাঁর ছিল, তাঁর সে-ইচ্ছে পুরোপুরিভাবে পূর্ণও হয়েছিল। তাঁর এই রহস্যরচনার কাজকে রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়েছেন "পদাবলীর জালিয়াতি।" নকলকে আসল বলে প্রচার করা যদি জালিয়াতি হয়, তাহলে এর অবশ্যই জালিয়াতি আখ্যা পাওয়ার কথা। কিন্তু ভানুসিংহের পদে আছে—

সুজনক পীড়িতি, নৌতুন নিতি নিতি,
নহি টুটে জীবন-মরণে।

যিনি প্রকৃতই কবি তিনি অবশ্যই একজন সুজন; তাঁর কাব্য-প্রীতিও নিত্যই নূতন রূপে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথও যে প্রকৃতই একজন পদকার তার পরিচয় তিনি দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর যাবতীয় রচনা যে ঐ ব্রজবুলিতে লেখা হল না তার একমাত্র কারণ হয়তো তিনি ব্রজবুলির কালের কবি নন। যেকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ব্রজবুলির কাল তার থেকে অনেক দূরে।

যদি ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম ভাষা না হত, যদি ঐ ভাষা এমন হত যে, ঐ ভাষাতে সকলে কথা বলে, তবে সম্ভবত ও-ভাষাই হত রবীন্দ্রনাথের, এবং আরো অনেকের, রচনার ভাষা।

কিন্তু, যেমন অনেকেই বলেন, এবং যেমন মাইকেল্ মধুসূদন বলেছেন যে, কোনো ভাষা যদি কারও আয়ত্ত করতে হয় তা হলে

সেই ভাষাতে তাকে কথা বলতে হবে, সেই ভাষাতে তাকে চিন্তা করতে হবে, এমনকি সেই ভাষাতে তাকে স্বপ্ন দেখতেও হবে; ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা না হলে আমরা সকলেই তাই করতাম—ঐ ভাষাতে কথা বলতাম, চিন্তা করতাম, স্বপ্ন দেখতাম—এবং কবিতাও লিখতাম। তা যখন আমরা করি নে, এবং রবীন্দ্রনাথও করেননি, তখন ভানুসিংহের ভাষায় কৃত্রিমতা ধরা আমাদের পক্ষে কঠিন, এবং ভানুসিংহের কলমেও ঐ কৃত্রিম ভাষা সম্পূর্ণ কৃত্রিমতা লাভ করেনি; অর্থাৎ কৃত্রিম ভাষাটি তাঁর কলমে আর একটু বেশি কৃত্রিম হয়েছে। চেষ্টা করে তা ধরা যায়, তার জন্যে খোলা চোখ যথেষ্ট না, অণুবীক্ষণ-যন্ত্র হয়তো দরকার।

কিন্তু কাব্যবিচারে আমরা যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষপাতী নই।

বালক-বয়সে এই পদরচনার কাজে রবীন্দ্রনাথের হাতে-খড়ি। সেই সময়ে তিনি এ-ব্যাপারে রহস্যের সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার পরই তিনি ভানুসিংহের নামে পদরচনা বন্ধ করেন নি। বয়স বৃদ্ধির পরেও রচনা করেছেন। তাঁর এই কাজের দ্বারাই তিনি ভানুসিংহকে স্বীকার করে নিয়েছেন বলে ধরা যায়। তিনি যদি তাঁর বাল্যলীলাকে ছেলেখেলা বলে উড়িয়ে দিতেন, তাহলে সেই ছেলেমির সঙ্গে নিজেকে তিনি পরবর্তী কালে জড়িত করতেন না বলেই মনে হয়।

এরও তো আরও কত বছর পরের কথা—১৯১৭ সালের কথা। তখনও তিনি ভানুসিংহের নামে লিখেছেন গদ্য—পত্রাবলী। তাঁর ভানুসিংহের পত্রাবলী সম্বন্ধে এই কথা বলা হচ্ছে;—উৎসর্গ-পত্রে লিখেছেন, "এই পত্রগুলি দিয়ে যে পত্রপুট গাঁথা হয়েচে তার মধ্যে রানুর প্রতি ভানুদাদার আশীর্বাদ পূর্ণ রইল।" পত্রধারার এই চিঠি-গুলির মধ্যে 'একটি বালিকা'র প্রতি 'লেখকের সকৌতুক স্নেহ' যেমন জড়িয়ে আছে তেমনি সহজভাবে বলা আছে অনেক শক্ত

কথাও, বলা আছে, "তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না—হয়তো তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব, কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম করেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।" কথাটা সামান্য, কিন্তু তার মধ্যেই একটি সূক্ষ্ম বেদনার ইঙ্গিত লুকানো আছে।

কোথায় ষোলো, আর কোথায় সাতান্ন—ষোলো বছর বয়সে ভানুসিংহের আবির্ভাব, সাতান্ন বছর বয়সেও—অর্থাৎ দীর্ঘ চল্লিশটি বছর ধ'রে—রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে জীবিত রেখেছেন ভানুসিংহকে।

তিনি যাকে এতটা সম্মান দিয়েছেন, তিনি যাকে এতদিন ধ'রে এমন ভাবে লালন করে এসেছেন—আমরা তার প্রতি যেন উদাসীন না হই।

কবিতা পড়া

বিশ্বপতি চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের কবিতা কেমন করে পড়তে হয়, সে-সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবার ভার পড়েছে আমার ওপর। কেমন করে পড়তে হয়, মানে কেমন করে রিডিং পড়ে যেতে হয়, তা যে নয়, সে-কথা বোধ হয় তোমাদের নতুন করে বুঝিয়ে দিতে হবে না; কেননা, ও কাজটা ত তোমরা নিজেরাই পার;—কেমন করে পড়তে হয় মানে কি-রকম মন এবং মেজাজ নিয়ে পড়তে হয়।

অনেক কবিতা আছে, যার মধ্যে কঠিন কঠিন শব্দ থাকায় তার অর্থ তোমরা বুঝতে পার না। ঐসব কঠিন শব্দের অর্থ যদি তোমাদের বলে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ কবিতা বুঝতে তোমাদের আর একটুও অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বেলায় কিন্তু ওকথা বলা চলে না।

তাঁর যেসব কবিতায় কঠিন শব্দ আদৌ নেই, সে-সব কবিতারও অর্থ বুঝতে আমাদের রীতিমত বেগ পেতে হয়! এর কারণ কি? তোমরা ত ছেলেমানুষ, তোমাদের চেয়ে যাঁদের বয়েস অনেক বেশী, তাঁদেরও অনেককে বলতে শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কেমন যেন ঝাপসা. কেমন যেন ধোঁয়াটে, কেমন যেন ঠিক ধরা-ছোয়া যায় না—এর কারণ কি?

এই ধর না কেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতার এক জায়গায় লিখেছেন—

'আজি যা দেখিছ, তারে
ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না, তারি ভিড়।'

এই তিনটি লাইনের মধ্যে কোন্ শব্দটির অর্থ তোমারা জান না

বল ? একমাত্র 'নিবিড়' শব্দটি একটু যা কঠিন ;—তাও খুব কঠিন নয়। ও শব্দটির অর্থ না হয় বলেই দিই। নিবিড় মানে ঘন। তাহলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ঐ লাইন তিনটির অর্থ এইরকম দাঁড়ায়—'আজ যা-কিছু দেখছ, তাকে ঘনভাবে ঘিরে রয়েছে যা দেখতে পাচ্ছ না তারি ভিড়।'

কথার কথার অর্থ ত এখন দিব্যি বুঝতে পারলে, কিন্তু তারপরেও কি লাইনগুলির ভিতরকার অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার হল ?

তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, অর্থ বুঝতে পেরেও আমাদের বলতে হচ্ছে—কবি কি যে বলতে চান, তা ত বুঝে উঠতে পারলাম না।—এর কারণ কি ?

এর কারণটাই আজ তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করব।

ধর তুমি একটি সুন্দর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সাজানো-গোজানো বাগান-বাড়ি দেখে এলে। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, বাড়িটি দেখে তোমার মনে কি হল, তা আমার কাছে প্রকাশ করে বল ত।

তুমি নিশ্চয়ই তোমার মনের ভাবটি আমার কাছে প্রকাশ করে বলতে পারবে। কিন্তু একটা অনেককালের পুরোনো ঐতিহাসিক কেল্লায় তোমাকে যদি নিয়ে যাওয়া যায়, আর সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কেল্লাটা দেখে তোমার মনে কি হল, প্রকাশ করে বল ত! তাহলে তোমাকে বোধ হয় বেশ একটু মুস্কিলে পড়তে হয়।—নয় কি ?

ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সুন্দর বাগান-বাড়িটি দেখে তোমার মনে কি হল, তা বলে বোঝান খুবই সোজা। তুমি যতই বল না কেন এবং যত রকম করেই বলবার চেষ্টা কর না কেন, কথাটা একই রকম দাঁড়াবে—অর্থাৎ বাগান-বাড়িটি দেখে তোমার মনে খুব আনন্দ হয়েছে, স্ফূর্তি হয়েছে।

কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক ভাঙা কেল্লাটা দেখে তোমার মনে কি হল, তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা অত সহজ নয়। যদি জিজ্ঞাসা করি, খুব আনন্দ পেয়েছ? তুমি নিশ্চয়ই বলবে, তা পেয়েছি বৈকি! অমন একটা ঐতিহাসিক কেল্লা দেখে কার মনে না আনন্দ হয়, মশাই? কিন্তু ঐখানেই কি তোমার মনের সব কথা বলা শেষ হয়ে গেল?—সেই সঙ্গে একথাও কি তোমাকে বলতে হবে না যে, ঐ পুরোনো কেল্লাটা দেখে তোমার মনের মধ্যে একটা বেদনার ভাবও জেগে উঠেছে?—একদিন কত জঁাক-জমক ছিল ঐ কেল্লাটার,—আর আজ? কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস তোমার বুকের মধ্যে ঠেলে উঠবে না কি? তারপর আরও কত কি মনের মধ্যে জেগে উঠবে।—সেকালের কত কথা, কত স্মৃতি, কত কল্পনা।

এখানে তোমার মনের ভাবটি অনেক বেশি জটিল। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাগান-বাড়িটি দেখে তোমার মনে যে ভাবটি জেগেছিল, তার মতন এটা সহজও নয়, সরলও নয়।

এখন ধর, ঐ ভাঙা কেল্লা দেখে তোমার মনে যেসব ভাব জেগেছিল, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যদি তোমার সেগুলিকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলতেন—

'আজি যা দেখিছ, তারে
ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না, তারি ভিড়।'

—তাহলে কেমন হত?

তুমি দেখে এলে একটা ভাঙা কেল্লা, কিন্তু তোমার মন তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল সেই প্রাচীন যুগে। কেল্লাটা দেখে তোমার মনে জাগলো পুরোনো যুগের কত স্মৃতি, কত কথা, কত কল্পনা। কাজেই, তুমিই যা চোখে দেখলে, তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—

এমন সব ব্যাপার, যা তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না।—নয় কি?

এই পৃথিবীটা কত প্রাচীন বল ত! পৃথিবীর প্রাচীনত্বের সঙ্গে তুলনা করলে ঐ ঐতিহাসিক ভাঙা কেল্লাটাকে প্রাচীন বলেই মনে হবে না!—নয় কি?

তাহলেই ভেবে দেখ, একটা প্রাচীন ভাঙা কেল্লা দেখেই তোমাকে বলতে হচ্ছে—

'আজি যা দেখিছ, তারে
ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না, তারি ভিড়।'

আর তার চেয়ে লক্ষগুণে প্রাচীন এই পৃথিবীটাকে দেখে রবীন্দ্রনাথ যদি ওকথা বলেন, তাহলে সেটা আরও কত সত্য কথা হয়ে ওঠে।

তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, ঐ ভাঙা কেল্লা দেখে তোমার মেজাজটি যেরকম হয়েছিল, অনেকটা সেই রকম মেজাজ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঐ লাইনতুটি যদি পড়, তবেই ওর ভিতরকার আসল ভাবটি ঠিক ধরতে পারবে; আর তা না হলে কথার কথার মানে ধরে যতই বুঝতে চেষ্টা কর না কেন, শেষ পর্যন্ত বলতে হবে—নাঃ, কিছুই ঠিক বোঝা গেল না,—সবটাই কেমন যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে থেকে গেল।

আসল কথা, আমাদের মনের যেসব ভাব অন্য পাঁচরকম ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে নেই, সে-সব ভাবকে আমরা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারি; কিন্তু আমাদের মনের যেসব ভাব আর পাঁচটা ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে জট্-পাকিয়ে থাকে, সেগুলোকে লেখায় প্রকাশ করাও যেমন কঠিন, পাঠকদের পক্ষে সেগুলোকে বোঝাও তেমনি কঠিন।

ঐসব কবিতা বুঝতে হলে কবি যে-মেজাজ নিয়ে কবিতাগুলি লিখে গেছেন, সেই মেজাজটিকে ঠিক ভাবে ধরতে হবে; অর্থাৎ কবির সেই মেজাজটিকে নিজের মেজাজ করে নিয়ে তবে কবিতা-গুলি পড়তে হবে।

এইবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আরও কয়েকটি লাইন ধরে ব্যাপারটাকে আরও একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক্।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর মনে কি-ভাব জাগিয়ে তোলে, তা প্রকাশ করে বলতে গিয়ে কবি এক জায়গায় বলছেন—

'ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদী-স্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস,
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।'

কবি বলতে চান, পৃথিবীর এইসব প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর মনে যে-ভাবটি জাগিয়ে তোলে, তা ঠিক আনন্দও নয়, ঠিক বেদনাও নয়,—আনন্দ-বেদনায় জড়িত একটা মিশ্রভাব। প্রাচীন ভাঙা কেল্লা দেখে তুমিও কি বলবে না—ঐ ভাঙা কেল্লা দেখে তোমার মনেও একটা আনন্দ-বেদনায় জড়িত মিশ্র অনুভূতি জেগে ওঠে?

এইবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তুলে-দেওয়া ওপরের ঐ লাইনগুলির দিকে আর একবার লক্ষ্য কর। কবি বলছেন—

'যে আনন্দ-বেদনায়—
এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস,
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ!'

পৃথিবীর প্রাকৃতিক এইসব দৃশ্য যে আনন্দ-বেদনায় কবির মনকে উদাস করে তুলেছে, কবি বলছেন—

'হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।'

কবির হৃদয় এই আনন্দ-বেদনায় জড়িত মিশ্র ভাবটির প্রকাশের ভাষা খুঁজছে। কিন্তু খুঁজলে কি হবে?—এ ভাব প্রকাশ করবার ভাষা কবি কোথায় পাবেন? এভাব ত স্পষ্ট করে অপরকে বোঝান যায় না।

তাই শেষ পর্যন্ত কবিকে বলতে হয়েছে—

'সে কথা বলতে পারি
এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।'

প্রাচীনকালের ঐ ভাঙা কেল্লাটা দেখে তোমার মনে যে-ভাবটি জেগে ওঠে, তাকেই কি তুমি সরল ভাষায় বোঝাতে পার? সব কথা বলা হয়ে যাবার পরেও কি মনে হয় না, আরও অনেক-কিছু বলা বাকি রয়ে গেল?

এই রকম মনের ভাব যেসব কবিতায় ফুটে ওঠে, ইংরেজিতে তাদের বলা হয় রোম্যান্টিক কবিতা। এই ধরনের কবিতা যাঁরা লেখেন, তাঁরা চোখে যা দেখেন, তাতেই সন্তুষ্ট নন, তার পিছনে আরও অনেক-কিছু মন দিয়ে, মেজাজ দিয়ে, কল্পনা দিয়ে দেখতে পান।

তাই এঁদের বলতে হয়—

'আজি যা দেখিছ, তারে
ঘিরেছে নিবিড়,
যাহা দেখিছ না, তারি ভিড়।'

বার্ষিক অভিষেক ॥

রবীন্দ্রনাথ···একাধারে ছিলেন কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, ছোট-গল্পলেখক, নাট্যকার, গীতকার, প্রবন্ধকার, পত্রলেখক, সাহিত্য-সমালোচক। প্রত্যেক বিভাগেই তাঁহার রচনা ছিল অসাধারণ শিল্পগুণ-সমৃদ্ধ ও অপরূপ সৌন্দর্যময়। উনবিংশ শতকের বাঙালীর সমগ্র চেতনা, প্রেরণা, ধ্যান ধ্যারণা—তাহার সমগ্র চিন্ময় ও সত্তা—তাঁহার মধ্যেই চূড়ান্ত বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। কেবল সাহিত্য নহে, সংগীত ও চিত্রকলাও তাঁহার অকৃপণ প্রতিভার দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কেবল বাংলা বা ভারতের ইতিহাসে নহে, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের কুলপতি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) একদিকে যেমন ইংরেজ বণিকদের সহিত ব্যবসায় করিয়া তাঁহার ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনের পথও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৬-১৯০৫) ধন-ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়াও ঋষিতুল্য জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার অধ্যাত্মপরায়ণ নিলিপ্ত জীবনধারা তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট মহর্ষি নামে পরিচিত করিয়াছিল। ধর্মীয় বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন এবং রামমোহনের মৃত্যুর পর তিনিই 'ব্রাহ্মসভাকে' 'ব্রাহ্মসমাজে' পরিণত করিয়াছিলেন। উপনিষদের বাণী ও খ্রীষ্টের জীবন তাঁহাকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, এইভাবে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের প্রতীকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবজাগ্রত বাঙালী

জাতি ঐ সময় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারায় সমন্বয়ের মধ্যে যে নূতন পথের সন্ধান করিতেছিল, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার অন্যতম পথিকৃৎ। তাই জাতির সমগ্র চেতনা ও কল্যাণকর্মের সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল। ফলে তাঁহার সন্তান ও ভ্রাতুষ্পৌত্রদের মধ্যে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির দিক্‌পালগণের যে আবির্ভাব ঘটিবে এবং তাঁহার পরিবার যে নবজাগ্রত ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির স্নায়ুকেন্দ্র হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ অসামান্য মনীষার অধিকারী ছিলেন। কাব্যে, দর্শনে, সংগীতে, চিত্রকলায় ও গণিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। 'বঙ্গদর্শনের' পরবর্তী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্র 'ভারতী' তিনিই স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.। দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ নাট্যরচনায়, সংগীতে, চিত্রাঙ্কনে ও স্বাদেশিকতায় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা দেশে মেয়েদের মধ্যে উপন্যাস লিখিয়া সর্বপ্রথম খ্যাতিলাভ করিয়া-ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের দুই ভ্রাতুষ্পৌত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতীর চিত্রশিল্পের পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সকলের প্রতিভা দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের নিকট ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুর-পরিবারের নীহারিকার অসংখ্য জ্যোতিষ্ক-পুঞ্জের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাস্বর জ্যোতিষ্ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পিতামহের ঐশ্বর্য, পিতার রাজর্ষিতুল্য ব্যক্তিত্ব এবং অগ্রজদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্পপ্রীতি, সকল কিছুই রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার লোকমোহিনী তিলোত্তমা সৃজনে যে সহায়তা করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই কাব্যানুশীলন শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহার তেরো বৎসর বয়সের পূর্বেকার রচনা কালের অতল তিমিরে নিমজ্জিত হইলেও, তাঁহার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের

রচনাগুলি আজও রহিয়াছে—যদিও রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে তাঁহার কাব্যভাণ্ডারে স্থান দিতে সংকোচবোধ করেন। ঐ সময়ে তিনি 'শৈশব সংগীত', 'বনফুল', 'ভানুসিংহের পদাবলী' ও সম্ভবত 'রুদ্রচণ্ড' রচনা করেন। 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের অনুকরণে ব্রজবুলি ভাষায় কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন যে, ইংরেজ বালক কবি চ্যাটার্টনের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তিনি ষোল বৎসর বয়সে এই কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথের এই রচনা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকেও বিভ্রান্ত করিয়াছিল। এই কবিতাগুলিতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণ এমন নিখুঁত হইয়াছিল যে, অনেকে ইহাকে সত্যই ভানুসিংহ নামে কোনও প্রাচীন কবির রচনা মনে করিয়াছিলেন। এই যুগের ভানুসিংহের পদাবলী ছাড়া অন্য কোন রচনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যজীবনের ইতিহাসে স্থান দেন নাই। তিনি মনে করেন, 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' হইতেই তাঁহার প্রকৃত কবিজীবন আরম্ভ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের স্রষ্টা ও উপন্যাসের দিক্‌পরিবর্তনের প্রবর্তক। তিনি কাব্যে ও উপন্যাসে প্রায় একই সঙ্গে হাত দেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'রাজর্ষি' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস—প্রথমটি যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও দ্বিতীয়টি ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে লইয়া রচিত। এই উপন্যাস দুইটিতে বঙ্কিম-প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এইগুলিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে পারা যায় না—প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাস ইহাদের পাদপীঠ ও জীবন ইহাদের নেপথ্য-গৃহ। 'রাজর্ষি' উপন্যাসখানি 'বালক' পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ কিশোর পাঠক-পাঠিকার উপযোগী করিয়া লিখিয়াছিলেন।

'রাজর্ষি'-রচনার পরে প্রায় দীর্ঘ সতর বৎসর রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-রচনা হইতে বিরত ছিলেন। 'চোখের বালি' (১৯০২) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) তাঁহার পরবর্তী উপন্যাস। 'চোখের বালি' উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি যুগান্তর সূচিত করে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলিতে এখন যাহা বুঝায়, 'চোখের বালি'তেই তাহার সূত্রপাত বলা চলে। অবশ্য, 'নষ্টনীড়' (১৯০১) নামে তাঁহার বিখ্যাত বড় গল্পে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের রচনায় প্রথম পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 'নৌকাডুবি'তে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনারই প্রাধান্য। নর-নারীর মানস-মন্থন হইতে ইহার অমৃত ও হলাহল উত্থিত হয় নাই, ইহার কাহিনী কতকটা কৃত্রিমভাবেই গঠিত হইয়াছে।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের এবং সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহাতে তৎকালীন স্বাজাত্যবোধ ও ধর্মবিরোধের প্রথম তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উদ্বেল বাঙালী জীবন ও মানসের এক অখণ্ড অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। ইহা তাই মহাকাব্যের মহিমা ও ব্যাপকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 'গোরা'র পরে রবীন্দ্রনাথ যে উপন্যাসগুলি রচনা করেন, সেগুলির মধ্যে আমরা সমস্ত জীবনের প্রতিচ্ছবির পরিবর্তে খণ্ডচিত্র ও আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের সমাবেশই দেখিতে পাই। এই উপন্যাস-গুলি হইল—'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯৩০), 'দুই বোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)। এগুলি অভিনব শিল্পকৌশল ও জীবনসমীক্ষা অবলম্বনে রচিত। সংঘাত-তাড়িত স্বল্প পরিধির চরিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। ভাষা তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও শাণিত। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বাংলার সন্ত্রাসবাদের আন্দোলনে জড়িত কয়েকটি বেদনাদীর্ণ ব্যক্তিমানসের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে এই বিষয়েরই

পুনরাবৃত্তি ও রকমফের দেখা যায়। 'চতুরঙ্গ' মতবাদ-প্রভাবিত উপন্যাস, সন্ত্রাসবাদের ন্যায় গুরুবাদের একটি বিভ্রান্তিকর প্রভাবের চিত্র ইহাতে রহিয়াছে। 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' উপন্যাসদ্বয়ের শ্লেষাত্মক বাস্তববোধের সহিত ধ্যানতন্ময় আদর্শানুভূতির যথেচ্ছ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 'যোগাযোগ' স্পষ্টতঃই অসম্পূর্ণ উপন্যাস। 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' প্রভৃতি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ যেন কতকটা অবহেলার সহিত লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা-মহাদেশের আশে-পাশে ছড়ানো দুই একটি স্বল্পায়তন দ্বীপের মতোই এগুলি মহাদেশের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত নহে, এগুলি ঐ মহাদেশের পরিধি বিস্তারেও সহায়তা করে নাই।

'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' ও সম্ভবতঃ 'যোগাযোগ' ছাড়া আর কোনও উপন্যাসে কোনও বৃহৎ তাৎপর্যময় জীবন-সত্য, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রবিকাশের অনিবার্য পরিণতিরূপে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু ছোটগল্প যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র মনের প্রকাশ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে ছোটগল্প-রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত সৃজন-কালের ব্যাপ্তি ১৮৯১ হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই যুগের পর পূর্ণ আট বৎসরকাল একটি দীর্ঘ বিরতি ঘটে, পরে পুনরায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গল্পরচনার ছিন্ন সূত্র যোজিত হয় এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার জের চলে।

জীবনের অফুরন্ত বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ছোট পাত্রগুলিকে কানায় কানায় রসোচ্ছল করিয়াছে। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'রাসমণির ছেলে', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'সম্পত্তি-সমর্পণ', 'গুপ্তধন', 'হালদার-গোষ্ঠী', 'দৃষ্টিদান', 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'দুরাশা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কর্মফল', 'শেষের রাত্রি' প্রভৃতি গল্পগুলি চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের কথা ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী। বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন কোন শাখা নাই যাহা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে পুষ্পিত পল্লবিত না হইয়াছে। আবার শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং ধর্মনীতি সম্পর্কেও তিনি নূতন বাণী প্রচার করিয়াছেন, নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন।

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় তাঁহার কাব্যে কবিতায় গানে। সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত এক ভাষণে কবি নিজেই বলিয়াছেন: "নিজের সত্য পরিচয় সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।"

এশিয়াবাসীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হন তিনিই ঐ পুরস্কারের অধিকারী হন। যে বইখানির জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান সেখানি তাঁহার কয়েকটি গান ও কবিতার ইংরেজী অনুবাদের সংকলন—বইটির নাম গীতাঞ্জলি। বাঙ্গালা গীতাঞ্জলি (১৯১০) নামক বিখ্যাত বইয়ের অধিকাংশ রচনাই ইংরাজী গীতাঞ্জলির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কবি বিশ্বনাথের বাণী শুনিতে পাইয়াছেন এবং এই বিশ্বের মধ্যেই জলে স্থলে আকাশে বাতাসে তাঁহার চকিত দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গীতাঞ্জলির অনেক গানে সেই পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশপ্রীতি বিষয়ক গান ও কবিতাগুলি প্রাণস্পর্শী। সাহস, নির্ভীকতা, আত্মোৎসর্গ এবং ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানে একান্ত বিশ্বাস—এইগুলি তাঁহার স্বদেশী কবিতার প্রধান উপাদান। তাঁহার স্বদেশপ্রেমে সংকীর্ণতা নাই, বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ নাই। তিনি বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। স্বদেশ তো বিশ্বেরই অন্তর্গত। বিশ্বের হিত হইলে তবেই স্বদেশের হিত হইবে—এই ছিল তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস। এই বিশ্বমানবতার সুর তাঁহার অনেক কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশ্বমানবতা বোধের সঙ্গে আত্মীয়ের কল্যাণ কামনার কোন বিরোধ নাই! তাই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—

বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করিয়া তাই বলিয়াছেন—

পুণ্য পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

রবীন্দ্রনাথের যে সাধনা সে বৈরাগ্যের সাধনা নয়। সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় আলোয়-আঁধারে ভরা মানুষের কর্মচঞ্চল এই যে জীবন ইহা ছাড়িয়া তিনি স্বর্গের ইন্দ্রত্বও চান না।

মরিতে চাহি না এই সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

জীবনকে তিনি যেমন সকল মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন মৃত্যুকেও তেমনি অস্বীকার করেন নাই। মরণকে তিনি এই জীবনের পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াছেন।

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

একটি বিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি

বাঙ্গালা সাহিত্যে শিশু-কবিতাও রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি। ঠাকুরবাড়ি হইতে প্রকাশিত 'বালক' নামক মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম এ জাতীয় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' (১৮৮৪) কবিতাটি তাঁহার শিশুদের জন্য রচিত প্রথম কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ হাস্যরসের কবিতাও অনেক লিখিয়াছেন। বালক সুরেন্দ্রনাথকে (মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র) একবার কবি নাসিক হইতে হিন্দী বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষার একটি মজার চিঠি লিখেন তাহার একটু নমুনা উদ্ধৃত করি :

সর্বদা মন কেমন করতা কেঁদে উঠতা হির্দয়
ভাত খাতা ইস্কুল যাতা সুরেন বাবু নির্দয়।
মনকা দুঃখে হু হু করকে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী
অসম্পূর্ণ ঠেকতা কানে বাঙ্গলাকে জবানী।

কল্পনা কাব্যে জুতা আবিষ্কার নামক একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। তাহার প্রথম স্তবক এইরূপ :

কহিলা হবু. "শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র,
মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ ফেলা মাত্র।
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি।
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।"

প্রতিকারের বিবিধ ব্যবস্থা হইল। তাহাতে বিপদ বাড়িল বই

কমিল না। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতের দল মিলিয়া ঠিক করিল চামড়া দিয়া পৃথিবীটা ঢাকিয়া দেওয়া হউক, তাহা হইলেই রাজার পায়ে ধূলা লাগা বন্ধ হইবে। কিন্তু,

যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে এত উচিতমতো চর্ম।
তখন ধীরে চামার কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

রবীন্দ্রনাথের 'প্রহাসিনী' (১৯৩৯) কবিতাগ্রন্থে অনেকগুলি হাস্যরসের কবিতা আছে। বৃদ্ধ বয়সেও কবির মনের তারুণ্য যে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই এই কবিতাগুলিই তাহার সাক্ষ্য। একটি কবিতার নাম ভোজন-বীর। সেই বীরের উপদেশ ঃ

অসংকোচে করিবে কষে ভোজন রস ভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ।
যকৃত যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
না হয় হবে পেটের গোলযোগ।

কবি নিশ্চিত জানিতেন ঃ

এত বুড়ো কোনো কালে হব নাকো আমি
হাসি তামাশারে যবে কব ছ্যাবলামি।

তাঁহার কাব্যে অসংখ্য নূতন ছন্দের সাক্ষাৎ পাই। বলাকায় যে মুক্তক ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অভিনব। ইহার চরণগুলির অক্ষর সংখ্যা পয়ারের মত নির্দিষ্ট নহে। যতি অনুসারে চরণগুলি ছোট বড় হয়। তবে চরণে চরণে মিল আছে। যেমন,

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

শেষ বয়সের অনেকগুলি কবিতা গদ্যছন্দে লেখা। শ্যামলীর একটি কবিতার কয়েক ছত্র ঃ

বাঁশিওয়ালা,
বেজে ওঠে তোমার বাঁশি,
ডাক পড়ে অমর্ত্য লোকে ;
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।
সেখানে কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া
তরুণ সূর্য আমার জীবন।

মধুসূদন মিলের বন্ধন ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা কাব্য-সরস্বতীকে যে মুক্তি দিয়াছিলেন, পদ্যের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতার সেই মুক্তিকে আরও ব্যাপক ও সুদূর প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন।

হঠাৎ একদিন খবর এলো কবি আসছেন কলকাতায়। তাঁকে যেন গিয়ে স্টেশন থেকে নিয়ে আসি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়ীতে এসে থাকবেন। আনন্দে একেবারে উতলা হয়ে রয়েছি। সবে সংসারে ঢুকেছি। নিজের গৃহিণীপনার উপর কিছুমাত্র আস্থা নেই। কবির মতো অতিথি। কি রান্না করবো, কেমন করে যত্ন করবো কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছি না; তাই আনন্দের সঙ্গে উৎকণ্ঠা উদ্বেগও কম নেই মনে। একমাত্র ভরসা আমার স্বামীর কাছে আগেও উনি থেকে গিয়েছেন তাই তিনি আমায় বলে দিতে পারবেন কখন কি চাই না চাই। নিজের সাধ্যমতো ঘরদোর গুছিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম। কবি আসবার অল্পক্ষণ পরেই মনের সব ভয় মিলিয়ে গেলো তাঁর সহজ হাস্য পরিহাসে ও সস্নেহ ব্যবহারে।

আমাদের বাড়িতে একটা বেলা থাকবার পর রাত্রে যখন খেতে বসেছি বললেন, 'জানো, এবারে ফস করে প্রশান্তর (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) নেমন্তন্নতে রাজী হয়ে অবধি মনে মনে অনুতাপ করেছি। সত্য বলছি আসতে ভয় পাচ্ছিলুম। তার কারণটা তোমাকে তাহলে বলি। তোমার বিয়ের প্রায় দুমাস আগে আমি আর একবার এ বাড়িতে থেকে গিয়েছি, তা জানো বোধহয়? বাগান-টাগান আছে শুনে খুশি মনেই এসেছিলুম। সে সময় ওর আর একজন ইংরেজ অতিথি স্যার গিলবার্ট ওয়াকার-ও এখানে ছিলেন। মানুষটি বড় ভালো। অতবড় নামজাদা বৈজ্ঞানিক হলেও খুব রসবোধ আছে দেখলুম। সাহিত্য, সঙ্গীত সব বিষয়েই খুব উৎসাহ। নিজে ভালো বাঁশি বাজাতেন, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যিই জ্ঞান আছে। তাই আমাদের দুজনের আলাপ আলোচনা

বেশ ভালোই জমতো। কিন্তু বিপদ শুধু খাবার সময়। প্রশান্তর যে বাবুর্চি সে বুঝে নিয়েছিল তার মনিবের সংসার চালনায় কতখানি দক্ষতা, তাই খেতে বসে রোজ দেখি শুধু রাশি রাশি ভাত আর মুলোর তরকারী আসছে টেবিলে। প্রশান্ত হতাশ হয়ে এদিক-ওদিক তাকায় আর কি করবে তা ভেবে পায় না। দুদিন পরে দেখি ওর ভগ্নীটিকে ধরে এনেছে অতিথিদের তদারক করবার জন্যে। বাব্লি বেচারী ছেলেমানুষ, কোনো দিন সংসারের কিচ্ছু জানে না, সে কেমন করে এইসব বুদ্ধিমান চাকরদের সঙ্গে পারবে? এদিকে সায়ান্টিস্ট ভাবলো স্ত্রী জাতীয়া যে কোনো একজন বাড়িতে থাকলেই বুঝি টেবিলে খাবারের উন্নতি হবে। বেচারা বাব্লি। আমি দেখি সে সারাদিন অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চায় আর দক্ষিণের বারাণ্ডার একটা আরাম চৌকীর উপর বসে বাড়িতে যতগুলো ছেঁড়া পাতার নভেল ছিল পড়ে শেষ করবার চেষ্টা করে। ঐ নেপালী চাকর 'কেটা' আর বাবুর্চিই অবাধে রাজত্ব চালাচ্ছে। (বাব্লি এখন অতি পাকা গিন্নি, কিন্তু কবির সেদিনকার বর্ণনা শুনিয়ে ওকে আমরা প্রায়ই উপহাস করেছি, সেও কবির সঙ্গে কপট ঝগড়া করেছে। এমনি করেই তিনি স্নেহের জনদের নিয়ে ঠাট্টা করতেন।) সেই মুলোর তরকারীর ভীতি মনে ছিলো বলেই এবারে প্রশান্তকে কথা দিয়ে অবধি অনুশোচনা করছিলুম। কিন্তু আজ অসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে, আমি বৃথাই ভয় পেয়েছিলুম-।' এমন বলবার ভঙ্গী যে আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম। ওঁর এই সহজ হাস্য পরিহাসে আমার মন একেবারে হাল্কা হয়ে গেল। তখনই বুঝলাম এরকম অতিথির কাছে আমার কোনো ভাবনা নেই, যতই আনাড়ী গৃহিণী হই না কেন।

এর কয়েকদিন পরে সকালে খেতে বসে বললেন যে, তাঁর পিঠে একটা ব্যথা হয়ে কষ্ট দিচ্ছে—বোধহয় 'মাস্কুলার পেন' যাকে বলে তাই হয়েছে। আমি আমার ঘরে এসে আমার স্বামীকে

বললাম যে, একটু 'উইন্‌টোজেনো' ক্রীম মালিশ করে দিলে হয় না? ওটাতে খুব ব্যথা সারে তা দেখেছি! উনি হেসে বললেন, 'কবিকে তো চেনো না, তাই এই কথা বলছো; মালিশ কি তিনি করতে দেবেন?' 'কেন দেবেন না? নিশ্চয়ই দেবেন।' জবাব পেলাম, 'কবি কখনও কারো কাছ থেকে পার্সোনাল সেবা নিতে চান না। একবার খুব বেশী জ্বর, আমি কাছে বসে বাতাস করতে গিয়েছিলাম, উনি তৎক্ষণাৎ পাখাটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। তাই বলছি, ওসব বুদ্ধি খাটিয়ো না, দেখবে বিরক্ত হয়ে এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবেন।' আমারও জেদ যে নিশ্চয়ই আমার সেবা নেওয়াতে পারবো। পরস্পরের মধ্যে বাজী রেখে ক্রীমটা হাতে নিয়ে কবির ঘরে গিয়ে ঢুকলাম—দেখি দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে লিখবার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি লিখছেন। আমি নিঃশব্দে চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কোনো ভূমিকা না করেই পাঞ্জাবীটা টেনে তুলে নিয়ে পিঠে ক্রীম মালিশ করতে শুরু করে দিলাম। আমার স্বামী তো আমার দুঃসাহস দেখে অবাক, ভাবছেন, এখনি বুঝি একটা ধমক খাবো। কবি কিন্তু আমাকে না বকুনি দিয়ে একটু হেসে বললেন, 'ও কিও। ওটা আবার কি হচ্ছে?' বললাম, 'আপনার পিঠে ব্যথা হয়েছে, তাই ওষুধ মালিশ করছি; এটাতে ব্যথা কমে যাবে।' শান্তভাবেই বললেন, 'আচ্ছা দেখি তোমার ডাক্তারীর ফলটা কিরকম হয়।' বলবামাত্র আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, আমার স্বামীর মুখেও অপ্রস্তুতের হাসি। কবি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'এতটা কৌতুকের কি কারণ হোলো?' আমি বললাম, 'আপনার সায়ান্টিস্টকে বাজীতে হারিয়ে দিয়েছি।' 'কি রকম?' তখন বললাম সব বৃত্তান্তটা। উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'প্রশান্ত, এ কী কাঁচা কাজ করলে? আমাকে আগে বলতে হয়; তাহলে কি রানীকে আমি আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে দিই?' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'প্রশান্ত ঠিকই বলেছে; আমি

কখনও কারো সেবা নিতে রাজী হই না। কিন্তু তুমি তো আমার অনুমতি নাওনি, একেবারে হঠাৎ এসেই মালিশ করতে শুরু করে দিলে। মিথ্যে তোমাকে দুঃখ দেব না বলে আপত্তি করলুম না। আর এখন দেখছি তোমার ডাক্তারীতে একটু আরামও লাগছে।' সেই একটি ঘটনাতেই সেদিন বুঝেছিলাম কবি আমাকে সত্যিই আপনজন বলে গ্রহণ করেছেন। আর সেইদিন থেকেই আমার সেবার দাবিটা কায়েমী হয়ে গেল; পরে তো অনেকদিনই আমাকে 'হেডনার্স' বলে ঠাট্টা করতেন।

দেশ। ১৯শে কার্তিক, ১৩৬৭॥

রবীন্দ্রনাথের হাসির কবিতা

প্রবোধচন্দ্র সেন

বাঙালিকে যাঁরা দুর্লভ হাস্যসম্পদের অধিকারী করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম সাধারণ-পর্যায়ভুক্ত নয়।····সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় হাস্যরসের দিক্‌টাও তারই জাদুস্পর্শে এমন বিচিত্রতা ও অজস্রতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর গুপ্তের একটি বিখ্যাত রসিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অতি সাধারণ ধরনের কৌতুক-রচনার তুলনা করলেই বোঝা যাবে বাঙালির হাসিতে কি অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে এই সময়ের মধ্যে। ঈশ্বর গুপ্তের পাঁটাস্তরের দুটি শ্লোক উৎকলন করছি।—

এমন পাঁটার মাংস নাহি খায় যারা
ম'রে যেন ছাগীগর্ভে জন্ম লয় তারা।····
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া॥

এর সঙ্গে তুলনা করা যাক রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'র এই ক-টা লাইন—

বাংলা দেশের মানুষ হয়ে
ছুটিতে ধাও চিতোরে,
কাঁচড়াপাড়ার জলহাওয়াটা
লাগল এতই তিতো রে?
মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার,
পালাস ভয়ে ম্যালেরিয়ার,
হায় রে ভীরু, রাজপুতানার
ভূত পেয়েছে কি তোরে?
লড়াই ভালোবাসিস,—সে তো
আছেই ঘরের ভিতরে॥

হাসিতে হাসিতে কত সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকতে পারে, হাসি ও কান্না পরস্পরের কত কাছে আসতে পারে, রবীন্দ্রসাহিত্যেই তার পূর্ণ পরিচয় পাই।...রবীন্দ্রপ্রতিভার উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণবিভূতিতে আমাদের চোখে ধাঁধা লেগে যায়, তাই তাঁর হাস্যমহিমার দিক্‌টা অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁর প্রতিভা ছিল হীরকখণ্ডের মতো বহুমুখী এবং কঠিন, আর হীরক-খণ্ডের মতোই তার থেকে নিয়তই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হাসির আভা ঠিকরে বেরোত। যে নিত্যপ্রসন্নতা তাঁর মনে বিরাজমান ছিল, তাঁর মুখে চোখেও তাই প্রতিভাত হত। আর তাই যেন মাঝে মাঝে সংহত হয়ে তাঁর একেকটি উক্তি থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো বিচ্ছুরিত হত। সুতরাং রবীন্দ্রপ্রতিভাকে সম্যক্‌ভাবে জানতে হলে তার এই হাস্যোচ্ছলতার দিক্‌টাও আলোচনা হওয়া দরকার।

রবীন্দ্রসাহিত্যের হাস্যরস ॥

নাটকের কথা

আশুতোষ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল যে কবি তাহাই নহে,—বাংলা সাহিত্যের এমন কোনও দিক নাই যে, তাহা তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। নাটকও তাঁহার রচনায় বাদ যায় নাই। শুধু তাহাই নহে, তাহার কয়েকটি নাটক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যে ভাবে আদি যুগ হইতে বাংলা নাট্য রচনার ধারার সূত্রপাত হইয়া ইহা ক্রমে মধ্য যুগ উত্তীর্ণ হইয়া আধুনিক যুগে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কোন যোগ রক্ষা করিয়া চলেন নাই। তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রেরণায় নিজস্ব ভঙ্গিতে নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা নাটকের রূপ এবং প্রকৃতি কি ছিল, দেখিয়া শুনিয়া তাহাই অনুসরণ করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার নাট্যরচনা সাধারণ বাংলা নাট্যরচনার ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের নাটক বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার বিষয় স্বতন্ত্র ভাবেই আলোচনা করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ছোট বড় প্রায় ৪০ খানি নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহারা সকলই এক শ্রেণীর নহে। তাঁহার নাট্যরচনাকে এই কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—গীতি-নাটক, নাট্যকাব্য, নাট্যকবিতা, রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক, ঋতুনাট্য, সামাজিক নাটক, রঙ্গনাট্য, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি। তাঁহার প্রথম জীবনে যে কয়খানি গীতি-সুর-প্রধান নাটক রচিত হয়, তাহাই গীতি-নাটক বলিয়া উল্লেখ করা যায়। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যরচনাই তাঁহার নাট্যকাব্য। ইহাদের মধ্য দিয়া এক একটি দৃঢ়-সংবদ্ধ কাহিনী রসপুষ্ট হইয়া

প্রকাশ লাভ করিয়াছে। 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' এই শ্রেণীর রচনা। ইহাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন,

'কেহ বলে ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।'

এ'কথা রবীন্দ্রনাথ সত্যই অনুভব করিয়াছেন যে, এই সকল রচনা অতিরিক্ত গীতি-ভারাক্রান্ত; সুতরাং যথার্থ নাটক নহে। তথাপি তাঁহার নাটকের মধ্যে চরিত্র-সৃষ্টি কোথাও ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে না; রচনা কাব্য-ধর্মী হইয়া উঠিলেও ইহা দ্বারা যে সরসতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার প্রত্যেক নাটকই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'বিসর্জন' বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি। ইহার মধ্যে আচার-ধর্মের প্রতিনিধি রঘুপতির সঙ্গে হৃদয়ধর্মের প্রতিনিধি গোবিন্দমাণিক্যের যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উচ্চাঙ্গের নাটকীয় গৌরবের অধিকারী হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়াছে। তাঁহার 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' এই শ্রেণীর রচনার অন্তর্গত। ইহারা অঙ্কে অঙ্কে দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত না হইলেও কবিতা নহে, নাটকীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত এবং মানসিক দ্বন্দ্বের উত্থান-পতন ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, সেইজন্য ইহারা কবিতা হইয়াও নাটক। অতএব ইহাদিগকে নাট্য-কবিতা বলা হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক এবং রূপকনাটকগুলি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ্। ইহাদের মধ্যে জীবন-দৃষ্টি সুগভীর এবং সৌন্দর্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। রূপকের আবরণে এবং সংকেতের সহায়তায় ইহাদের মধ্যে গভীরতম জীবন-সত্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহার 'ডাকঘর', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এই শ্রেণীর নাটক। তাঁহার 'ডাকঘর' বিশ্বসাহিত্যে স্থানলাভের অধিকারী হইয়াছে।

ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,—মাধব দত্ত একজন বিষয়-বুদ্ধি-

সম্পন্ন ব্যক্তি ; তাঁহার কোনও সন্তান নাই। তিনি বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অভাবে সেই অর্থ ভোগ করিবার কেহই ছিল না। স্ত্রীর পরামর্শে তাঁহার এক মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র বালককে আনিয়া পুত্রের মত পালন করিতে লাগিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার প্রতি তাঁহার গভীর মমতা জন্মিয়া গেল, তিনি এ' পর্যন্ত যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা এই বালক ভোগ করিতে পারিবে বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন। অর্থ সঞ্চয়ে তাঁহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল।

বালকের নাম অমল। সে রুগ্ন—আর দশজন বালকের মত খেলাইয়া বেড়াইয়া কাটাইতে ভালবাসিত না। পথের ধারের জানালার পাশে বসিয়া সে বাহিরের জগতের দিকে মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকিত। পথের উপর দিয়া দইওয়ালা হাঁকিয়া যায়, প্রহরী পায়চারী করিয়া বেড়ায়, গাঁয়ের মোড়ল নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যায়, মালীদের মেয়ে সুধা পায়ের মল ঝম্ ঝম্ করিয়া নিত্য ফুল তুলিতে যায়, ছেলেরা দল বাঁধিয়া খেলিতে বাহির হয় ; রুগ্ন বালক অমল রুদ্ধ ঘরের মুক্ত জানালাটুকু দিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করে। তাহার জানালার সাম্নে রাজার ডাকঘর বসিয়াছে, নানা রংএর তক্‌মা-পরা ডাক-হরকরারা চারিদিকে রাজার চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইতেছে। অমল শুনিল, তাহার নামেও রাজার চিঠি আসিবে, সে প্রতিদিন তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে লাগিল।

অমল আরও অসুস্থ হইয়া পড়িল। জানালার কাছটি হইতে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। অভিজ্ঞ কবিরাজ তাহাকে শরতের আলো-বাতাস হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পরামর্শ দিলেন। মাধব দত্ত অতি সাবধানে কবিরাজের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। রাজার ডাকঘর হইতে চিঠি পাইবার জন্য অমল অধীর হইয়া উঠিল। গাঁয়ের মোড়ল এ' কথা শুনিয়া তাহাকে উপহাস

করিয়া গেল। বৃদ্ধ ঠাকুর্দা আসিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলেন। তারপর একদিন গভীর রাত্রে বাড়ীর রুদ্ধ সদর দরজা ভাঙ্গিয়া রাজদূত অমলের ঘরে প্রবেশ করিল। জানাইল, রাজা নিজেই অমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতেছেন, তার আগে তাঁহার বালক-বন্ধুটিকে দেখিবার জন্য রাজ-কবিরাজকে পাঠাইয়াছেন। রাজ-কবিরাজ প্রবেশ করিলেন, তিনি সেই মুহূর্তেই ঘরের সকল দরজা জানালা খুলিয়া দিলেন, বাহিরের মুক্ত হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রদীপের আলো নিবিয়া গেল, সুদূর আকাশ হইতে ঘরের ভিতর কেবল তারার আলোক জ্বলিতে লাগিল। অমল ঘুমাইয়া পড়িল। সুধা কয়টি ফুল হাতে করিয়া আসিয়া তাহাকে ডাকিল, কিন্তু তার ঘুম আর ভাঙ্গিল না।

ইহার মধ্যে বালক অমলের চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ইহার করুণ কাহিনীটি একটিমাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বহিয়া গিয়াছে। ইহাতে সুগভীর জীবন-দর্শনের পরিচয় থাকিলেও, বাংলার মাটির মমতায় কাহিনীটি সরস হইয়া উঠিয়াছে। উঠানে বসিয়া জাঁতা দিয়া পিসিমার ডাল ভাঙ্গা, গাছের মগডাল হইতে নামিয়া-আসা ছোট্ট কাঠ-বিড়ালীর খুট্‌খুট্ করিয়া সেই ডালের খুদগুলি খুটিয়া খাওয়া, পুরানো নাগ্‌রা জুতা-পরা বাঁশের লাঠি-কাঁধে কর্মসন্ধানী বিদেশী পথিক, দূর আব্‌ছা পাহাড়ের কোলে ঝরনার বাঁকা রেখা, পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীতীরের দইওয়ালা, মাথায় কলসী পরনে লাল শাড়ী নদীর পথে গাঁয়ের গয়লার মেয়ে—এই সকল চিত্রের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি ইহাতে গভীর মমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা তত্ত্বমূলক হইলেও সরস।

ঋতু-বিষয়ক নাটকের মধ্য দিয়া প্রকৃতি-প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রকৃতি-বোধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের

ভিতর দিয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন, প্রকৃতি-লোকে একটি অখণ্ড শৃঙ্খলা বিরাজমান, তাহারই ফলে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ পর্যায়ক্রমে আসিয়া উদয় হইতেছে। ইহাদিগকে নাটক বলা কঠিন। কারণ, এখানে দ্বন্দ্ব নাই, কেবলমাত্র গতিই আছে। এই গতির তালে প্রকৃতি-রাজ্যে ছন্দ ও সুর বাজিতেছে, ষড়ঋতু একটি মাত্র নৃত্যের তালে বাধা পড়িয়াছে। 'ফাল্গুনী', 'শারদোৎসব', 'শেষ বর্ষণ' এই শ্রেণীর রচনা।

রবীন্দ্রনাথ সামাজিক নাটক অল্পই রচনা করিয়াছেন।... একখানি মাত্র নাটকের মধ্যে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার নাম 'বাঁশরী'। প্রহসনের মধ্যে তাহার 'চিরকুমার সভা' ও 'গোড়ায় গলদ' উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস॥

নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

এ-সভায় ও-সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখে আসছি বালক বয়স থেকেই। কখনো তিনি প্রবন্ধ প'ড়ে শোনান এবং কখনো বা করেন কবিতাপাঠ। বিশেষ করে টাউন হলের একটি মহাসভায় শিবাজী উৎসবে তিনি যে স্বরচিত দীর্ঘ কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, তার কথা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে কি উদাত্ত ও ভাবাপ্লুত কণ্ঠস্বর, অতবড় সভাগৃহকে আচ্ছন্ন ও বিপুল জনতাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে দিল। তখনও নাটকের কোন ভূমিকায় অভিনেতা রবীন্দ্রনাথকে দেখিনি বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বর যদি নটের প্রধান অবলম্বন হয়, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরকে অতুলনীয় বলে স্বীকার করতে বাধে না। নানা প্রবন্ধে ও নানা কবিতায় বিভিন্ন ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে ও বিভিন্ন শব্দার্থব্যঞ্জনার জন্য তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, তা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার উপযোগী।

প্রথম যৌবনে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের কলানৈপুণ্যের কাহিনী শ্রবণ করতুম এবং তা দেখার সুযোগ পাইনি বলে মনে মনে করতুম যারপরনাই আপসোস। আরো শুনতুম সকলের কাছে তাঁর গান গাইবার শক্তির কথা। কিন্তু কপালগুণে হঠাৎ একদিন গান শোনার সাধ পূর্ণ হল। একদিন বৈকালে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাসায় ব'সে আছি, এমন সময়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এসে খবর দিলেন, আজ সাড়ে পাঁচটার পরে য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের মঞ্চে একজন বিখ্যাত মুসলমান সঙ্গীতবিদের (বোধ করি তাঁর নাম ছিল ইমদাদ আলী খাঁ) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা পাওয়া যাবে।

তিনজনেই ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করতে বিলম্ব করলুম না। য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের অবস্থান ছিল তখন গোলদীঘির উত্তর প্রান্তে, তার আধুনিক বাড়ী তখনও নির্মিত হয় নি। গিয়ে দেখলুম কলেজের ছাত্রবৃন্দ সভাগৃহ পরিপূর্ণ করে ফেলেছে। মুসলমান সঙ্গীতবিদ্‌টিকে সঙ্গে ক'রে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চের উপরে দেখা দিলেন এবং নিজের সরস ভাষায় অল্প কথায় ওস্তাদজীর গুণের পরিচয় দিয়ে উপবেশন করলেন—সেদিন তিনি এইটুকু কর্তব্য পালনই করতে এসেছিলেন। তারপর স্নুরু হ'ল ওস্তাদজীর কথন —অর্থাৎ ভারতীয় সঙ্গীতের গুণ-ব্যাখ্যা। মাঝে মাঝে তাঁর মুখ থেকে দু-এক টুকরো গানের নমুনাও পাওয়া গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথ উঠে সভাভঙ্গের নির্দেশ দিতে গেলেন—কিন্তু তা পারলেন না। সভাসুদ্ধ লোক একবাক্যে চীৎকার করতে লাগলো 'আমরা আপনার গান শুনব, আমরা আপনার গান শুনব।' সেই সম্মিলিত কণ্ঠের আবেদন উপেক্ষা করা অসম্ভব, তিনি ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখে (সে স্মিত হাসিটুকু আজও দেখতে পাই) একখানা চেয়ারের উপরে আসীন হয়ে কোন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নিয়েই গেয়ে গেলেন :

তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণী
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।

বৃহতী সভা, বিনা সঙ্গতে গান, কিন্তু আসর এমন জ'মে উঠল যে শ্রোতারা ব'সে রইল চিত্রার্পিতের মত। তারপর কবির কণ্ঠে আরো বহুবার সঙ্গতহীন সঙ্গীত শুনেছি এবং মনে হয়েছে, তিনি যেন কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতকে আলাদা করে রাখতেই ভালো-বাসতেন। ··

এর পরেও বেশ কিছুকাল কেটে গেল, ক্রমে কবির কাছে গিয়ে বসবার ও তাঁর মধুবর্ষী সংলাপ শোনবার সৌভাগ্যও অর্জন করলুম, কিন্তু তাঁর অভিনয় দেখবার সুযোগ আর হয়ে উঠল না। মাঝে মাঝে সে একটা সময় গেছে, রবীন্দ্রনাথ যখন দীর্ঘকাল ধ'রে

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে নিজেকে নিযুক্ত ক'রে রেখেছেন—এমন কি নাট্যজগতে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে লেখনীচালনাও করেছেন, তবু অভিনেতার সাজপোশাক আর পরতে চান নি। মনে মনে দুঃখিত ভাবে ভাবতুম, আমাদের কাছে অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ গত যুগের মানুষ হয়েই রইলেন, পরিণত বয়সে আর তাঁকে আকর্ষণ করবে না পাদপ্রদীপের আলোকমালা।

তারপর এর তার মুখে শুনি, তাও তো নয়, কবি শান্তিনিকেতনে কখনো কখনো অভিনয়ের আয়োজনও করেন এবং মাঝে মাঝে নিজেকেও তার সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে খাপ খাইয়ে নেন, যত দোষ করলে কলকাতার বাসিন্দারা।…

তারপর ১৩২১ সালে জানা গেল, শান্তিনিকেতনে কবিকে নিয়ে 'ফাল্গুনী'রও অভিনয় হয়ে গিয়েছে এবং আমরাও নাটিকাখানি পাঠ করলুম ও মুগ্ধ হলুম বটে, কিন্তু অপূর্ব ও অভাবিত প্রয়োগনৈপুণ্যে ও কবির নিজের উপস্থিতিতে সে অভিনয় যে কতটা উচ্চস্তরে উঠতে পারে, তখনও তা ধারণায় আনবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আর অভিনয় হচ্ছে শান্তিনিকেতনে, কলকাতায় ব'সে কল্পনায় তার ভালো মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার আছে ব'লেও মনে করলুম না। আরো কিছুদিন পরে হঠাৎ কলকাতার ভাগ্য ফিরল। সেটা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ—প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে সমানভাবে। সেই সময়ে বাঁকুড়ায় দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। হৃদয়বান কবি স্থির থাকতে পারলেন না। দুর্ভিক্ষ-কাতরদের সাহায্য করবার জন্য কলকাতায় করলেন টিকিট বেচে 'ফাল্গুনী'র অভিনয়ের ব্যবস্থা। একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের উপকার সাধন এবং আর একদিকে সুরসিকদের মানসক্ষুধায় সুভিক্ষের ব্যবস্থাকরণ—অর্থাৎ একসঙ্গে মানবতার ও নাট্যকলার সেবা।…

আর অভিনয়ও হয়েছিল তেমনি অপূর্ব। রাজার ভূমিকা নিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। তাঁর আগে মঞ্চের উপরে দেখেছিলুম

বহু তথাকথিত 'রাজা-মহারাজা'কে, কিন্তু সাজে, ভাষায়, ভাবে ও সঙ্গীতে তাঁদের কারুকেই সত্যিকার রাজা ব'লে ভ্রম হয় নি, গগনেন্দ্রনাথকে দেখে যা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাভিনেতা, অল্পের মধ্যেই সে প্রমাণও পাওয়া গেল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণও অভিনয়কে সার্থক ক'রে তুলতে অল্প সাহায্য করেন নি। স্বর্গীয় পিয়ারসন সাহেবের বিবিধ গুণের কথা লোকমুখে শ্রবণ করেছি। তাঁকেও দেখলুম একটি নীরব ভূমিকায়। তাঁকে সেই আমার প্রথম ও শেষ দেখা।

সর্বোপরি হচ্ছে নাটের গুরু রবীন্দ্রনাথের অভিনয়। 'বৈরাগ্য-সাধনে' তিনি দেখা দিলেন এক তরুণ ভূমিকায়। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের কোটায়। কিন্তু মঞ্চের মায়ামন্ত্রে রূপান্তর পেয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি নবীন এক যুবকের মত। সর্বাঙ্গে তাঁর যৌবনের চাঞ্চল্য, তারুণ্যের লীলা; ভাষণেও তাজা স্বরমাধুর্য। এরও প্রায় এক যুগ পরে রবীন্দ্রনাথকে তরুণ জয়সিংহের রূপ পরিগ্রহণ করতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম এবং সেদিনও আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না···

তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অন্ধ বাউলের ভূমিকায়। একেবারে বিপরীত ভূমিকা। প্রাচীন বাউল, দেহে যৌবনের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু বার্ধক্য যে শ্রীমন্ত হ'তে পারে, তার দিকে তাকালে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। বাউল অন্ধ বটে, কিন্তু আত্মার মহান্ দৃষ্টিতে তার মৌখিক ভাব দীপ্যমান। হাতে একতারা নিয়ে বাউল মনোহর নাচের ভঙ্গিতে গান ধরলে, 'ধীরে বন্ধু ধীরে'। সে কি হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত, রাগিণীর ঝঙ্কারে তার কি গভীর ভাবের অভিব্যক্তি, যে কোন মূর্ছিত চিত্তও তাঁর ধ্বনির ইন্দ্রজালে মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠতে পারে, সেই অপূর্ব সুর-সুরধুনীর সঙ্গে বাউলের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিগলিত হয়ে শ্রোতাদের শ্রবণমনের উপরে ঝ'রে পড়তে লাগল। কত সের

সেরা গুণীর গান শুনেছি, কিন্তু মানসচোখে আর কারুর কণ্ঠধ্বনির মধ্যে তেমনভাবে অপরূপকে রূপধারণ করতে দেখি নি। এ আমার অতিবাদ নয়, সেদিনকার প্রেক্ষাগারে যে ভাগ্যবানরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই আমার কথায় সায় দিয়ে বলবেন, সঙ্গীতে তেমন রূপায়ণ ধারণাতীত।...

রবীন্দ্রনাথের একটি অভ্যাস ছিল। নূতন কোন নাটক (এবং অন্যান্য রচনাও) লিখলে তিনি তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকদের কাছে তার পাঠ না শুনিয়ে তৃপ্তি পেতেন না। বাছা বাছা শ্রোতারাই এই শ্রেণীর আসরে উপস্থিত থাকতেন, রসভঙ্গ হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এই ভাবে আমরা কবির নিজের মুখে তাঁর বহু কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও নাটকের পাঠ শোনবার যে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি, তার জন্যে নিজেদের ভাগ্যবান ব'লে মনে করি। সে সব আবৃত্তি আমাদের কাছে ঐশ্বর্যের মত হয়ে আছে—ইহজীবনের পরম সঞ্চয়।

একদিন কবির কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল, তিনি আমাদের 'রক্তকরবী' পাঠ ক'রে শোনাবেন। সেটা ঠিক কোন্ বৎসর, স্মরণে আসছে না। 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩০ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায়। নাটকখানির পাঠ শুনেছিলুম বোধ করি তার আগেই। সেদিনকার সান্ধ্য আসর বসেছিল অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতলের বসবার ঘরে। শ্রোতার সংখ্যা বেশী ছিল না। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তিন সহোদর তো ছিলেনই, আর ছিলেন 'ভারতী' গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন সাহিত্যিক, যেমন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গো-পাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আরো কেউ কেউ, সকলের নাম মনে পড়ছে না। ফরাশপাতা কক্ষতলের মাঝখানে এসে আসনে আসীন হ'লেন রবীন্দ্রনাথ—দীর্ঘ ঋজু দেহ, মুখে মৃদু হাস্য, দুই আয়ত চক্ষে প্রতিভার শান্তস্নিগ্ধ

দীপ্তি, পরিধানে পাটভাঙা রেশমী পাঞ্জাবি ও কাপড়। তাঁর বয়স তখন চৌষট্টির কম হবে না, কিন্তু বার্ধক্যও যে কত সুন্দর হ'তে পারে প্রাচীন রবীন্দ্রনাথকে যিনি দেখেন নি তিনি তা বুঝতে পারবেন না। আমরা তিন দিক দিয়ে তাঁকে বেষ্টন ক'রে বসলুম, তিনি পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ আরম্ভ করলেন অনতি-উচ্চ স্বরে।

সমসাময়িক প্রায় অনেক বাঙালী কবিকেই স্বলিখিত রচনার আবৃত্তি করতে শুনেছি, কিন্তু সাফল্য অর্জন করিতে দেখেছি খুব কম লোককেই। অনেকেই ভালো লেখেন, কিন্তু ভালো আবৃত্তি করতে পারেন না। অনেক নাট্যকারও নাটক প'ড়ে শুনিয়েছেন, কিন্তু আবৃত্তি হিসাবে তা উল্লেখযোগ্য হয় নি আদৌ।

রবীন্দ্রনাথ যখন আবৃত্তি করতে বসলেন, তখন নাটকের তাবৎ বিশেষত্ব ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল ফুলের মত। আমার মতে, সাধারণ অভিনয়ের চেয়ে আবৃত্তি হচ্ছে দুরূহ আর্ট। মঞ্চের উপরে অভিনেতাকে সাহায্য করে তাঁর হস্ত-পদ এবং সহ-অভিনেতারা, দৃশ্যপট ও আলোকনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। কিন্তু আবৃত্তিকারকের প্রধান সম্বল মাত্র তাঁর কণ্ঠস্বর। এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনুপম কণ্ঠস্বরের অধিকারী, তাঁর কণ্ঠের মধ্য দিয়ে যেকোন ভাব অভিব্যক্ত হ'তে পারত, যে গুণ নেই বহু শ্রেষ্ঠ অভিনেতার।....বাংলা দেশের নাট্য তথা সাহিত্য জগতে আর কারুকেই আমি রবীন্দ্রনাথের মত আবৃত্তি করতে শুনি নি।

সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ॥

রবীন্দ্র-কাব্যের দৃশ্যপট

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

....কি রসে কি ভাবে রবীন্দ্র-কাব্যে সার্বজনীন সুর প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান, একথা সর্বজন-বিদিত। কিন্তু সে-সুরের প্রকাশ হয়েছে স্বদেশেরই আবহাওয়ায়।....

রবীন্দ্র-কাব্যে যে বাঙলা দেশের দৃশ্যের ছাপ এতো স্পষ্ট ও মূর্ত, তার একটা বড় কারণ হ'ল যে কবি কিশোর ও তরুণ কালের অধিকাংশ দিন কাটিয়েছেন কলকাতায় ও পূর্ববঙ্গে। যে বয়সে মন থাকে আবেগ-প্রধান, গ্রহণেচ্ছু আর বিস্ময়ের দৈব ঐশ্বর্যে ভরপুর, সেই সময়টাই কবি থেকেছেন জোড়াসাঁকোয় বৃহৎ পরিবারের বিচিত্র পরিবেশে, অথবা পদ্মা-বক্ষে ও নদীর তীরে, যেখানে বিস্তীর্ণ বালুর চর আর কাশবন আর দিনের পর দিন আকাশে আর মাটিতে নিত্য নতুন রঙীন মিতালি। আমাদের গদ্য-সাহিত্যে যে দু'খানি শ্রেষ্ঠ দৃশ্য-কাব্য, সেই 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' এই বাঙলা দেশেরই চির-পরিচিত অথচ নতুন করে দেখা খণ্ডদৃশ্যে ভরপুর। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছাদ থেকে দূর আকাশের হাতছানি, চামর-দোলানো নারিকেল গাছের বাঙ্ময় নিমন্ত্রণ, আবছা আলোয় অন্তঃপুরে মা-দিদিমার কাছে গল্প-শোনা, পিছনের পুকুরে স্নানার্থীর ভিড় ও পাতি-হাসের গুগ্‌লি সাধনা, আর পূর্ববঙ্গের নিভৃত নদীতীরে প্রকৃতির বর্ণ বৈচিত্র্যময় মুখর সান্নিধ্য—এ সব দৃশ্য খাঁটি বাঙালী, এবং এর পিছনে যে রসপিপাসু সন্ধানী মন, তা' বাঙালী ছেলেরই স্বপ্নময় কল্পনা-প্রবণ মন। এই শিশু-মনকে যে রবীন্দ্রনাথের ক্রম-বর্ধমান প্রতিভা কখনো উড়িয়ে দিতে পারেনি, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর শেষ-জীবনে লেখা 'ছেলেবেলা'।

রবীন্দ্র-কাব্যের দৃশ্যপট তাই বাঙলাদেশের নিজস্ব আলপনা।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের খোলা নীল আকাশ, কাঁকর-বিছানো ঢেউ-খেলানো পথ-ঘাট, আর দিগন্তবিস্তৃত উদাসী প্রান্তর যেমন তাঁর দৃশ্যপটের প্রধান উপকরণ, তেমনি পূর্ববঙ্গের নদীতীর, বালুচর, আর দু' পাশের গ্রাম্য চিত্র তাঁর কবি-কল্পনার খোরাক জুগিয়েছে। এই দুই বিভিন্ন দৃশ্যের সমন্বয়ে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা। যে ব্যক্তি চিরকালই নীড়-ভক্ত, ঘরের নিভৃত কোণেই যাঁর কাব্য-সাধনা, তাঁর রচনায় না হয় এমনটি সম্ভব। কিন্তু যে কবি ভ্রাম্যমাণ, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাঁর দৈহিক ও মানসিক গতি, যাঁর প্রতিভা স্থিতিশীল নয়, জীবনের কোনও একটি খণ্ডচিত্র যাঁর মূলধন নয়, তাঁর লেখায় এমন ঘরোয়া সুর সত্যিই ভাববার কথা। রবীন্দ্রনাথ যাযাবর না হলেও একজন শ্রেষ্ঠ পর্যটক। ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ প্রতিনিধি হিসাবে কতো দেশেই না তাঁর পদার্পণ ঘটেছে। এই চলিষ্ণু জগৎ আর বিচিত্র সমাজ-মনের ছাপ তাঁর রচনায় কিছু কিছু আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু যেখানেই গেছেন, কবির মন বাঙলা দেশের বিশিষ্ট ছবি ও উপমা, তার স্বতন্ত্র ও নিজস্ব দৃশ্যের ভাষাকে ভোলেনি। কতো দেশ, কতো নদী ও সমুদ্র কবি অতিক্রম করেছেন, কিন্তু মন বাঁধা আছে সেই স্বদেশের নদী আর প্রান্তরে। এবং সে জল ও আকাশ তাঁকে যেমন বারবার ভাবিয়েছে, আবেগ-কম্পিত করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে নিত্য-নূতন রচনায়, তেমনটি আর কোথাও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সমুদ্র ও পাহাড় নিয়ে দু' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন, কিন্তু কোপাই ও খোয়াই তাঁকে যেমন ভাবচঞ্চল করেছে, পরিবর্তনশীল সমুদ্র অথবা স্থাণু পাহাড় তেমন করেনি। জাহাজে ব'সে-দেখা সন্ধ্যাতারা, আর জলের খেলা তাঁর মনকে টেনে নিয়ে গেছে তাঁর পুরানো গণ্ডীতে। বিদেশীয় দৃশ্য হয়তো তাঁকে চকিতদীপ্ত করেছে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তিনি বাঙলাদেশের যুঁই-ফুলের ওপরই কবিতা লিখেছেন।....বিদেশের দেখা দৃশ্য ক্বচিৎ কখনো তাঁর লেখায় ধরা

দিয়েছে···কিন্তু মনে-প্রাণে রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন বাঙালী কিশোর ও বাঙালী কবি, যার প্রথম ও শেষ প্রেম বাঙলা দেশের মাঠ ঘাট আকাশ আর নদী। তাই বহুদিন পরেও অশীতিপর কবি 'ছেলেবেলা'য় সেই হৃতস্বপ্ন পুরোনো দিনের জের টেনে এনেছেন তাঁর অপরূপ ভাষায়। কিছুতেই ভুলতে পারলেন না সযত্নে পরিবেশন-করা সেই নিতান্ত বাঙালী খাদ্য—পান্তাভাত, চিংড়িমাছ, আর কাঁচালঙ্কার আমেজ।

রবীন্দ্র-কথা ॥

'কোন্ ঠাকুর অবন ঠাকুর
ছবি লেখেন'

ঠিক এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায় :

কোন্ ঠাকুর রবি ঠাকুর
ছড়া লেখেন।

রবি ঠাকুরের শুধু এই পরিচয়টাই যদি তোমরা জেনে রাখো ঠকতে হবে না। আমার তো মনে হয় তিনি যে ছোটদের জন্যে ছড়া লিখলেন আর সেই ছড়ার সঙ্গে অবন ঠাকুরের মত ছবিও লিখলেন এইখানেই আমরা পেলাম সহজ মানুষের কবিটিকে—যেখানে তিনি সহজেই মিশে গেলেন শিশুদের সঙ্গে।

সহজ কথা, যা-তা কথা সহজে আসে না, অনেক সাধনায় সহজ-পাঠ লেখা যায়। এই যা-তা কথাটার জগৎটা অদ্ভুত! সারা শহরটাই সেখানে নড়তে নড়তে চলে :

ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে দুদ্দাড় জানালা দরোজা।
... .
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে
হ্যারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে
মনুমেণ্টের দোল যেন খ্যাপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।
আমাদের ইস্‌কুল ছোটে হন্ হন্
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।—

এই সব-ছুট দেশের বই-ছুট ছেলেরাই ছড়িয়ে দেবে মানে-আছে-মানে-নেই আজগুবি ছড়া :

গলদা চিংড়ি তিংড়ি সিংড়ি লম্বা দাঁড়ার করতাল
পাকড়াশিদের বাঁকড়া ডোবায় মাকড়্‌সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর লেজখানা যায় ছিঁড়ে
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার কুটছে নূতন চিঁড়ে!
কলেজ পাড়ায় শেয়াল তাড়ায় অন্ধ কলুর গিন্নি
ফট্‌কে ছোঁড়া চটকিয়ে খায় সত্যপিরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে ঢোলে কুল্লুক ভট্ট,
ইলিসের ডিম ভাজে বঙ্কিম কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।

ছড়া যেন ভোজবাজী। পথের ধারে, দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা আসর সাজিয়ে বসেছে। যা-তা মন্ত্র আউড়ে একটু মুচকি হেসে ঘাসের ওপর চাদর বিছিয়ে দিল। চাদরটা উঠিয়ে নিতেই দেখা গেল—দুটো বেগুন, একটা চড়ুই ছানা, জামের আঁটি, ধুইয়ে ওঠা ধুনুচি, মুড়ো ঝাঁটা, খড়কে কাঠি, নলচে-ভাঙা হুঁকো—এমনি আরও কত কি!

ছড়াও এমনি মন্ত্র আউড়ে যা-ছিল-না, যা হয়-না, এমন একটা জগৎ সামনে ধরে দেওয়া—

ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে কোন কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।

এই ভোজবাজির রাজ্যে পড়াশোনা না ক'রেও পাঠকে এগিয়ে নেওয়া যায়। শুধু কায়দাটা জানা চাই :

পাঠশালে হাই তোলে
মতিলাল নন্দী
বলে, 'পাঠ এগোয় না
যত কেন মন দি'।
শেষকালে একদিন গেল চলি টঙ্গায়
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাসালো মা গঙ্গায়

সমাস এগিয়ে গেল
ভেসে গেল সন্ধি
পাঠ এগোবার তরে
এই তার ফন্দি

গোপেন্দ্র মুস্তফি ওরফে গুপীর হঠাৎ খেয়াল হল মাথায় পায়ে ভেদ রাখাটা নিতান্তই বোকামি, তাই

রাত্রে যখন ফিরল ঘরে
সবাই দেখে তারিফ করে,
পাগড়িতে তার জুতোজোড়া
পায়ে রঙীন টুপি।

ওদিকে আবার অন্য এক বাবুর পায়ের মোজা হাতে উঠে এল :

কন্‌কনে শীত ভাই
চাই তার দস্তানা
বাজার ঘুরিয়ে দেখে
জিনিসটা সস্তা না।
কম দামে কিনে মোজা
বাড়ি ফিরে গেল সোজা
কিছুতে ঢোকে না হাতে,
তাই শেষে পস্তানা।

তিন-চারে বারো হয় এ তো সবাই জানে, সবাই লেখে, কিন্তু ভোলানাথ? ভোলানাথ লিখেছিল

তিন-চারে নব্বই
গণিতের মার্কায়
কাটা গেল সর্বই।
তিন-চারে বারো হয়
মাষ্টার তারে কয়।
'লিখেছিনু ঢের বেশি'
—এই তার গর্বই।

ছড়ার আজব দুনিয়ায় নাম-পরিবেশনটাও জমে ওঠে বেশ:

খ্যাঁক খ্যাঁক করে মিছে
সবতাতে দাঁত খিঁচে
তারে নাম দিব খ্যাঁকশিয়াল।

যার নাম দেওয়া হল তার খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে ওঠবার কথা, কিন্তু মজা এই, ছড়া শুনে সে রাগতে গিয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে উঠবে। এ-ছড়াটা লিখেছিল ও পাড়ার নিন্দুকের দলের একজন, ছড়াটা লেখা হয়েছিল চণ্ডীবাবুকে লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু চণ্ডীবাবু ছড়া-লিখিয়েকে গোমুখ্যু বলে গাল দিলেও কাগজে লেখা ছড়াটা টুকরো টুকরো করে না ছিঁড়ে সযত্নে পকেটে পুরে রাখতেন!

এতো গেল টিট্‌কিরি করে নাম দেবার ব্যাপার। কিন্তু ছড়ার রাজ্যে গড়া-পেটা পৈতৃক নামও যায় বদ্‌লে:

যার যত নাম আছে সব গড়াপেটা,
যে নাম সহজে আসে দেওয়া যাক সেটা—
এই বলে কাউকে সে ডাকে বুজকুল,
আদরুম ডাকত সে যে ছিল অতুল।
মোতিরাম দাস নিল নাম মুচকুস,
কালিরাম মিত্তির হল পুচফুস
পাঁশ গাড়ি নাম নিল পাঁচকড়ি ঘোষ
আজ হতে বাজরাই হল আশুতোষ।

এমন একটা আজগুবি লাগ-ভেল্কি ছড়ার রাজ্যে যিনি আমাদের নিয়ে যেতে পারেন, তিনি নিশ্চয় যাদুকর:

দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা
কিসের নেশায়-পাওয়া চোখটা,
চারদিকে তার জুটল অনেক ছেলে।

রোশনাই। চৈত্র, ১৩৬৭॥

ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি

শুভেন্দু ঘোষ

বাংলায় তখন স্বদেশী যুগ চলছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়েছিলেন ঃ

"......স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।........"

তার তের বছর পরে, জাতির আর একটা বিক্ষোভের দিনে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই দেখা দিলেন, 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি' হয়ে।

শ্রীঅরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথকে কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে 'দেশপ্রেমী' বলা চলে না। দেশের বিপুল জনসাধারণকে যারা দুর্ভাগ্যের অতলে ডোবাতে চায়, একালে তারাও নিজেদের 'দেশপ্রেমী' বলে— 'জাতীয়তাবাদী' বলে! রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দ 'দেশ' বা 'জাতি' বলতে বস্তুতঃ ধনপতিদের বুঝতেন না। সমস্ত মানুষের মধ্যে, এমন কি ভারতীয়দের মধ্যেও বাঙালীরাই ছিল এঁদের সবচেয়ে আপনার লোক, তবু কোনরকম প্রাদেশিক বা জাতীয় সঙ্কীর্ণতা তাঁদের কোনদিন স্পর্শ করে নাই। তাঁরা বাঙালীকে তথা ভারতবাসীকে ভালবাসতেন মানুষ বলেই। যে মানুষ হিসাবেই মানুষকে ভালবাসে না, সে তার নিজের দেশকেও বিশুদ্ধভাবে ভালবাসতে পারে না। আন্তর্জাতিকতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন লেনিন, তবু তাঁর স্বদেশ রুশিয়ার লোকের উপর তাঁর ভালবাসার যেন অন্ত ছিল না। ফ্রান্সে, স্পেনে জনসাধারণের কল্যাণ-সম্ভাবনা দেখা দিলে রামমোহন আনন্দে অধীর হতেন, তবু তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ সম্পর্কেই ছিল তাঁর নিরন্তর চিন্তা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশকে ভালবেসে আসছিলেন আজন্ম; তাঁর 'স্বধর্ম'—তাঁর প্রতিভা অনুযায়ী দেশবাসীর কল্যাণসাধনের প্রয়াস

করে আসছিলেন আজন্ম। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর, তিনি সংশয়াতীতভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি'-রূপেই; সেদিন তাঁরই কণ্ঠে উচ্চারিত হল ভারত-আত্মার সেই উদাত্ত বাণী:

> "নাহি তাহে দুঃখতাপ, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
> নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস।"

প্রথম মহাসমর তখন শেষ হয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরেজ রাজ-শক্তি নির্দয়ভাবে ভারতের রক্তশোষণ করেছিল; তার ফলে, সারা দেশে একটা প্রচণ্ড অসন্তোষ, ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহভাব ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ সরকার চাইল সেটা জোর করে দমন করতে। তার জন্যে, রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ হল। লোক-শত্রু রাজশক্তিমাত্রেই এইভাবে তাদের জবর্দস্তি প্রকাশ করে থাকে, আর সে-আইনকে ব'লে 'ন্যায়ের বিধান।' বিনা বিচারে যে-কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক রাখার অধিকার দিল এই আইন। ভারতের লোক এই বে-আইনী আইনকে শিরোধার্য করল না। সর্বত্র প্রবল আন্দোলন শুরু হল। ইংরেজ সরকারের লোকদলন-যন্ত্রও সক্রিয় হয়ে উঠল।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষটা ইংরেজের চক্ষে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল পাঞ্জাবে। সৈনিকদের দেশ পাঞ্জাবকে যে-ভাবেই হোক্ শায়েস্তা রাখা চাই, তাই মদমত্ত রাজশক্তি সেখানে নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর বেপরোয়া গুলি চালাতে লাগল।

রাজশক্তির এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৯২০ সালের এপ্রিলে 'জাতীয় সপ্তাহ' পালিত হল। এই উপলক্ষে ১৩ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়ে যে সভা ডাকা হয় সেই সভায় এণ্ডুজ সাহেব রবীন্দ্রনাথের যে বাণী পাঠ করেন সেটাকে সব দিক থেকেই ভারতের মর্মবাণী বলা চলে। তাতে বলা হয়েছিল:

"গত মহাযুদ্ধ মানুষকে তার মধ্যেকার মহত্তর প্রকৃতির উপর নিরন্তর অত্যাচার করার, সত্য ও মানবীয় মর্যাদাকে পদদলিত করার যে অবকাশ দিয়েছিল, তারই ফলে, যারা অতর্কিত আক্রমণে নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর আক্রমণ ক'রে এবং বিচারের অভব্য ভ্যাঙচানির অন্তরালে নিজেদের মতই মানুষদের অকথ্য অবমাননা ক'রে এক মুহূর্তের জন্যেও এই কথাটা বোধ করতে পারে না যে, এ ভাবে তারা নিজেদের মনুষ্যত্বেরই জঘন্যতম অপমান করছে, তাদের—সেই শক্তিমানদের এই কাপুরুষতা সম্ভব হল।....

যারা অসহায়দের উপর অবমাননার বোঝা চাপায় শুধু তাদেরই যে নৈতিক অবনতি ঘটে, তা নয়; যাদের অবমানিত করা হয়, তাদেরও ঘটে!....আমাদের ভয় পেলে চলবে না, নৈতিক পরাজয়কে আমরা স্বীকার করে নেব না; তবে, আমাদের চিত্তে প্রতিহিংসার কুৎসিত স্বপ্নও পোষণ করব না।"

১৩ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়ের সভায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের এই বাণী রচিত হয়েছিল ঐ তারিখের কয়েক দিন পূর্বেই। ১৩ই তারিখের সন্ধ্যায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল; তার আগেই। এই বাণীতে তিনি নির্দেশ করেছিলেনঃ ইংরেজ রাজ-শক্তির তৎকালীন বর্বরতার মূলে ছিল—প্রথম মহাযুদ্ধ। রাজশক্তির সে বর্বরোচিত হিংসাকে রোধ করতে গিয়ে ভারতবাসীও যেন প্রতিহিংসুক না হয়ে ওঠে; তাতে তারও নৈতিক পরাজয় ঘটবে।

ঐ দিনই পাঞ্জাবের অমৃতসরে 'শক্তিমান' ইংরেজ সরকার তার 'কাপুরুষতার' চরম পরিচয় দিয়েছিল। সেটা ছিল বৈশাখী মেলার দিন। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক এসে জমেছিল অমৃতসরের তীর্থক্ষেত্রে। ঐ সময়, পাঞ্জাব-সরকার পাঞ্জাবের দুই-জন নেতাকে গ্রেফতার করেছিল; তাঁদের গ্রেফতার সম্পর্কে সভা হবে শুনে লোক দলে দলে গিয়ে সমবেত হয়েছিল জালিয়ানওয়ালা-বাগে।

কাপুরুষরা অল্পেতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠে। বৈশাখী মেলার লোকগুলো সভা করতে যাচ্ছে শুনে পাঞ্জাবের শাসককুল ভয় পেয়ে গেল : কী জানি, এখান হতেই একটা মহাবিদ্রোহের সূত্রপাত হবে হয়তো! সে বিদ্রোহকে মূলেই বিনষ্ট করার সঙ্কল্প করে জেনারেল ওডায়ার চললেন বাগের দিকে। তাঁর সৈন্যরা বাগের দুইটি ফটকই আটকে দিল। সমবেত জনতার দিকে মুখ করে কলের কামান পাতা হল। তারপর? তারপর একটা হুঁসিয়ারি না দিয়ে ওডায়ার সাহেব জনতার উপর গুলি চালালেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার নিরস্ত্র, নিরীহ, অসতর্ক মানুষের দেহ ধরাশায়ী হল। গুলি যতক্ষণ না ফুরলো, ততক্ষণ চলল হলেও-হতে-পারে-বিদ্রোহী-দের উপর রাজশক্তির ন্যায়বিধান।

এত বড় বীরত্ব প্রকাশ করেই ইংরেজ সরকার ক্ষান্ত হল না; ১৫ই এপ্রিল তারিখে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হল। সেটাও আইন, সুতরাং লোকসাধারণের নমস্য, শিরোধার্য। এই আইনের বলে লোকদের ধরে ধরে প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত করা হল, বুকে হাঁটানো হল। আরও কত রকমের অত্যাচারই না করা হল।

ভারত সরকার পাঞ্জাবের ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল; দেশীয় সংবাদপত্রগুলোতে তার বিবরণ যাতে না বেরয়, তার জন্যে ব্যবস্থা করেছিল। তা সত্ত্বেও সবই প্রকাশ হয়ে গেল। সারা ভারতে একটা থমথমে ভাব দেখা দিল।

রবীন্দ্রনাথ তখন ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করার আশায় শিলঙ পাহাড়ে ছিলেন। পাঞ্জাবের সংবাদ শুনে তিনি অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এর কি কোনও প্রতিকার নাই? দেশবাসীর এই অপমান কি নীরবে সহ্য করতে হবে? অধীর যন্ত্রণায় তিনি শিলঙ থেকে কলকাতায় এলেন। কলকাতার নেতাদের কাছে প্রস্তাব করলেন : অবিলম্বে একটা প্রতিবাদ-সভা ডাকা হোক; আর-কেউ তার সভাপতি হতে না চান তো তিনিই তার সভাপতি হবেন।

হায় রে দুরাশা! পাঞ্জাবী নেতাদের দুরবস্থা স্মরণ করে বাঙলার বড় নেতাদের তখন বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল, তাঁরা বিশেষ সাড়া দিলেন না। কবি সংকল্প করলেন—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ নাই আসে
তবে একলা চলো রে।"

তিনি এককভাবেই তাঁর দেশবাসীর পক্ষ থেকে অমৃতসর হত্যাকাণ্ডের একটা প্রতিবাদ জানাবেন। তার ফলেই, তৎকালীন ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌-ফোর্ডের উদ্দেশে রচিত হল তাঁর ঐতিহাসিক উপাধিবর্জন-পত্র। সে পত্রের প্রতি শব্দেই ধ্বনিত হয়েছিল আমাদের বেদনাহত ভারত-জননীর হৃৎস্পন্দন।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরও রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত না করা ভারতস্থ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছিল। পুরস্কার পাওয়ার পূর্বে ও পরে, কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথ সরকারের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। তবু ইংরেজ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দিতে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের রবীন্দ্রনাথকে বানানো হয়েছিল 'সার রবীন্দ্রনাথ।' ইংরেজ-প্রদত্ত এই সম্মান কবিকে তাঁর দেশবাসীদের থেকে ছিনিয়ে দূরে নিতে পারে নাই। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত অধ্যাপক সুধীন্দ্র বসুর মার্কিন মুলুক হতে প্রেরিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল; "ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' উপাধি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া 'ডক্টর' উপাধির তিনি থোড়াই তোয়াক্কা রাখেন বলে মনে হয়।" পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের পর ইংরেজ-প্রদত্ত সম্মান স্বভাবতঃই তাঁর অসহ্য বোধ হল; তাঁর দেশবাসীদের যারা মানুষের মধ্যে গণ্য করে না তাদের দেওয়া সম্মানের বোঝা বয়ে বেড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডকে তিনি লিখলেন:

"কয়েকটা স্থানীয় বিক্ষোভ দমন করার জন্যে সরকার পাঞ্জাবে

যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলির ভয়াবহতা, ভারতস্থ ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে আমাদের অবস্থা যে কত অসহায় তা রূঢ় চমক দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে।....যে কোনো সভ্য দেশের ইতিহাসে এর তুলনা মেলে না।...এটার সপক্ষে রাজনৈতিক প্রয়োজনের কোনো দোহাই-ই পাড়া চলে না, এর কোনও নৈতিক সাফাই নাই।.... পাঞ্জাবে আমার ভাইদের উপর যে অবমাননা ও উৎপীড়ন করা হয়েছে তার বিবরণ মুখ বাঁধা নীরবতা ভেদ করে চুঁইয়ে বেরিয়েছে, ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। এর জন্য আমার দেশ-বাসীর হৃদয়ে সার্বজনিক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, আমাদের শাসক-বর্গ তা গ্রাহ্য করেন নাই।....এ ক্ষেত্রে, আমি আমার দেশবাসীর হয়ে সামান্য যা করতে পারি তা হচ্ছে—আমার আতঙ্ক-বিমূঢ় লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অন্তরের প্রতিবাদকে ভাষা দেওয়া, তার ফলে আমার যা হবার তা হোক্।...এখনকার অবমাননার এই অসঙ্গত পটভূমিতে সম্মান-সূচক অভিজ্ঞানগুলো আমাদের লজ্জাকে বড় বেশী স্পষ্ট করে তোলে। তাদের তথাকথিত তুচ্ছতার জন্যে যাদের অ-মানুষোচিত অবমাননা সহ্য করতে হয়, আমি আমার সেই দেশের লোকের পাশেই দাঁড়াতে চাই। এই সব কারণে আমি বেদনার সহিত আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার এই 'নাইট' উপাধি হতে আমাকে মুক্ত করা হোক্।"

একটি স্মরণীয় দিন

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

রাউলট আইন ও গান্ধীজীর গ্রেফ্‌তারের প্রতিবাদে জালিয়ান-ওয়ালা বাগিচায় অনুষ্ঠিত জনসভায় একমাত্র প্রবেশ-দ্বারে মেশিন-গান বসিয়ে সসৈন্য ডায়ার নর-নারী-শিশু-নির্বিশেষে সকলের উপর দশমিনিট ধরে ষোলশ' গুলি চালায়। বিক্ষিপ্ত জনতা যে দিকে ভিড় করে সেই দিকেই তাক করে গুলি ছোঁড়ার আদেশ দেওয়া হয়। অমৃতসরে জঙ্গী আদালতের বিচারে একান্ন জনের প্রাণদণ্ড, ছেচল্লিশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং একশ' ষোল জনের দশ থেকে তিন বছর কারাদণ্ড হয়। মহিলাদের উপরও চলে বীভৎস অত্যাচার।

এই সব খবর সংবাদপত্রের উপর কড়া নিষেধ সত্ত্বেও যখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেল, দেশের আপামর সাধারণের মনে তার প্রতিক্রিয়া হল অসাধারণ। আর মৃত্যুর ভিতর দিয়েই আসে জাগরণ। কলকাতায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাতে পুলিশের গুলিতে ছ' জন নিহত ও বারো জন আহত হয়। ভারতের অন্যান্য শহর ছাড়া বাংলার মফঃস্বল অঞ্চলেও বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। ক-দিন এমন অবস্থা হয় যে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও খুঁটিনাটি-নিয়ে-মেতে-থাকা মনগুলিও আর কিছু ভাবতে পারে না। বিশেষ করে যেদিন রবীন্দ্রনাথ সারা দেশের কোটি কোটি মূক জনসাধারণের প্রতিবাদকে রূপায়িত করলেন ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' খেতাব বর্জন করে।

তেসরা জুন (১৯১৯) তারিখের 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত ভাইস্‌রয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে লিখিত ত্রিশে মে তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—হতভাগ্য জনগণকে যে নৃশংস শাস্তি দেওয়া হয়েছে, প্রাচীন ও আধুনিক কোন সভ্য শাসন-ব্যবস্থায়

তার কোন জোড়া নেই....সরকারী সম্মানের প্রতীক আজ জাতীয় অসম্মানের মধ্যে আমাদের লজ্জাকেই প্রকট করে তুলেছে। তথাকথিত নগণ্যতার অপরাধে আমার যে দেশবাসীকে অমানুষিক অপমান সহ্য করতে হচ্ছে, সমস্ত বিশেষ সম্মান-বর্জিত হয়ে তাদেরই পাশে এসে আমি দাঁড়াতে চাই।

'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় বিনা মন্তব্যে চিঠিখানা ছাপা হলেও ইংরেজের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান'-এর স্তম্ভে লেখা হল, 'যখন বুঝতে পারবেন যে, এর ফলে এক কাণাকড়িও কারুর এসে যাবে না, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে ছাড়া আর কেউ তার জন্য এতটুকু বেদনা বা বিস্ময় বোধ করবেন না।....এই বাঙালী কবি 'নাইট' থাকতে চান, কি নেহাৎ বাবু বলে পরিচিত হতে চান, ব্রিটিশ-শাসন ও ন্যায়-বিচারের সুনাম, সম্মান ও নিরাপত্তার পক্ষে তার এতটুকু মূল্য নেই।'

ইংরেজ সরকার বা তাদের মুখপত্র যাই মনে করুন না কেন, দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ গভীর প্রভাব সৃষ্টি করল। 'ইংরেজ-ঘেঁষা', 'বিশ্বপ্রেমিক' বলে রবীন্দ্রনাথকে যারা এতদিন শ্লেষ করেছে তারাও অভিভূত হয়ে পড়ল তাঁর দেশ-প্রেমের এই অভিব্যক্তিতে, কবির নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কপালে জোড় হাত ঠেকাতে দেখলাম সকলকে।

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও সকলে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা যে কতখানি গভীর হয়েছিল তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলাম রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে।

মাতৃশ্রাদ্ধের শেষে দেশ থেকে যখন রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতায় ফিরলেন তখন তাঁর অসুস্থতা রীতিমতো বেড়ে গিয়েছে। নিজে ত জীবনের আশা ত্যাগ করেছেনই, আত্মীয়-পরিজন, এমন কি, চিকিৎসক পর্যন্ত ভরসা পাচ্ছেন না।

সকালের দিকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো হয় তাঁকে। মধ্যে মধ্যে সকালের দিকে আমি উপস্থিত থাকি। দেশের

নবজাগরণের সংবাদে মুখচোখ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রামেন্দ্রসুন্দরের। বলেন, 'আর একবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে ভাই। এই মরা জাতের মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার এলে তার যা শক্তি তার ভাঙনটুকুই শুধু দেখব, তার সৃষ্টি দেখব না!' আবার উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় ক্লান্ত বোধ করে বলেন, 'ভাঙারও ত শেষ দেখতে পেলাম না! তবুও স্রোত চলতে শুরু করেছে, এ স্রোত যে প্রবল বন্যার আকার ধারণ করবে, তাকে রোধ করবে কে?' সরকারী অত্যাচারের কাহিনী শুনে ঘৃণায় শিউরে উঠতেন, 'এই ইংরেজের মানবতা-বোধ, এই তাদের সংস্কৃতি। ছেলেবেলা থেকে যে মানবতা-বোধের প্রত্যক্ষ কাহিনী মুখস্থ করিয়ে আমাদের মনে রাজভক্তির শিকড় গাড়া হয়েছে, আমরা চাক্ষুষ করলাম সেই মানবতা-বোধের এই বিষময় ফল।'

আবার কখনও হয় ত বলে ওঠেন, 'হয় ত মরে যাওয়াই ভাল। এই সব দেখে শুনে আর কি পারব ওদের জাতের উপর শ্রদ্ধা রেখে ওদের মানবতার শেখানো বুলি তোতাপাখীর মত আওড়াতে?'

কবির চিঠিখানা সেদিন 'স্টেট্স্‌ম্যান' থেকে পড়ে শোনানো হল, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় উঠে বসলেন তিনি। সকলে তাড়াতাড়ি তাঁকে শুইয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'বল কি, উঠব না? ছুটে গিয়ে এই মুহূর্তে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে আসতে হবে! তা যদি না করি, কত বড় অকর্তব্য হবে বুঝতে পারছ!'

ভাই দুর্গাদাস জবাব দিলেন, 'তা বলে যে আপনার শরীর অসুস্থ দাদা।'

'অসুস্থ বলেই ত এত বড় কর্তব্যে অবহেলা করে পড়ে থাকতে হচ্ছে। তুমি ভাবতে পার দুর্গাদাস, অন্তরে কতখানি গভীর ক্ষত হলে ইংরেজ সরকারকে এমনভাবে ধিক্‌কৃত করেছেন কবি! আর দেশের জনসাধারণের প্রতি কতখানি ভালবাসা থাকলে তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে এমন প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে পারেন!'

'তিনি সকলেরই বরেণ্য এবং নমস্য, এর মধ্যে কি বিন্দুমাত্র সংশয় আছে', দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় জবাব করলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে একবার রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, 'কবি এখন কোথায় আছেন, জান পবিত্র ?'

'তিনি কলকাতায় এসেছেন,' আমি জবাব দিলাম।

'তবু তাঁর পায়ের ধুলো নেওয়া আমার সম্ভব হবে না ?' রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠে আকূতি ও হতাশা। একবার দুর্গাদাসের মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, 'মরবার সময় এই দুঃখটাই থেকে যাবে।'

দুর্গাদাস আশ্বাস দিলেন, 'কবিকে একবার এখানে ডেকে আনবার চেষ্টা করতে পারি।'

'পারবে ?' রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হয়ে উঠল, 'পারবে, পারবে তুমি ?'

'আপনার কথা বললে তিনি নিশ্চয় আসবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে,' জবাব দিলেন দুর্গাদাস।

পরদিন দুর্গাদাসবাবু কবির সঙ্গে দেখা করে বক্তব্য নিবেদন করতেই কবি সাগ্রহে রাজী হলেন রামেন্দ্রসুন্দরের রোগশয্যায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

উনিশে জ্যৈষ্ঠ। কবি আসবেন, সকাল থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর আনন্দে পরিপ্লুত। প্রতি মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠছেন, ওই বুঝি এলেন কবি। কবি যখন দরজায় এসে পৌঁছেছেন তখনই রামেন্দ্রসুন্দর ব্যগ্র ; একমুহূর্তও যেন কালবিলম্ব সইছে না। দুর্গাদাস সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কবিকে এগিয়ে আনতে।

এই আমি চাক্ষুষ করলাম বাংলার কবিকে—যাঁর দীপ্তি ধারণ করার ক্ষমতা অসীম গগন ছাড়া কারুর আর নেই। তিনি এলেন পটলডাঙায় রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহে। সাদা থান ও সুতির সাদা পাঞ্জাবি পরিধানে, গায়ে সাদা চাদর জড়ানো, তার উপর দিয়ে

ঝুলছে চশমার কালোফিতে, পায় কটকি চটি—সূর্যেরই মত রক্তাভ গৌরবর্ণ ঝলমল করছে তাঁর অঙ্গে। এতদিন শুধু ছবিতেই যা দেখেছি সেই মানবমূর্তি সশরীরে দেখলাম, এতদিন যে মূর্তি ধ্যান করেছি, তাঁর সামনা সামনি দাঁড়াবার সুযোগ পেলাম।

কবি আসছেন শুনে প্রতিবেশী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও হাইকোর্টের উকিল নরেন্দ্রকুমার বসু উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকেই হাত তুলে শাস্ত্রী মহাশয়কে নমস্কার জানালেন। শাস্ত্রী মহাশয় ও বসু মহাশয় দুজনেই করলেন প্রত্যভিবাদন। উপস্থিত আর সকলে কবির পদধূলি গ্রহণ করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর উঠে বসবার উপক্রম করলেন, 'আমাকেও ত কবির পায়ের ধূলো নিতে হবে। তার জন্যই ত টেনে এনেছি তাঁকে এখানে।'

দুর্গাদাসবাবু ও আর সকলে তাঁকে নিরস্ত করলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, 'তবে কবির পায়ের ধূলো আমার মাথায় দিয়ে দাও।'

কবি আসন গ্রহণ করলেন। বললেন, 'বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছেন দেখছি। ব্যাপার কি ?'

দুর্গাদাস রোগের বিষয় বুঝিয়ে বললেন কবিকে।

'রোগ ত তা হলে কঠিন,' বললেন কবি, 'ভুগছেনও ত অনেক দিন। আর উপশমও কিছু হচ্ছে না—এ ত বড় ভাবনার কথা।'

'ভাবনার আর কিছু নেই,' রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর স্বভাবহাসি হেসে মন্তব্য করলেন, 'এখন যাবার পালাটুকু শুধু বাকী।'

'কিন্তু দেশের লোকের যে আপনাদের দিয়ে অনেক প্রয়োজন আছে' কবি বললেন।

'রামেন্দ্রসুন্দরের প্রয়োজন কোন দিন ফুরোবে না,' বললেন শাস্ত্রী মহাশয়! 'আপনারই ভাষা পুনরাবৃত্তি করে বলি রবীন্দ্রবাবু, 'বুদ্ধির, জ্ঞানের, চরিত্রের ও উদারহৃদয়তার এমন সমাবেশ দেখা যায় না।'

'তাই ত সকলে সমান ভাবে ভালবাসেন তাঁকে,' নরেন্দ্রকুমার মন্তব্য করলেন।

'রামেন্দ্রসুন্দর শুধু অজাতশত্রু নন,' কবি বললেন, 'একেবারে সকলের প্রিয়পাত্র, আর হৃদয় যে তাঁর কত বড় উদার তার পরিচয় আমিই ত পেয়েছি। প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে আমার প্রশস্তি-সভার আয়োজন করেছিলেন, সে কথা আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না।'

'আমরা চলে গেলে দেশের কোন ক্ষতি নেই' রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, 'আপনি একাই পারবেন জাতিকে মুক্ত করতে, রক্ষা করতে, তার সমগ্র জীবন সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিতে।'

'কিন্তু আপনার দেশপ্রীতির জোড়া পাওয়া যাবে কোথায়?' বললেন কবি। 'আপনার চিত্তের মধ্যে ভারতের যে মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, ভারতের সনাতন বাণীর উপকরণেই তা তৈরী। তার সঙ্গে আছে আপনার নিজের ধ্যান, নিজের মনন। ব্রাহ্মণের জ্ঞান-গাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতার অপূর্ব সমন্বয় দেখেছি এর মধ্যে,' বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

'রবীন্দ্রবাবুর এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য,' বললেন শাস্ত্রী মহাশয়। 'সাহিত্য-পরিষদের তিনি যে একাধারে দেহ ও আত্মা এ খবর রবীন্দ্রবাবুরও জানা আছে।'

নিজের সম্বন্ধে আলোচনায় সঙ্কোচ বোধ করে রামেন্দ্রসুন্দর একেবারে চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে লজ্জা ও বিনয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। দুটি হাত জোড় করে শয়ান অবস্থায় বুকের উপর রেখেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখের দিকে তাকিয়ে কবি অনুভব করলেন, আত্ম-প্রশংসা শুনতে তাঁর কতখানি পীড়া বোধ হচ্ছে। বললেন, 'এমন একজন অনুরাগী বন্ধু, প্রকৃত সুহৃদ দুরারোগ্য রোগে

শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে আমাদের অন্তর যে কতখানি ব্যথিত হয় তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়, বলার প্রয়োজনও নেই।'

কি যেন বলি-বলি করে রামেন্দ্রসুন্দর দুর্গাদাসের মুখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করলেন। বালিশের তলায় হাত দিয়ে দুর্গাদাস বার করে দিলেন 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা থেকে কেটে-রাখা কবির চিঠিখানা। সেখানা হাতে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর কবির সামনে ধরলেন। বললেন, 'অন্যায়ের এতবড় প্রতিবাদ আর কখনো কোন দিন কেউ করেছেন বলে আমি জানি না।'

'কিন্তু অন্যায়ের তুলনায় যথোচিত প্রতিবাদ করতে পারলাম কোথায়!' বললেন রবীন্দ্রনাথ, 'যে রাজশক্তির দম্ভ সমস্ত মানবতা-বোধকে ধিক্কৃত করেছে, তার উপর বজ্র ও অগ্নি বর্ষণ করার মত কোথায় সেই রুদ্র ও ইন্দ্র! আমি শুধু পারি তাঁদের দেওয়া সম্মান ছুঁড়ে ফেলে দিতে। আমার দেশবাসীকে চূড়ান্ত অপমান ও অত্যাচার করে আমার একটু পিঠ থাবড়াবে—এ আমি কেমন করে সহ্য করব? অন্তত তারা জানুক, আমি তাদের অনুগ্রহ-ভিখারী নই। এদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষেরই একজন।'

'সেই একজনেরই পায়ের ধূলো আমার মাথায় পড়ুক, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমি আপনাকে টেনে এনেছি', রামেন্দ্রসুন্দর বললেন।

'তা হয় না,' বললেন কবি, 'আপনার মত প্রাচীন বিজ্ঞ মনীষী আমার পদধূলি নেবেন, বয়সে সামান্য বড় হওয়ার জোরে সে অপমান আমি করতে পারি না আপনাকে।'

'শুধু বয়সে বড়', হেসে বললেন রামেন্দ্রসুন্দর, 'আপনি ত আকাশের সূর্য, আর আমি মাটির মানুষ। মধ্যে লক্ষ লক্ষ যোজনের বিরাট ব্যবধান। তাই কি পায়ের ধূলো পেতে পারব না?'

'আপনিও ব্রাহ্মণ', মন্তব্য করলেন শাস্ত্রী মহাশয়, 'বয়সে বড়,

মনীষার প্রশ্ন না-ই তুললাম। রামেন্দ্রসুন্দরকে পদধূলি দেওয়ায় আপনার কোন প্রত্যবায় নেই—না শাস্ত্রীয়, না লৌকিক।'

দুর্গাদাসবাবু বললেন, 'চিঠিখানি যেদিন কাগজে প্রথম বেরোয়, সেই দিন থেকেই আপনার পদধূলি নেওয়ার জন্য সে কি আকুল আগ্রহ! বলছেন, আমার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

ক্ষণকাল মাথা নীচু করে কি ভাবলেন কবি, তারপর বললেন, 'এই দুঃখ ওকে দেওয়া আমার পক্ষে বন্ধুকৃত্য হবে না। অতএব যা বলেন—'

রামেন্দ্রসুন্দর একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন। জামাতা শীতলবাবু একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি এগিয়ে এলেন একখানা টুল নিয়ে। খাটের পাশে টুলখানা পেতে দিলেন তিনি। রামেন্দ্র-সুন্দরের ইঙ্গিতে কবি উঠে দাঁড়ালেন সেই টুলের উপর। রামেন্দ্র-সুন্দর হাত দুখানি বাড়িয়ে দিলেন কবির পায়ের উপর, তারপর অনেকক্ষণ ধরে পায়ে হাত বুলিয়ে ধূলিশূন্য স্পর্শশুচি করযুগল নিজের মাথায় মুখে চোখে বুকে সর্বাঙ্গে বোলাতে লাগলেন। মুখে চোখে অপূর্ব প্রসন্নতা ফুটে উঠল। বললেন, 'এই পরম মুহূর্তের পর মৃত্যুই আমার একমাত্র কাম্য।'

কবি আসন গ্রহণ করলেন। উত্তেজনার পর সাময়িক ক্লান্তিতে একটু চুপ করে থেকে রামেন্দ্রসুন্দর আবার বললেন, 'আর একটা আবদার আমার আপনার কাছে। এই চিঠিখানার ব্যক্ত বাণীমূর্তি আপনার মুখ থেকে প্রত্যক্ষ করতে চাই।'

কাগজের টুকরাটা এগিয়ে দিলেন কবির হাতে এবং সহজভাবেই কবি তা গ্রহণ করলেন। কবি পড়তে শুরু করে দিলেন :

Your Excellency,

The enormity of the massacres...

দেখলাম তাঁর চোখে মুখে অত্যাচার ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে যুগ যুগান্তরের পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ বজ্রমূর্তিতে রূপ পরিগ্রহ করেছে, বেজে

উঠেছে যেন রুদ্রের পিনাক ও ডমরু—একসঙ্গে। পাষাণ-মূর্তিবৎ নিশ্চল হয়ে সেই বজ্র-নির্ঘোষ শুনলেন শাস্ত্রী মহাশয়, রামেন্দ্রসুন্দর, নরেন্দ্রকুমার—সকলে। কবি-কণ্ঠের সেই ধিক্কার-বাণী বাতাসে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করল, সাম্রাজ্যবাদ ও অত্যাচারের অবসান-কল্পে মহা-প্রলয়ের আলোড়ন জেগে উঠল তাতে। খালি-খালি মনে পড়তে লাগল আমার, ইংরেজী পত্রিকার দম্ভ উক্তিঃ 'কি যায় আসে ইংরেজের, বাঙালী কবি নাইট থাকে কি 'বাবু' হয়ে যায়!' সে কণ্ঠে, সে উচ্চারণে, সেই অন্তর-নিঃশেষ-করা ধিক্কার বাণীতে বিধাতার আসন টলে উঠেছিল নিশ্চয়ই! অনুভব করলাম, বিচলিত বিধাতা এ অন্যায়ের প্রতিবিধান না করে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না।

কবির পাঠ সাঙ্গ করার পরও সুরের রেশে ভরে রইল ঘর। আরো কিছুক্ষণ অভিভূত বাক্‌হীন হয়ে রইলেন সকলেই।

কবির সঙ্গে সঙ্গে গেলেন শাস্ত্রী মহাশয়, এবং আরও অনেকে। আমি ঘরের ভিতরেই একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই রামেন্দ্রসুন্দর বলে উঠলেন, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে। এমন মানুষ আর কোথাও পেতাম কি!'

শান্ত হয়ে শুয়ে রইলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

পরদিন থেকে অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে। আশার ক্ষীণ রেখাটুকুও আর দেখা যায় না। এখন শুধু সময়ের প্রতীক্ষা। সেই সময় এসে পৌঁছল ঊনত্রিশে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দশটায়। সর্বাঙ্গসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর এই ধরণী ত্যাগ করে চির-সুন্দরের মধ্যে বিলীন হলেন।

চলমান জীবন, ২য় খণ্ড॥

চোখের দেখা

অন্নদাশঙ্কর রায়

রবীন্দ্রনাথকে দেখতে যেবার শান্তিনিকেতন প্রথম যাই সেবার আমার সঙ্গে কেউ ছিল না আর আমিও তখন নামপরিচয়হীন ছাত্র। সেটা বোধ হয় ১৯২৪-এর বসন্ত কাল। কবির ঘরে সেকালে পাহারা থাকত না, ঘরটিও ছিল খোলা জায়গায়। সটান হাজির হয়ে দেখলুম কবি কী লিখছেন।

আমার দিকে দৃষ্টি পড়লে বললুম, "আপনার কাছে একটি জিজ্ঞাসা ছিল, আপনার কি সময় হবে?"

কবি বললেন, "কি জিজ্ঞাসা?"

জিজ্ঞাসাটা অবশ্য ছল। আলাপটাই লক্ষ্য! আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম এমন সময় কবির কয়েকজন আত্মীয় এসে উপস্থিত হলেন, বোধ হয় গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ।

কবি বললেন, "কাল এসো।"

পরদিন কবি একখানা ইংরাজী মাসিকের উপর চোখ রেখে চুপ করে বসে ছিলেন, আমাকে লক্ষ্য করে কি না করে বারান্দায় এলেন একটি গানের সুর গুন গুন করতে করতে। আমি ঠিক কী ভাবে আরম্ভ করব ভাবছি এমন সময় আগমন করলেন তাঁর কন্যা। আমি যে একা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে গেছি এই আমার তখনকার দিনের সেরা য়্যাডভেঞ্চার।...

এর পরে কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু প্রথম বারের মতো য়্যাডভেঞ্চার আর হয়নি। অভিভূত হয়েছিলুম তাঁকে দর্শন করে। তাঁর কবিত্ব কেবল কাগজে নয়, জীবনেও। চেহারায়, চাউনিতে, ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে, কথায়, কোথাও কবিত্বের অনুপস্থিতি নেই। কোনো সময়েই তিনি কবি ছাড়া অন্য কিছু নন। কাব্য ও

জীবন এক হয়ে গেছে গঙ্গাযমুনার মতো, তাঁর কাব্যই তাঁর জীবন, জীবনই কাব্য। আমরা যারা কবিতা লিখি, আমরা কি সব সময়েই কবি? সব বিষয়েই? এই জিজ্ঞাসা নিয়ে স্বস্থানে ফিরেছিলুম।

জীবনশিল্পী ॥

রবীন্দ্রনাথের হাসা-পরিহাস

গোপালচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আর্ট ও সাহিত্যের আসর 'বিচিত্রা'র অধিবেশন তখন প্রতি সপ্তাহেই হ'ত। কলকাতার নামকরা সাহিত্যিক ও শিল্পীরা প্রায় সকলেই এই আসরে আসতেন।

ঘরের মেঝেয় ঢালা ফরাসের উপর সভা বসত। তাই সকলেই ঘরের বাইরে জুতো খুলে ফরাসে এসে বসতেন।

সভা ভঙ্গের পর প্রত্যেকবারই খবর পাওয়া যেত কারও না কারও জুতো হারিয়েছে। এইভাবে প্রতিবারেই দু-একজন করে জুতো হারাতে থাকলে সকলেই জুতো-সমস্যায় পড়লেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তো ছেঁড়া জুতোই পায়ে দিয়ে আসতে আরম্ভ করলেন।

সেবার 'বিচিত্রা'র এক বিশেষ অধিবেশনে শরৎচন্দ্রও এসেছেন। শরৎচন্দ্র এসেই কয়েকজনের মুখে সভায় জুতো চুরির কাহিনী শুনলেন।

শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর সখের নতুন জুতো জোড়াটি পায়ে দিয়ে এসেছেন। তাই জুতো চুরির কথা শুনে, তিনি বারান্দায় একদিকে গিয়ে তাঁর হাতে যে খবরের কাগজটা ছিল, তাই দিয়েই জুতো জোড়াটি মুড়লেন। তারপর মোড়কটি হাতে নিয়ে সভায় রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে বসলেন।

শরৎচন্দ্র যখন কাগজে জুতো মোড়েন, সত্যেন দত্ত দূর থেকে তা দেখেছিলেন। তিনি চুপে চুপে রবীন্দ্রনাথকে বলে দেন যে, শরৎচন্দ্রের হাতে কাগজের মোড়কের মধ্যে তাঁর জুতো রয়েছে।

এই শুনে রবীন্দ্রনাথ সভায় বসে এক সময়ে শরৎচন্দ্রের হাতের মোড়কটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন—শরৎ এটা কি ?

শরৎচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—আজ্ঞে, আছে একটা জিনিস।

রবীন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করেন—কি জিনিস শরৎ? বই-টই নাকি? শরৎচন্দ্র মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন—আজ্ঞে····

রবীন্দ্রনাথ এবার সকৌতুকে বললেন—কি বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ বুঝি?

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শরৎচন্দ্র তো অবাক্।

অপর সকলে কিন্তু হো-হো করে তখন হাসছেন।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী একদিন কথা-প্রসঙ্গে কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—গুরুদেব, আপনি ছবি আঁকাটা কিরূপে শিখলেন? আর এত রকমে?

উত্তরে কবি বলেছিলেন—শুনুন, সরস্বতী প্রথমে আমাকে নিজের লেখনীটি দয়া করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবার পর ভাবলেন—না! কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি, সম্পূর্ণ করতে হবে! এই ভেবে তিনি নিজের তুলিকাটিও আমাকে প্রদান করলেন।

উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা চমৎকৃত হলেন।

একদিন সকালে কবি উত্তরায়ণে তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে আছেন।

এমন সময় অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

ভৃত্য কবিকে একটা গ্লাসে কিসের রস দিয়ে গেলে, কবি একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খেতে লাগলেন।

কবি ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলেন, ক্ষিতিমোহনবাবু তাঁর গ্লাসের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। কবি বুঝলেন—ক্ষিতিমোহনবাবুর এই পানীয়টি নিশ্চয়ই খাবার বড় ইচ্ছে হয়েছে।

তাই কবি তাঁর ভৃত্যকে ডেকে ক্ষিতিমোহনবাবুকেও একটুখানি দেবার জন্য ইঙ্গিতে বলে দিলেন।

ভৃত্য একটা গ্লাসে সামান্য একটুখানি ঐ রস এনে ক্ষিতিমোহনবাবুর সামনে টেবিলে রেখে গেল।

কবির গ্লাসে অতখানি, আর তাঁর গ্লাসে মাত্র একটুখানি, এই দেখে ক্ষিতিমোহনবাবু মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণও হলেন। ভাবলেন, হয়তো কোন খুব দামী জিনিস। যাই হোক, ভৃত্য গ্লাস রেখে গেলে ক্ষিতিমোহনবাবু তো সমস্তটাই একেবারে গলায় ঢেলে দিলেন।

এদিকে ক্ষিতিমোহনবাবু গলায় ঢেলে দিয়ে যান আর কি! আদৌ গলাধঃকরণ করতে পারেন না। মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। মহা তিতো, নিমপাতার রস যে!

ক্ষিতিমোহনবাবুর এই অবস্থা দেখে, কবি তখন মৃদু মৃদু হাসছেন।

অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী সেই সবে মাত্র শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দিয়েছেন।

এই গোঁসাইজী বেশ একটু স্থূলকায় ছিলেন।

কবি একদিন বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় গোঁসাইজীও সেখানে উপস্থিত হলেন।

কবি গোঁসাইজীর সঙ্গেও কথা বললেন।

গোঁসাইজী শান্তিনিকেতনে নবাগত বলে কবি সৌজন্যবশতঃ তাঁকে আপনি বলে সম্বোধন করেছিলেন।

কবির মুখে 'আপনি' শুনে বয়সে অনেক ছোট গোঁসাইজী মনে মনে ভারী সংকোচবোধ করছিলেন। তাই তিনি শেষে অনুনয়ের স্বরে বললেন—আপনি আমাকে 'আপনি', 'আপনি' বলছেন কেন!

স্মিতহাস্যে কবি উত্তর দিলেন—কি করি বাপু, তোমার যে বপুখানি, অন্ততঃ তারও তো মর্যাদা দিতে হবে।

এক সময় উমাচরণ নামে কবির একজন ভৃত্য ছিল। এই উমাচরণ কাজে যেমন ছিল দক্ষ, তেমন ছিল আমুদে ?

কবি এর সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাসা করতেন।

উমাচরণ হঠাৎ মারা গেলে, এর পরে যে ভৃত্যটি আসে তার নাম সাধু। সাধু কাজে বেশ পটু হলেও, খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিল। মনিবের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা কইত না। শুধু মেসিনের মত কাজ করে যেত।

ভৃত্য হয়ে এসেছে বলে, সে মনিবের সঙ্গে সাহস করে প্রাণ খুলে কথা কইবে না—কবি এটা আদৌ পছন্দ করতেন না।—তাই সাধুর কাজে তিনি খুশি হলেও, তার গম্ভীর মেজাজ দেখে বড় অস্বস্তি বোধ করতেন।

সাধু আসার কয়েকদিন পরে ক্ষিতিমোহন সেন মশায় একদিন কবিকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনার এ ভৃত্যটি কি রকম ?

উত্তরে কবি বলেন—আর বলেন কেন মশায় ? ও কি আমার ভৃত্য ! যা গম্ভীর, মনে হয়, ও আমার গার্জেন। কথাতো শুনতে পাই-ই না। তবে যখন শুনি, গর্জন শুনি।

কবির ভৃত্য মহাদেব শীতকালে কবির শোবার ঘরের পাশের ঘরে, আর গ্রীষ্মকালে কবির ঘরের বাইরের বারান্দায় শুতো।

একদিন গ্রীষ্মকালে কবি বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। জোছনা এসে মুখে পড়েছে। হঠাৎ কবির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মহাদেবকে ডেকে কবি বললেন—ওরে চাঁদটা ঢেকে দেতো। ঘুম হচ্ছে না।

দূরে আকাশে চাঁদ। মহাদেব তো ভেবেই পেল না, চাঁদকে কেমন করে সে ঢেকে দেবে। বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগল।

কবি হেসে বললেন—পারছিস্ নে। আচ্ছা এক কাজ কর। ঐ জানালা বন্ধ করে দেতো।

মহাদেব তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করতেই ঘর অন্ধকার হ'ল।

কবি বললেন—কিরে হ'ল এবার ? চাঁদ ঢাকা পড়ল ?

সেদিন শান্তিনিকেতনের কর্মীদের এক সভা। সভায় কবিও এসেছেন।

সভা আরম্ভ হতে তখন সামান্য দেরি।

যে ঘরটিতে সভা বসেছে, সে ঘরটি ছিল খুব প্রশস্ত ও বেশ আলো-বাতাসযুক্ত। তাই একপাশে কয়েকজন কর্মী, ঘরটি যে বেশ —সে সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

কবি চুপ করেই বসেছিলেন। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন —এই ঘরটিতে একটি বাঁদোর আছে।

কবির কথা শুনে সকলেই চম্‌কে উঠলেন এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। আর যাঁরা কথা কইছিলেন, তাঁরা তো ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন।

কর্মীদের এই অবস্থা দেখে কবি এবার বললেন—বাঁদর নয়, বাঁদর নয়, বাঁ-দোর। দেখ্‌ছ না ঘরটার একদিকে যেমন একটা ডান-দোর আছে, ওদিকটায় তেমনি একটা বাঁ-দোরও রয়েছে।

কবির কথা শুনে এবারে সকলেই হেসে উঠলেন।

মহাত্মা গান্ধী একবার শান্তিনিকেতন এসেছেন।

মহাত্মাজী কবির অতিথি।

কবির ঘরে মহাত্মাজীর সঙ্গে কবির তখন কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় কবি বললেন—আমি অচল, আপনি সচল।

মহাত্মাজী বললেন—আপনি কবিগুরু যে !

কবি বললেন—আপনি যে বিশ্বগুরু !

মহাত্মাজী আবার বললেন—তবুও আপনি বড়। আপনি যে বিশ্বগুরুর গুরু। আমার প্রণম্য।

উভয়েই এবার হাসতে লাগলেন।

শিশু ও সংগীত

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

সেদিন প্রতিবেশী সহকর্মীর ক্ষুদ্রতম শিশুটি তাদের বারান্দায় নাচছিল গান গেয়ে—

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি'
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি ॥
আ-হা-হা-হা-হা

মুগ্ধনেত্রে এই শিশুলীলা দেখছিলাম। শিশুরা যেমন চিরন্তন, তাদের আনন্দময় রাজ্যও তেমনি চিরন্তন! এরা বাইরের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। এরা আছে 'জগৎমায়ের অন্তঃপুরে তাই সে শোনে কত-যে গান কতই সুরে'।

মনে পড়ে গেল নিজেদের শৈশবকাল। সেদিনও কেটেছে এমনিভাবে দিনগুলি হাসিকান্নার হীরাপান্না নিয়ে। আর সেই শৈশবকে ঘিরে মনে হলো অনেক কথা। তখনও শিশুরা নেচেছে গেয়েছে এমনিতর, কিন্তু তাদের এমন কোন সঙ্গীতসম্পদ্ ছিল না, যা তারা নিজস্ব বলে দাবি করতে পারতো, এই কথাটা খুব বড় হয়েই মনে পড়ছিল।

এখনকার কাল চলেছে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে, কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেকার কাল চলতো পিঁপড়ের মতো, কাজেই চল্লিশ বছর আগেকার কথাও এখন হয়ে পড়েছে যেন সেকেলে কথা। তাই তখনকার অভাব বা প্রচুরতার পরিচয় অনেক সময় আমরা পাই না!

যদিচ শিশু চিরন্তন, তবু সেকেলে-শিশুর আর একেলে-শিশুর অধিকারে যথেষ্ট ভেদ ঘটেছে। একালে শৈশবসম্পদ্ প্রচুর মেলে, কি মনের, কি দেহের দিকে।

আমাদের ছেলেবেলা গানের আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই কেটেছে। ছোট বয়েসে প্রায় সবারই গানের প্রতি আকর্ষণ থাকে, এর সূত্রপাত বোধহয় ঘুমপাড়ানী গানশোনা থেকে। আবার সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা বলেন, গানের রস বোঝে শিশু, পশু আর সাপেরা। গানের রস বলতে বোধহয় সুরের রসকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, কেননা গানের কথার রস প্রাচীনকালে কোন শিশুর যোগ্য ছিল কিনা সন্দেহ। তখন বাংলাগান যা শুনতাম তা সবই ধর্মমূলক, কীর্তন, রামপ্রসাদি প্রভৃতি। আর শুনতাম ওস্তাদি গান, তার কথা বোঝা তো দূরের কথা, টানাটানা সুর বিশ্রী লাগতো, সেটা কপালের দোষে কি বয়সের দোষে এখনো ঠিক ধরতে পারিনি। কীর্তনের মধ্যে বাংলা কথার যা দু' একটির মানে জানতাম তাতেই তার বিষয়বস্তুটি নিজের মতো করে আন্দাজ করে নিতাম।···আর যেটুকু আনন্দ পাওয়া যেত তা সুরের !

····একবার এক আত্মীয় এক বৈঠকে গান করেন, মনে নেই কেন আমরা ক'জন তাতে হাজির ছিলাম।···সুর বেশ রঙচঙে। কাজেই গানের খানিকটে মনে গেঁথে গেল। কিন্তু একদিন ঐ গান আপন-মনে গেয়ে জনৈক গুরুজনের কাছে খেলাম ভীষণ ধমক। তিনি বললেন, 'এ-গান তোদেব গাইতে নেই, ফের গাবি তো টের পাবি।' বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। সেই প্রথম টের পেলাম, আমাদের গাইতে-নেই-জাতীয় গানও আছে। কিন্তু কোন্‌টা আমাদের পক্ষে 'ট্যাবু' আর কোন্‌টা নয় তখন সে বিচারের ক্ষমতা ছিল না, অতএব বাংলাগানের বেলা চুপ করে থাকাই শ্রেয়। অথচ এর আগে কীর্তন বা রামপ্রসাদি ধরনের গান ছেলেদের মুখে শুনলে কেউ তো কখন মানা করেননি। ওস্তাদি গান তো ছিল 'শত হস্তেন' আর চেষ্টা করলে হয়তো উচ্চারণই হতো না। এসব হচ্ছে ভাল লেগে গাওয়ার কথা, শিখে নয়।

সত্যই সেকেলে ধর্মমূলক আর যাত্রাদলের সঙের দু'একটি গান

ছাড়া ছেলেদের গাইবার মতো গান ছিল কিনা জানিনে। এ তো আমাদের ছেলেবেলার কথা। তার চেয়ে ঢের আগে গুরুদেব প্রসিদ্ধ ওস্তাদদের কাছে গান শিখতেন। তাঁদের শেখানো বাংলা গান সম্বন্ধে গুরুদেব বলেছেন—এখনকার কালে কোন নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। একটা যেমন—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে এল পাড়াতে, সাধের উল্কি পরাতে,
আবার উল্কি পরা যেমন তেমন লাগিয়ে দিল ভেল্কি, ঠাকুরঝি,
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি ঠাকুরঝি !

....পাঁচ-ছ' থেকে পনের-ষোল বছরের ছেলেমেয়েদের জন্যে এরকম কোন বাংলা গান ছিল কিনা বলতে পারিনে, যার রস তারা আত্মস্থ করে নিতে পারে।....ব্রহ্মসঙ্গীতের শিশুদের গেয় গানগুলি ধর্মমূলক। এইসব গান একটা বিশিষ্ট আবহাওয়ায় কার্যকর হয়। তারপর স্বদেশীযুগে ছেলেরা পেলো অনেকগুলি গান. যেগুলি তাদের অনুভূতির খুব কাছাকাছি। সে-সব গানের অর্থবোধ ঘট্‌তো বলে গানের সময় মন উঠ্‌তো বেশ সজাগ হয়ে। ..

....সেকালে যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে, তেমনি সংগীতের ক্ষেত্রে শিশুরা চির-উপেক্ষিত ছিল। তাদের নিজস্ব ছিল ছেলে-ভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, আর মা-দিদিমার মুখে-পাওয়া রূপকথা। তাই মনে হয়, এই চিরন্তন আনন্দময় শিশু তখন ছিল নিঃসম্পদ্। তাদের হাত ছিল শূন্য। সেই শূন্যহাত উপ্‌চিয়ে ভরে দিলেন গুরুদেব, নানাসুরের ফুলে। তাদের কণ্ঠ সুসজ্জিত করলেন সংগীত-মণি-মাণিক্যের অম্লান শতনরীতে, যেমন ক'রে দিয়ে গেছেন বয়ঃস্থের জন্যে।

বছরে বছরে প্রকৃতির ঋতু-বৈচিত্র্য চলেছে নানা উৎসব নিয়ে। তারি আনন্দরসে জীবন পায় পুষ্টি ও তুষ্টি। এই সহজ উৎসবের ভিতর দিয়ে এল গুরুদেবের গান, যেমন মধু আসে ফুলের ভিতর দিয়ে—চাঁদের গান, তারার গান, ঝড়ের গান, মেঘের গান, বিদ্যুতের

গান, কতরকম ফুলের গান, আরো কত কি।—যার সঙ্গে শিশুরা জন্মাবধি পরিচিত। এই গানগুলি ঠিক প্রকৃতিরই মতো শিশুদের ঘিরে ধরে' রসসঞ্চার করে তাদের মনে প্রাণে। গানের ওপর তাদের দরদ আপনি জন্মায়। তাই তখনকার শিশু আর এখনকার শিশু এক হলেও এরা লাভবান।

নিজেদের অতীত কথার 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে' যখন চোখের উপর দেখতে পাই, তিনচার বছরের শিশুরা তাদের মনোমতো গান দু'চার লাইন আপন মনে গাইছে আর নাচ্‌ছে তখন বলতে ইচ্ছে করে, এসময়ে 'যা পেয়েছি যা দেখেছি তুলনা তার নাই'।

গীতবিতান বার্ষিকী। মাঘ, ১৩৫০॥

রবীন্দ্র-জীবনের একদিক

অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের সকলের চেয়ে বড় স্মৃতির বিষয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার যে একটি নিকট আত্মীয়তার যোগ ছিল তাহারই আনন্দ। তিনি বলেন, যখন তিনি নিতান্ত বালক, বাড়ির চাকরের হেপাজতে থাকিতেন, তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণ দিকের জানালার নীচে একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল, সেই পুকুরের পূর্বধারে প্রাচীরের গায়ে একটি প্রকাণ্ড চিনে বট এবং দক্ষিণ প্রান্তে একসারি নারিকেল গাছ ছিল। ভৃত্য তাঁহাকে ঘরে আবদ্ধ থাকিতে বলিয়া কাজে যাইত, সমস্ত দিন সেই পুকুর দেখিয়া তাঁহার সময় কাটিত। সেই ডালপালাওয়ালা ঘন বট তাঁহার কাছে কী রহস্যময় ছিল! এক-একদিন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সুদূর বিস্তৃত কলিকাতা শহরের নিস্তব্ধ বাড়িগুলার দিকে চাহিয়া তাহার ভিতরের নানা রহস্যের জল্পনায় সেই বালকের মন উন্মনা হইয়া উঠিত, মাঝে মাঝে চিলের সুতীব্র তীক্ষ্ণ স্বর, ফিরিওয়ালাদের বিচিত্র সুরের হাঁক বিশ্বের সঙ্গে নূতন পরিচয়ের আবেগে সমস্ত চেতনাকে স্পন্দিত তরঙ্গিত করিত।

পরবর্তীকালে এই বাল্যজীবন স্মরণ করিয়া তিনি যে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই ঃ

'আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা একটু একটু মনে পড়ে, কিন্তু সে এত অপরিস্ফুট যে ভালো ক'রে ধরতে পারি নে। কিন্তু বেশ মনে আছে, এক-একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারি দিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল।···গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতেম কী একটা রহস্য আবিষ্কার হবে।····

'পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোর বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমাকে সঙ্গদান করত। ..'

অতি অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যালয়ে যান, কিন্তু হায়, পৃথিবীর অধিকাংশ কবির ন্যায় জননী বীণাপাণির পদ্মবনটির প্রতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার লোভ ছিল, কিন্তু তাঁহার কমল-সরোবরের তীরে গুরুমশায়-অধিরাজিত যে বেত্রবনটা কণ্টকিত হইয়া আছে, সেটাকে তিনি অত্যন্ত বেশি ডরাইতেন।....

....বিদ্যালয়ের জীবন তাঁহার কাছে 'দুঃসহ জীবন' ছিল। বিদ্যালয়ে তাঁহার পড়াশুনা যে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু বিদ্যালয়ে পড়াশুনা না করিলেও বাল্যকাল হইতে বাংলা পড়িবার অভ্যাস থাকায় বিচিত্র বাংলা পুস্তক কবি শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখনকার দিনে এমন বাংলা বই নাম করা শক্ত যাহা তিনি পড়েন নাই। ইহাতে তাঁহার কল্পনার খোরাক নিঃসন্দেহ জুটিয়াছিল এবং ভাবপ্রকাশও অনেকটা পরিমাণে বাধাহীন হইয়া আসিয়াছিল।

বাংলা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ইংরেজি বিদ্যালয়ে যখন পড়া চলিতেছে, তখন ইঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ তখন কল্পনার অতীত। হিমালয় দেখিবেন! এতবড় সৌভাগ্য!

যাত্রার পথে বোলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরের জগতের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়, তাহার পূর্বে গঙ্গার তীরে একটা বাগানবাড়িতে কিছুদিনের জন্য বড় আনন্দে যাপন করিয়াছিলেন মাত্র। কবির নিজের কাছে শুনিয়াছি যে, বোলপুর স্টেশন হইতে

শান্তিনিকেতনে রাত্রিকালে পালকি করিয়া আসিবার সময় তিনি কিছুই চাহিয়া দেখেন নাই পাছে রাত্রে নূতন দৃশ্যের অস্পষ্ট আভাস চোখে পড়িয়া প্রাতঃকালের নবীন কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির কিছুমাত্র রসভঙ্গ করে।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া এলাহাবাদ কানপুর প্রভৃতি নানা স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে অমৃতসরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে ডালহৌসি পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পাহাড়ের অধিত্যকা-উপত্যকা-দেশে স্তরে স্তরে তখন চৈত্রের সোনার ফসল বিস্তীর্ণ—দুর্গম গিরিপথ, কলধ্বনি-মুখরিত ঝরনা, কেলুবন—এ সমস্ত পার্বত্য ছবি দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখের আর শ্রান্তি রহিল না।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছু কাল পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স বারো। তাহার পর হইতে তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো আরো দুরূহ হইয়া পড়িল। এবং ক্রমশ তাঁহার গুরুজন এই বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্ত হইলেন। পাহাড়ে থাকিতে পিতার নিকটে অল্প কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ঋজুপাঠ, কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞান। কিন্তু বাংলা পড়ায় তাঁহার বিরাম ছিল না। এই সময়ে তাঁহার কোনো অধ্যাপক তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ প্রভৃতি তাঁহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইতেন। বাড়িতেও সাহিত্য-চর্চার অভাব ছিল না। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে ছিলেন ভরপুর। তাঁহার মুখে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণ চিত্ত বিস্তর খোরাক সংগ্রহ করিত। বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গেও ইঁহাদের বাড়ির বিশেষ একটি প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং বালক-বয়স হইতে সাহিত্য-চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন।

যেমন সাহিত্যচর্চা তেমনি গীতচর্চা। বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত গান শুনিয়া ও তৈরি করিয়া সুরের অনির্বচনীয়তার রাজ্যে তাঁহার মন ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

কবি অল্প বয়স হইতেই অনেক রচনা করিয়াছিলেন, সে-সকলের উল্লেখ আমরা করিব না। তাঁহার ষোলো বৎসর বয়সের সময় তাঁহাদের বাড়ি হইতে 'ভারতী' কাগজখানি প্রথম বাহির হয়, ইহাতে কবির অনেক বাল্যরচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ভারতী' দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিলে রবীন্দ্রনাথ সতেরো বৎসর বয়সে বিলাত যাত্রা করেন। তাহার পূর্বে আমেদাবাদে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল বাস করেন। শাহীবাগের বাদশাহী আমলের প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে ছিল তাঁহাদের বাসা—প্রাসাদের পাদমূলে সাবরমতী (সুবর্ণমতী) নদীর ক্ষীণ স্রোত প্রবাহিত—প্রকাণ্ড ছাদ, বিচিত্র কক্ষ এবং তাহাদের প্রবেশের বিচিত্র পথ—সবটা জড়াইয়া ভারি রহস্যময় একটি স্থান। এই প্রাসাদের স্মৃতি অবলম্বনেই ভবিষ্যতে 'ক্ষুধিত-পাষাণ' গল্পটি রচিত হয়।

এইখানে অবস্থানকালে কবির ইংরেজি শিক্ষা অনেকটা আপনা-আপনি অগ্রসর হয়, ইংরেজি সাহিত্যের দুরূহ গ্রন্থসকল তিনি পাঠ করিতেন এবং তাহার ভাব অবলম্বনে বাংলায় রচনা প্রকাশ করিতেন।

ববীন্দ্রনাথের গানে দেশের ও দশের প্রতি দরদ প্রাণবান হ'য়ে উঠেছে। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তাঁর গান সর্বসাধারণের জন্য, নির্বাচিত শ্রেণী ও আরামবিলাসী ধনীদের জন্য শুধু নয়। গানের জন্য প্রশংসা পাবার আশাও তিনি করেন নি কোনদিন। তিনি বলেছেন, 'আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত নাওয়ার ঘরে কিংবা এমন সব জায়গায় গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত, এর খুব বেশি ambition মনে নাই রাখলাম।' অবশ্য ambition বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তিনি নিজে না রাখলেও বাণী-সরস্বতী প্রশংসার অজস্র আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন তাঁর শিরে। সহজ সরল ও প্রাণস্পর্শী তাঁর গানের সুর ভারতীয় সমাজের সর্বসাধারণের হৃদয়ে আসন পেতে বসতে আজ সক্ষম হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশকে ভালবেসেছিলেন পোশাকী বা লোক-দেখানো সহানুভূতির নজিরে নয়, পরন্তু প্রাণের অন্তরতম দেশ থেকে। দেশ-মাতৃকার পরাধীনতাকে তিনি কোনদিনই জীবনে বরদাস্ত করতে পারেন নি, আর পারেন নি ব'লেই সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানে সুর-সংযোজন ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, তিনি জাতীয়-সঙ্গীতের রচনা ও প্রচারের দায়িত্বকেও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে' গানখানি আজ ভারতের সকল জাতির গৌরবগাথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।.... রবীন্দ্রনাথ দেশের ও জাতির প্রাণের উদ্বোধনের জন্য রচনা করিয়াছিলেন নূতন ধরনের স্বদেশী গান (১) 'অয়ি ভুবন-মনমোহিনী', (২) 'আজি এ' ভারত লজ্জিত হে'. (৩) 'হে ভারত আজি নবীন বর্ষে', (৪) 'কে সে যায় ফিরে ফিরে' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের

প্রভাব পরবর্তী নাট্যকার, গীত-রচয়িতা ও সুরকারদের ওপর যথেষ্ট পড়েছিলো।....

রবীন্দ্রনাথের গান বাঙ্গালার মধ্যে শুধু নয়, সারাবিশ্বে এনেছে এক নূতন চেতনা।

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ ॥

বন্ধুর সঙ্গে একদিন

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আজ তোমাদের একটা খুব মজার গল্প বলবো। একটি ছোট ছেলের কাহিনী। ছেলেটির নিজের মুখ থেকে এই গল্প আমি শুনেছিলাম। সে বলেছিল, দেখো, যতদিন রবিঠাকুর বেঁচে থাকবেন, ততদিন এ গল্প তুমি কাউকে বলতে পারবে না। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম। আজ রবিঠাকুরও নেই, ছেলেটিও নেই। তাই, আজ সেই গল্পটি তোমাদের সকলকে জানাবার জন্যে এসেছি।

তোমরা হয়ত ভাবছো, এর সঙ্গে রবিঠাকুরের কি সম্পর্ক আবার !

সম্পর্ক আছে, একটু ধৈর্য ধরে পড়লেই দেখতে পাবে। ছেলেটির মনে দুরন্ত সাধ ছিল যে, সে তার দেশের সব বড় লোক-দের সঙ্গে ভাব করবে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে....এই ছিল তার পণ, তার তপস্যা ‥

বহু বড় লোকের সঙ্গে তার ভাবও হয়েছিল....বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন....সকলের সঙ্গেই তার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল ‥

তোমরা ভাবছো···সে কেমন ছেলে, সে কে ? আমি যদি তার নাম বলি, তোমরা সবাই তাকে চিনতে পারবে....তাকে তোমরা সবাই দেখেছ....তাকে তোমরা সবাই জানো....ঠিক তোমরা নিজেকে যেমন জানো, তাকেও ঠিক তেমনি জানো....তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক নক্ষত্রে সে জন্মেছে‥ তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক মায়ের কোলে সে মানুষ হয়েছে···এর বেশী তার সম্বন্ধে আর আমি কিছু বলতে পারবো না....তার নাম ? তার যে অনেক নাম · প্রত্যেক ঘরে ঘরে তার আলাদা আলাদা নাম....কোন্ নামটা বাদ দিয়ে কোন্ নামটা বলি বলো···তবু গল্প বলতে হলে, একটা

নামের তো দরকার....তাই, কাজ চালিয়ে নেবার জন্যে, তার আর একটা নাম রাখলাম, পাগল। ডাকনাম, পাগ্‌লা....

রোজ রাত্রিতে ছাদের ওপর শুয়ে শুয়ে সে আমাকে তার ছোট্ট জীবনের সেই বৃহৎ কাহিনী বলতো....মাথার ওপরে তারারা মিট্‌ মিট্‌ করতো...আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে তার সেই বিস্ময়কর কাহিনী শুনতাম...দেখতাম বলতে বলতে অন্ধকারে প্রদীপের মত তার চোখ দুটো জ্বলে উঠতো....

সে যে-সব কথা আমাকে বলেছিল, তার প্রত্যেকটি আমি বিশ্বাস করতাম ..পাছে কেউ অবিশ্বাস করে ব'লে, সে আর কাউকে বলে নি...আমার অনুরোধ, তোমরাও বিশ্বাস করো....

এখন আমি তার গল্প আরম্ভ করছি....সে যেমন ভাবে আমাকে বলেছিল...

...."জান দাদু...কি করে তাঁর প্রথম দেখা পেলাম? সকাল বেলা থেকে সেনেটের সামনে সিঁড়ির একধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম.... কখন উনি আসেন...

এলেন...কিন্তু এবারও তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলাম না—তাঁর চারদিকে কত সব বড় বড় লোকের ভিড়—তিনি সেনেটের হল-ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন—আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—যখন ফিরবেন, যেমন করেই হোক্‌ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব, বলবো—তুমি কেমন শিশু ভোলানাথের কবি—আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কবে থেকে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, তা কি তুমি জান না?

ফেরবার সময়—আরো বেশী ভিড় হলো—যতই এগুতে যাই, লোকে ধাক্কা মেরে মেরে আমাকে ফেলে দেয়—একটা পাঞ্জাবীর মতন লোক এমন জোরে আমার পায়ের ওপর তার বুট শুদ্ধ পা তুলে দিলে! উঃ—

কিন্তু আমি সেদিন পণ করেছিলাম—কোন রকম করে এর-ওর পায়ের ফাঁকের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে, যেখানে মোটরে ওঠবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হলাম—মনে মনে কথাগুলো একবার ঠিক করে সাজিয়ে নিলাম—

তারপর হঠাৎ দেখি, তাঁর চোখ দুটো আমার ওপর পড়লো—আচ্ছা দাদু, মানুষের চোখে অমন নীল আলো আর দেখেছো—কেমন নীল জান? আমি একবার জলে ডুবে গিয়েছিলাম—সেই সময় জলের ভেতর কেমন যেন নীল নীল আলো দেখেছিলাম—ঠিক তেমনি নীল আলো—

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না—তাড়াতাড়ি শুধু সেই রাস্তার ওপর পড়ে, তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম—ভিড়ের চাপে তাঁর গলার মালা থেকে একটা ফুল তখন সেখানে পড়লো—তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন—আমি ফুলটি কুড়িয়ে নিয়ে এলাম—এই দেখ—সেই ফুল—”

দেখলাম তার বুকের ভেতর থেকে কি একটা বার করে দেখালো—তারপর আবার রেখে দিয়ে বলতে আরম্ভ করলো—

“মনে মনে বড় দুঃখ হলো—আমি কি এত ছোট যে, আমার প্রণামও তোমার চোখে পড়লো না। সেদিন ঠিক করলাম—শেষ চেষ্টা করবো—খোঁজ নিয়ে জানলাম—তার পরের দিন তিনি শান্তি-নিকেতনে ফিরে যাবেন—

ঠিক সময় মত প্লাটফর্মে গিয়ে হাজির হলাম—ট্রেন ছাড়বার মাত্র মিনিট দুয়েক আগে তিনি এলেন—যাঁরা পৌঁছে দিতে এসেছিলেন—তাঁরা প্রণাম করে একে একে সরে দাঁড়ালেন—ঘণ্টা বেজে উঠলো—গার্ড হুইশল্ দিল—গাড়ী নড়ে উঠলো—একটু স্পীড্ নিতেই গাড়ীতে লাফিয়ে উঠলাম—দরজা খুলে একেবারে সোজা তাঁর পায়ের কাছে—

—পাগল ছেলে !

ধীরে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন—

—কাল প্রণাম করে কোথায় পালিয়ে গেলে ?

আমি বললাম, তা হলে তুমি দেখতে পেয়েছিলে ?

তিনি হেসে বললেন, শুধু কি কাল—আর-একদিন দেখি, দূর থেকে তুমি নমস্কার করছো—আমি ডাকলাম—তুমি এলেই না !

দেখেছ দাদু, কেমন লোক ! আমি কোথায় অভিমান করে আছি, আর উল্টে তিনিই কিনা অভিমান করলেন ! আমি বল্‌লাম, আমি কি করে বুঝবো তুমি ডাকছিলে ? যারা তোমার কাছে গেল, তাদের নাম ধরে তুমি ডাকলে, আর আমার বেলায় তুমি কোন কথাই বললে না !

তিনি বললেন, আমি তোমার নাম ছাড়া, আর কারুরই নাম ধরে ডাকি নি—তুমি যদি না শুনতে পাও, আমার দোষ ?

দোষটা যেন আমারই—মেনে নিয়ে তাঁর সামনে বসলাম—এতদিন মনে মনে তাঁর সঙ্গে কি করে আলাপ করবো, কি কথা সব জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক করেছিলাম কিন্তু সামনে এসে কি যে বলবো, কি যে জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক করেই উঠতে পারলাম না। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে মনে হলো, আমাকে বোকা ভেবে বোধহয় কবি হাসছেন, তাই তাড়াতাড়ি যা মনে এলো, তাই জিজ্ঞাসা করে ফেললাম,—

—তোমার বয়স কত ?

—তোমার সম-বয়সী।

উত্তরটা শুনে খুব ভাল লাগলো—আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন,—

—তোমার মনে নেই—তুমি আমাদের বাড়ির গলির সামনে রোজ এসে পাড়ার অন্যসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হুটোপাটি খেলতে—

আমি বাবুদের বাড়ীর তেতলায় চিলছাদের এক কোণ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখতুম—

—তোমাকে দেখে আমার খুব হিংসে হতো—

—আর আমার হতো না বুঝি—।

—তোমার কেন হিংসে হবে?

—তোমার কেন হতো আগে বলো—

—বলবো—ঠিক কথা বলবো কিন্তু—তুমি রাগ করো না—তোমরা কত বড়লোক ছিলে—আর আমরা কি রকম গরীব ছিলাম—

—তুমি জান না—তোমার চেয়ে সেইজন্য ঢের বেশী কষ্ট পেয়েছি আমি—আমি রোজ আমাদের ছাদের আল্‌সের ফাঁক দিয়ে তোমাদের দেখতাম—তোমরা খেলা করছো—গাছে চড়ছো—পুকুরে সাঁতার কাটছো—আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে যেখানে খুসী সেখানে চলে যাচ্ছ—আমার মন হু-হু করে উঠতো—অতবড় বাড়ী—লোকজন—আমার কিছুই ভালো লাগতো না—

—কেন?

—আমার তো কেউ খেলার সঙ্গী ছিল না—মনে হতো ছুটে গিয়ে তোমাদের খেলায় হা-রে-রে করে মেতে উঠি—তোমাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে ঐ যে সব আঁকা-বাঁকা পথ—কোথা দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে—সেখানে চলে যাই—কিন্তু নড়বার উপায় ছিল না—সে যে কি কষ্ট তোমরা বুঝবে না। আমার পৃথিবী ছিল যেন একটা ছোট্ট সিন্ধুক—তারই ভেতর আমাকে চলাফেরা করতে হতো—সকাল হলে সিন্ধুকের ডালি খুলে দেওয়া হতো—আবার সন্ধ্যে হলে সিন্ধুকের ডালি বন্ধ করে দেওয়া হতো—তার মধ্যে দু'একটা ফুটো ছিল—তার ভেতর দিয়ে দেখতাম—তোমাদের পৃথিবীর গাছে ফল ঠাঁসাচ্ছে—পুকুরে জল থই থই করছে—গাঙশালিকেরা কোথায় উড়ে উড়ে চলেছে—

—তা চলে আসতে না কেন? আমি ভাবতুম—তুমি বড়-

লোকের ছেলে—তাই আমাদের সঙ্গে মেশো না—আমরাও তোমাকে ডাকতে সাহস করতাম না—তোমাদের দরজায় যে সব দারোয়ান বসে থাকতো—

—তারা যেমন তোমাদের ঢুকতে দিতো না—আমাকেও তেমনি বেরুতে দিতো না—সব চেয়ে জ্বালাতন করতো ব্রজেশ্বর—একতিল সে কি কাছ-ছাড়া হতো! আমি যদি একটু আমার বরাদ্দ চৌকাটের সীমানা, ব্রজেশ্বরের চোখ এড়িয়ে পেরিয়েছি—অমনি চারিদিক থেকে লোক হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে তাকে খবর দিতো—সে ঝুঁটি ধরে আবার ভেতরে টেনে নিয়ে যেতো—আমি চৌকাটের বার হলে, তার হতো শাস্তি—তাই তার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, যাতে চৌকাটের সীমা পার না হই—কি অত্যাচার বলতো?

—কিন্তু আমাদের মত তো দুবেলা মুড়ি খেতে হতো না—কত ভাল ভাল জামা-কাপড়—

—তোমার ভুল ধারণা—আমি তোমাদের চেয়ে বেশী খেতে পাই নি—আর তোমাদের চেয়ে খুব বেশী কাপড়-জামার বালাই ছিল না—যদিও আমি ওটাকে খুব বড় করে দেখতাম না—"পরণের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে—অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে—" জল-খাবারের যা বরাদ্দ ছিল, সেটা আসলে কতখানি বা কি, তা কোনদিন জানতে পারি নি—তবে ব্রজেশ্বরের মুখে প্রায় শুনতে হতো—দুধের বাটিতে বেড়ালে মুখ দিয়ে খেয়ে গিয়েছে—"যেদিন পাঁউরুটী আর কলাপাতা-মোড়া মাখন মিলতো—সেদিন মনে হতো যেন আকাশ হাতে নাগাল পাওয়া গেল"—কাজে-কাজেই অল্প খাওয়া আমার সয়ে গিয়েছিল, কোন রকম বাবুয়ানি, বা বিলাসিতা করবার আমাদের জো ছিল না—

—তবুও তুমি আমাদের কষ্ট বুঝবে না····আমাদের জীবনে কোন আনন্দই ছিল না····তোমাদের বাড়ী কত নাচ-গান, থিয়েটার-যাত্রা হতো···

—তার ত্রিসীমানায় যাবার আমাদের হুকুম ছিল না···আমরা ছোট-ছেলে··আর গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ ছিল বড়দের কাণ্ড-কারখানা····তাই আমরা দূর থেকে শুধু তার আওয়াজ শুনতাম···এক-আধবার অবশ্য যাত্রার আসরে বসবার হুকুম পেতাম ····কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়···শুনতে খুব ভাল লাগছে···এমন সময় কোথা থেকে ব্রজেশ্বর এসে সকলের সামনে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল···সে কি রকম লজ্জা করে বলতো? লোকেদের বাড়ীতে চাকরেরা থাকে শাসনে, আমাদের বাড়ীতে আমাকে থাকতে হয়েছে, চাকরের শাসনে····

এমন সময় কি একটা ষ্টেশনে গাড়ীটা এসে থামলো····কারা নেমে গেলো···কারা আবার উঠলো····আবার গাড়ী ছেড়ে দিল····

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন, আমাদের দেশে আমরা ছেলেদের সম্মান করতে জানি না····আমি হাড়ে-হাড়ে তা বুঝেছিলাম··তাই আমি মনে মনে ছেলেদের দলেই রয়ে গেলাম···অমলকে চেনো?

আমি ঘাড় নেড়ে বল্লাম, ডাকঘরের অমল তো? ওকে আবার চিনি না! ওকে আমার খুব ভাল লাগে····ওকে তুমি কোথায় দেখেছিলে?

—ওকে দেখেছিলাম, আমার মধ্যে ·ওকে দেখেছিলাম, বাংলার ঘরে ঘরে বদ্ধ ঘরে শুকিয়ে-যাওয়া কিশোরদের মধ্যে···

—আচ্ছা····তুমি এত পড়াশোনা কি করে করলে? স্কুলে তুমি খুব ভাল ছেলে ছিলে, না?

—মোটেই না····তোমরা যাকে ভালো ছেলে বল, আমি মোটেই সে-ধরনের ভাল ছেলেদের ভালবাসি না···আর স্কুলের কথা বলছো····যদি ছেলেবেলায় কোন কিছুকে সত্যি সত্যি ভয় করতুম···· সত্যি সত্যি ঘেন্না করতুম···সে হলো আমাদের স্কুলকে····মনে হতো ····এগুলো তো স্কুল নয়····ছেলেদের জেলখানা···মাইনে করে জেলে যেমন কয়েদীদের আটকে রেখে শুধু জব্দ করবার জন্যে প্রহরীরা

থাকে, আমাদের স্কুলে তেমনি আছে, মাইনে-করা মাষ্টার মশাইরা ...আমাকে যতবার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে···ততবারই আমি স্কুল পালিয়ে বেঁচেছি···শেষকালে বাড়ীর লোকেরা যখন হতাশ হয়ে বুঝলো যে আমার লেখাপড়া হবে না, তখন আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম···

—তুমি কোন্ স্কুলে পড়তে ?

—আমার স্কুল-জীবনের ইতিহাস শুনতে চাও···বলছি··· আমাদের বাড়ীর ভেতরেই একটা পাঠশালা ছিল···আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, সেই সময় আমি বাড়ীর অন্য ছেলেদের সঙ্গে পাঠ-শালায় গিয়ে বসি···আমাদের যিনি গুরুমশাই ছিলেন, তাঁর নাম আমার এখনো মনে আছে, মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়···বর্ধমান জেলায় তাঁর বাড়ী ছিল····

—তা হলে তুমিও পাঠশালায় পড়েছিলে ?

হাঁ··কিন্তু পাঠশালার চেয়ে আমার ভালো লাগতো, যখন সন্ধ্যেবেলায় ঈশ্বর চাকর আমাদের নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাতো····সেই ছিল তার কাজ····আমি যখন পড়তে শিখলাম, তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে বই নিয়ে আমিই তার মতন সুর করে পড়তাম····বাড়ীর চাকর-বাকরেরা সবাই এসে শুনতো····বড় ভাল লাগতো····সেই সময় আমাকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো···সেখানে আমার আদৌ ভাল লাগতো না ...সেইজন্যে স্কুল বদলে নর্মাল স্কুলে আবার ভর্তি করে দিলো···· সেখানে আমি ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলাম···কিন্তু স্কুলের পড়া আমার মোটেই ভাল লাগতো না····আমার মন পড়ে থাকতো ঈশ্বর চাকরের সেই রামায়ণের আড্ডায়····কিশোরী চাটুয্যে বলে একজন পাঁচালীওয়ালা আসতেন...তাঁর কথা শুনতে আমার যে কি ভাল লাগতো···নিজের মনে ঐ রকম সুর করে পড়তাম····গাইতাম····আর লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতাম····

—ভাল কথা....আসল কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি ....তুমি কবিতা লিখতে শিখলে কি করে ?

—প্রথম যখন আমি বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ পড়ি.... তখন তাতে একটা কবিতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই....

—বা রে...প্রথম ভাগে আবার কবিতা কোথায় ?

—আছে....সেই যে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'...কি সহজ সুন্দর কবিতা....তারপর ঈশ্বর যখন সুর করে রামায়ণ পড়তো, কিশোরী চাটুয্যে যখন পাঁচালী গাইতো...আমিও তাদের সঙ্গে সুরে সুর দিয়ে গাইতাম....সে-সুর আমার মনে থেকে যায়....কিন্তু কি করে পদ্য লিখতে হয়, জানতাম না....কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না— একে স্কুলে পড়াশোনা ভাল পারি না....তা ছাড়া, তখন যদি গুরু-জনেরা শুনতেন যে কবিতা কি করে লেখে তাই জানবার ফিকিরে আছি....তা হলে তাঁরা হয়তো আমার লেখাপড়া শেখা সম্বন্ধে সব আশাই ছেড়ে দিতেন....আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় আমার এক ভাগ্নে ছিল....তার নাম হচ্ছে জ্যোতিঃপ্রকাশ...একদিন চুপি-চুপি তাকে ধরলাম....সে আমাকে কি করে অক্ষর মিলিয়ে পদ্য তৈরী করতে হয়, দেখিয়ে দিল....আমার মনে হলো, জগতের সবচেয়ে রহস্যজনক দেশের চাবি আমি যেন পেয়ে গেলাম....বাড়ীতে বসে বসে সেই চৌদ্দ অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতা লিখি...সে কি আনন্দ! কাউকে জানাতে পারি না....পাছে বকুনি খাই....শেষ-কালে একদিন বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম....

—কি রকম ?

—আমাদের নর্মাল স্কুলে সাতকড়ি দত্ত বলে একজন মাষ্টার মশাই ছিলেন....তিনি আমাদের প্রাণি-বৃত্তান্ত পড়াতেন....তিনি শুনেছিলেন যে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখি....হঠাৎ একদিন ক্লাসের মধ্যে তিনি আমাকে বলেন, আচ্ছা, তুমি কেমন কবিতা লিখতে শিখেছ.... এই দুটি লাইনের সঙ্গে মিলিয়ে দু'ছত্র কবিতা লেখো দেখি...

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমার মধ্যে তখন সুর যেন অষ্টপ্রহর বাজছে ··আমি তক্ষুণি মুখে মুখে বলে দিলাম,

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলে ক্রীড়া করে!

—আচ্ছা, সারাদিন একলাটি বাড়ীতে কি করতে?

—ওরে বাবারে····সব ঘড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল····আমাদের খুব ভোরে উঠতে হতো····ভোরে উঠেই····হীরাসিং পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখতে হতো····তখনো সূর্য উঠতো না····তারপর পড়তে বসতে হতো····মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস আর ভূগোল···তারপর স্কুল····স্কুল থেকে ফিরে এসে, রেহাই ছিল না···· ছবি আঁকা শিখতে হতো····তারপর জিম্‌নাস্‌টিক····সন্ধ্যে হয়ে আসতো····তখন ইংরেজী পড়তে হতো····রবিবারে গান শিখতে হতো····এর ব্যতিক্রম হবার উপায় ছিল না····

এই সময় হঠাৎ বাইরে আকাশ মেঘে অন্ধকার হয়ে এলো...বড় বড় বৃষ্টি পড়তে লাগলো····তিনি বাইরের গাছপালার দিকে চেয়ে বললেন, ঐ দেখ, জল পড়ে, পাতা নড়ে····ঐ জলের শব্দ····ঐ পাতার নড়া···আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই···

এমন সময় সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে গাড়ীটা বোলপুর ষ্টেশনে এসে থামলো ··তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক লোকজন এসেছিল··· পাছে আমাকে কেউ দেখে ফেলে, সেই ভয়ে আমি একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম····

দেখি, তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ীতে ওঠার আগে, তিনি দেখলাম, দাঁড়িয়ে গেলেন ··ঘাড় তুলে, এ-দিক ও-দিক কাকে যেন খুঁজছেন···তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে কি জিজ্ঞাসা

করলো...তিনি কি উত্তর দিলেন শুনতে পেলাম না....তবে শুনলাম ঝড়ের মধ্যে তিনি বারকতক আমার নাম ধরে ডাকলেন...

তারপর চলে গেলেন....

মনে হলো, ছুটে তাঁর সঙ্গে যাই....কিন্তু ভাবলাম, না...যখন তাঁর কাছে কেউ থাকবে না....তখনই তাঁর কাছে যাব....তিনি যে আমার বন্ধু, একথা জগতে আর কেউ জানবে না....

সেদিনকার মত তার গল্প এখানেই শেষ হয়েছিল....তার পরে কবির সঙ্গে তার আর দেখা হয়েছিল কিনা ?

সে প্রশ্ন আজ আর করো না।

বার্ষিক রূপরেখা ॥

রবীন্দ্র-জীবনের শেষ বৎসর

শান্তিদেব ঘোষ

গুরুদেবের জীবনের শেষ বৎসরটিকে নানা জনে নানা দিক থেকে দেখেছেন, এবং লোকসমক্ষে তাঁর এই দিনগুলির বিবরণ প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। জীবনের আরম্ভ থেকেই গুরুদেবকে আমরা পেয়েছি সব সময় আমাদের মধ্যে, কিন্তু তখন খুব নিকট থেকে তাঁকে বোঝবার শক্তি হয় নি। যখন বড়ো হয়ে উঠলাম, তখন থেকেই তাঁর সাহচর্য পেতে লাগলাম। আমাকে তৈরি করতে লাগলেন তাঁর বহুবিধ কর্মজীবনের একদিকে আমাকে চালনা করবার ইচ্ছায়। তাঁর সৃষ্টি নাচগান অভিনয় উৎসবের কাজে তিনি আমাকে লাগিয়েছেন। এ দিক থেকে তাঁর জীবনের শেষ বৎসরটি কি ভাবে কেটেছিল তারই একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

তিনি ছিলেন চিরকাল গানে পাগল, গান গেয়েছেন, রচনা করেছেন, সকলকে গাইয়েছেন। কিন্তু শেষদিককার অসুস্থতার সময় তাঁর শ্রবণশক্তি কমে এসেছিল বলে গান শুনতেও বাধা হত; গান-রচনা করতে আর উৎসাহ পেতেন না, কিন্তু শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকতেন। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে প্রায়ই সন্ধ্যার অবসরে তাঁকে গান শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিজেও গেয়েছি, সব সময় আনন্দ দিতে পেরেছি কি না জানি নে।

নিজে থেকে গান শোনাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন। তাঁর চিরকালেরই স্বভাব ছিল নিজের সুবিধার জন্যে অপরের সাহায্য না নেওয়া। নিজের দৈহিক সেবার জন্যে সুস্থশরীরে অপরের সাহায্য গ্রহণ করা গুরুদেবের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমাদের শিশুবয়সে তাঁকে দেখেছি নিজের কাজ প্রায় নিজে করেছেন; তখন তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকত মাত্র একটি ভৃত্য।

পাছে নিয়মিত গান শোনাবার দায়িত্বে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি এ আশঙ্কায় তিনি বলতেন, 'তোদের যখন সুবিধা হয় আসিস।' আমরা তখন তাঁর ইচ্ছামত হয়তো তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি নি। নানাপ্রকার বাধা পড়েছে তাতে—তাঁর ইচ্ছার প্রতি তখন গুরুত্ব দিই নি। তাঁর মৃত্যুর পরে সে ভুল বুঝেছি।

তাঁর কাছে গাইবার জন্যে ফরমাস পেতুম তাঁর যৌবনে রচিত গানগুলি থেকে, সেইগুলিই তখন ছিল তাঁর খুব প্রিয় গান। তারই কয়েকটি গানের উল্লেখ এখানে করি: 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে', 'মরি লো মরি', 'তোমার গোপন কথাটি', 'কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ', 'হেলাফেলা সারা বেলা', 'আমার পরান লয়ে কি খেলা খেলবে', 'বড় বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে', 'আমার মন মানে না', ইত্যাদি। প্রায়ই বলেছেন, এই সময়ের গান-গুলি তাঁর মনে যে ভাবে চিহ্ন রেখে গেছে এমনটি জীবনের পরবর্তী কালে রচিত গানে হয় নি। ইদানীংকার গান আমাদের মুখে শুনে তাঁর অনেক সময় নতুন ঠেকত, পরিহাস করে বলতেন, 'এ কি আমারই রচনা, আমি তো মনেই করতে পারি না যে কবে আমি এ গান রচনা করেছি। তবে শুনে মনে হচ্ছে যেন আমারই।' পুরোনো গানগুলির প্রসঙ্গে প্রথম-যৌবনের সেই-সব দিনের বর্ণনা করতেন। বলতেন, কি রকম ক্ষ্যাপার মতো এ-সব গান গেয়ে তাঁর সময় কাটত। সেদিনের কলকাতা এত শব্দমুখর ছিল না, বিজলী-বাতির রোশনাইও তখন জ্যোৎস্নাকে আচ্ছন্ন করে নি। এই রকমের পূর্ণিমারাত্রে, পাতলা একখানি উড়ানি গায়ে, গ্রীষ্মের দক্ষিণ বাতাসে তেতলার ছাদে পায়চারি করেছেন, একলা অনেক রাত পর্যন্ত—চারি দিকে শুভ্র জ্যোৎস্না, চাদরের এক কোণে বাঁধা থাকত বেলফুলের কুঁড়ি। তখন গান গেয়েছেন প্রাণ খুলে, সমস্ত পাড়া সেই গানে গমগম করে উঠত। তিনি বলতেন, সেই গলা একবার পেয়ে আবার হারানোর মতো দুঃখ আর কিছু হতে পারে না।

রোগশয্যায় গান শোনাবার সময় নানা বিষয়ে অল্পবিস্তর আলাপ-আলোচনা হত তাঁর সঙ্গে। ছোটবেলাকার কতরকমের গান গেয়ে শোনাতেন, তাঁর গুরু বিষ্ণুর শেখানো গ্রাম্য ছড়ার গান, তারই দু' একটি তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ছেলেবেলা'য়। আলোচনা-প্রসঙ্গে এটুকু বুঝেছি যে, তিনিও মনে করতেন তাঁর সাহিত্য নিয়ে যতখানি আলোচনা হয়েছে তাঁর গান নিয়ে ততখানি আলোচনা এখনো হয় নি। তাঁর গানে যে আলোচনা করবার বিষয় আছে সেটা তিনি অনুভব করতেন, কিন্তু নিজের রচনার সম্বন্ধে স্বাভাবিক সংকোচবশত নিজের গানের বিষয় নিয়ে খুলে আলোচনা করেন নি একেবারেই। তাঁর গান ভারতীয় সংগীতে কতখানি নূতনত্ব বা বৈশিষ্ট্য এনেছে খুঁটিয়ে তা তিনি ভাবেন নি, কিন্তু এটুকু জানতেন যে, সব মিলিয়ে তাঁর গানে এমন কিছু তৈরি হয়েছে যার থেকে বর্তমান রচয়িতারা যেভাবে সাহায্য পাচ্ছে ভবিষ্যৎ যুগেও তা পাবে। বিস্তারিত আলোচনা হলে এর শক্তি কতদূর, এর স্থান কোথায় সে কথা বোঝা যাবে, এইজন্যেই তিনি আলোচনা হোক তাই চাইতেন।

যে-কারণেই হোক তাঁর মনে ধারণা হয়েছিল যে, গানবাজনায় আগেকার মতো মাথা তাঁর খোলে না। গানরচনার কথা উঠলেই বলতেন, 'তুই তো বলিস, কিন্তু সে শক্তি কি আর আমার আছে, গলা দিয়ে সুর বেরুতে চায় না।' এই রকম মানসিক অবসাদের ভিতরেও তিনি গানরচনার উৎসাহ সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করে রাখতে পারেন নি। কয়েকটি গান রচিত হয়েছিল, কিন্তু পূর্বের মতো গানের সে প্রবাহ আর দেখা দেয় নি। সুরযোজনা করা ও সেই সুর মনে করে শেখানোতে যে পরিশ্রম হয় তার অর্ধেক পরিশ্রম কবিতারচনায় তাঁর হত না। তাই কবিতার স্রোত শেষ পর্যন্ত অবারিত ছিল। রোগশয্যায় যখন নিজের হাতে লিখতে পারতেন না তখন প্রায়ই অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙত তাঁর নূতন কবিতা-আবৃত্তির সঙ্গে, সেবক-সেবিকারা প্রস্তুত হয়ে থাকতেন সে কবিতা লিখে রাখবার জন্যে।

যদিও তিনি বলতেন তাঁর গানের বুদ্ধি হারিয়েছে, কিন্তু সেই বৎসর পৌষমাসে যে-কয়টি গান রচনা করেছিলেন, তার ভিতরে সুরযোজনা-ক্ষমতার কিছু অভাব ঘটেছিল বলে আমার মনে হয় না। বলেছেন—গলায় সুর খেলে না, অথচ গানে সুর যে-পর্যন্ত ওঠানামা করছে, তাতে আগের দিনের গানের তুলনায় অকৃতকার্যতার পরিচয় নেই। 'উর্বশী' কবিতাটি অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে একটি সুন্দর গানে পরিণত হল। গানে সুরযোজনা করতে তাঁর কষ্ট হত বুঝতাম, যখন দেখতাম উঁচুতে সুর তুলে মাঝে মাঝে দুর্বলতার জন্য তার কণ্ঠ অকৃতকার্য হত। জানি না আমারই ভ্রম কি না। মনে হত যেন সেই না-পারার বেদনা তিনি বিশেষভাবে গোপন করতে চাইছেন। কখনো বলে উঠতেন, 'সুরটা বুঝতে পেরেছিস তো, ঠিক করে নিস।' তখন ভেবেছি, যিনি সমস্ত জীবন এত গাইলেন, এত রচনা করলেন, যাঁর কণ্ঠের গান শোনবার জন্যে এক সময় কত লোকেই না পাগল হয়েছে, আজ সেই মহাপুরুষের একি বিড়ম্বনা, অন্তরে গানের প্রেরণা সতেজ, কিন্তু কণ্ঠে নেই সেই সুর, সেই শক্তি। এই জন্যেই আগেকার মতো গানরচনা করার কথা বলে তাঁকে দুঃখ দিতে কষ্টবোধ হত, তাঁকে গান শোনাতে গিয়ে বিশেষ ভাবনা হত যখন তিনি আনন্দে নিজেই গান গেয়ে উঠতেন। অল্পক্ষণ গেয়ে বার্ধক্যকম্পিত রোগদুর্বল কণ্ঠ শ্রান্ত হয়ে পড়ত। যেদিন শরীর ও মন অপেক্ষাকৃত সবল থাকত সেদিন হয়তো আরো বেশিক্ষণ আপন মনে সেই-সব আগেকার দিনের গান গেয়েছেন—কখনো ব্রহ্ম-সংগীত, কখনো হিন্দী গানের কয়েকটা লাইন, কখনো বিনা কথায় কেবল সুর ভেঁজেছেন, আবার কখনো নিজের রচিত পুরোনো গান গেয়েছেন, শুনে বোঝা যেত আজকে তাঁর শরীরমন সুস্থ আছে। পরিহাসচ্ছলে দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা দেবীকে দেখিয়ে বলতেন, 'গাইতে লজ্জা হয়, পাছে ওরা সব আড়ালে হাসে, আমার বেসুরো গলার গান শুনে।'

অসুস্থ শরীরে অভিনয় ও নাচগানের মহড়ায় তিনি যোগ দিতে পারতেন না, কিন্তু মন তাঁর সব সময় থাকত সেইদিকে। ১৩৪৭ সালের পৌষমাসে 'শাপমোচন' অভিনীত হল, সেই অসুস্থতার মধ্যে নাটকের অদলবদল করে, নতুন কথা বসিয়ে, গানরচনা করে, তবে নিশ্চিন্ত হলেন। মহড়ার সময় পাশের ঘর থেকে শুনতে চেষ্টা করতেন কি রকম হচ্ছে গানবাজনা। সেখানে এসে আমাদের মধ্যে বসে সেই মহড়ায় যোগ দিতে না পারায় তাঁর মনে অস্বস্তি হত খুব। অভিনয়ের চেয়ে প্রতিদিনের মহড়াতেই তিনি বেশি আনন্দ পেতেন। ধীরে ধীরে একটা সৃষ্টি কেমন করে চোখের সামনে গড়ে উঠছে তা দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। কোনদিন হয়তো নিজেই এসে উপস্থিত হতেন রিহার্সলের আসরে। অভিনয়ের দিন তাঁকে আগেই বলে রাখা হত, এতটুকু ক্লান্তি বোধ করলেই যেন বলেন তাঁকে ঘরে নিয়ে যেতে, কিন্তু সম্ভব হত না। দেহের শক্তিতে না কুলোলেও জোর করে বসে থাকতেন শেষ পর্যন্ত।

১৩৪৮ সালের নববর্ষে আমরা নাচ-গান ইত্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত, কারণ গত কয়েক বৎসর ধরে নববর্ষে গুরুদেবের জন্মতিথি পালিত হচ্ছে ও সেই উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। দিন তিন-চার পূর্বে সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গিয়েছি, বারান্দায় বসে তাঁকে কিছু গান শোনানোর পর শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী এলেন। তাঁকে দেখে নববর্ষে অভিভাষণ 'সভ্যতার-সংকট'এর বিষয়-বস্তুটি গুরুদেব মুখে বর্ণনা করে গেলেন।...

মনে ভাবলুম গুরুদেব লিখে দেশকে নববর্ষের বাণী পাঠাচ্ছেন অথচ গানে কোনো বাণী দেবেন না তা হতে পারে না। পরের দিন গিয়ে বললাম, 'নববর্ষের প্রভাতে বৈতালিকের জন্য একটি নতুন গান রচনা করতে কি আপনার কষ্ট হবে?" প্রথমে আপত্তি করলেন, কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে তা বন্ধ রাখতে পারলেন না। বললেন, 'সৌম্য (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে

একটা কবিতা লিখতে। সে বলে আমি যন্ত্রের জয়গান গেয়েছি, মানবের জয়গান করিনি। তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।' কাছে ছিলেন শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী তিনি গুরুদেবের খাতা খুলে কবিতাটি কপি করে আমাকে দিলেন। কবিতাটি ছিল একটু বড়ো, দেখে ভাবলাম এত বড়ো কবিতায় সুর-যোজনা করতে বলা মানে তাঁকে কষ্ট দেওয়া। সুর দেবার একটু চেষ্টা করে সেদিন আর পারলেন না, বললেন, 'কালকে হবে।' পরের দিন সেই কবিতাটি সংক্ষেপ করতে করতে শেষপর্যন্ত, বর্তমানে 'ঐ মহামানব আসে' গানটি যে আকারে আছে, সেই আকারে তাকে পেলাম।...

১৩৪৮ সালের ২৫ বৈশাখ গুরুদেবের জন্মোৎসব নিয়ে সমস্ত বাংলাদেশ যখন মেতে উঠল, সেই উপলক্ষে কলকাতার একটি কর্তব্য সেরে এসে আমার চট্টগ্রামে আর-একটি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রওনা হবার কথা। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পঁচিশে বৈশাখের দিন এখানে কি হবে। কথাবার্তায় বুঝলাম সেই জন্মদিন উপলক্ষ করে নৃত্যগীত ইত্যাদির আয়োজন হোক এই তাঁর ইচ্ছা। জন্মদিনের আগে একদিন সন্ধ্যায় প্রশ্ন করি, 'উৎসবের সময় 'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে' গানটি কি গাইব?' তাঁর জন্মদিনের গানের কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে আপত্তি করে বললেন, 'তুই বেছে নে, আমার জন্মদিনের গান আমি বেছে দেব কেন।' একটু পরে 'মহামানব আসে' গানটির প্রসঙ্গে অনেক কথা বলে গেলেন। কথার ভাবে বুঝেছিলাম যে, দেশ তাঁকে সম্পূর্ণ চিনল না এই অভিমান তখনো তাঁর মনে রয়েছে। বলেছিলেন, 'আমি যখন চলে যাব তখন বুঝবে দেশের জন্য কি করেছি!' খানিকক্ষণ নীরব হয়ে থেকে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি প্রাণের আবেগে গেয়ে উঠলেন। বুঝলাম দেশ তাঁকে বুঝতে পারে নি এ অভিমান

যতই থাকুক না কেন, দেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁর কোনোদিন কমতে পারে না।

পরের দিন সকালে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনি নিজের জন্মদিন উপলক্ষে কবিতা লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, অথচ একটা গান রচনা করলেন না এটা ঠিক মনে হয় না। এবারের পঁচিশে বৈশাখে সমস্ত দেশ আপনার জন্মোৎসব করবে, এই দিনকে উপলক্ষ করে একটি গান রচনা না হলে জন্মদিনের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না।'

শুনে বললেন, 'তুই আবার এক অদ্ভুত ফরমাস এনে হাজির করলি। আমি নিজের জন্মদিনের গান নিজে রচনা করব, লোকে আমাকে বলবে কি। দেশের লোক এত নির্বোধ নয়, ঠিক করে ফেলবে যে, আমি নিজেকে নিজেই প্রচার করছি। তুই চেষ্টা কর এখানে যাঁরা বড়ো বড়ো কবি আছেন, তাঁদের দিয়ে গান লেখাতে। বলেই তাঁদের নাম বলতে শুরু করলেন। আমি হাসতে লাগলাম, তিনি বললেন, 'কেন তাঁরা কি কবিতা লিখতে পারেন না মনে করিস্?' উত্তরে বললাম, 'আপনি থাকতে অন্যদের কাছে চাইবার কি প্রয়োজন—যখন জন্মদিনের কবিতা লিখেছিলেন, তখন কেউ কি আপনাকে দোষী করেছিল?' রাজী হয়ে জন্মদিনের কবিতাগুলি সব খুঁজে আনতে বললেন দপ্তর থেকে। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির 'হে নূতন দেখা দিক আরবার' অংশটি একটু অদলবদল করে সুর যোজনা করলেন। সেদিন ২৩ বৈশাখ। পরের দিন সকালে পুনরায় গানটি আমার গলায় শুনে শুনে বললেন, 'হ্যাঁ এবার হয়েছে।'

সেদিন একথা ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি এই তাঁর জীবনের সর্বশেষ গান।...

এই জন্মোৎসবের রাত্রে সর্বক্ষণ তিনি নাচগান-অভিনয়ে আনন্দের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বসে ছিলেন।

এখানকার জন্মোৎসব শেষ করে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে ঘুরে এসে শুনলুম গুরুদেব আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি চান যত

তাড়াতাড়ি হোক সংক্ষেপে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করি, কারণ এ অঞ্চলে বর্ষা এ বছর ইতিমধ্যেই বিপুল সমারোহে দেখা দিয়েছিল, তাঁর মনও তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে সকলে জড়ো হবার আগেই বর্ষামঙ্গল করবার অসুবিধা ছিল, তাই মনে করেছিলাম কয়েকদিন অপেক্ষা করে আয়োজন করা যাবে। এর মধ্যেই একদিন সন্ধ্যায় বর্ষার ঘনঘটায় গুরুদেবের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাই কিছু বর্ষার গান তাঁকে শোনালাম। বর্ষার সঙ্গে তাঁর মনের যে কি যোগ ছিল জানি না, কিন্তু বার বার দেখেছি, বর্ষার দিনে তিনি যেরকম চঞ্চল হয়ে উঠতেন সাধারণ মানুষের মধ্যে তা বিরল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বর্ষার গান রচনা করতে তাঁর ইচ্ছা করে কি না! বলেছিলেন, 'ইচ্ছা থাকলেও পেরে উঠব না, গলায় সে শক্তি নেই, ভাবতে পারি না।' এই সময় থেকে তাঁর অসুস্থতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। তবু এত শীঘ্র যে তিনি লোকান্তরিত হবেন আমরা অনেকেই তা কল্পনাও করি নি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায়, আর ফিরলেন না। তখন মনে হল, হয়তো এই জন্যই তিনি বর্ষামঙ্গল করবার জন্যে এত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। অন্তরে মৃত্যুর ডাক শুনেছিলেন নিশ্চয়ই, বুঝেছিলেন এমন বর্ষার ঋতু এবার তাঁর কাছে বৃথাই যাবে যদি না সত্বর আয়োজন হয়— আমরা তাঁর সে ইঙ্গিত ধরতে পারি নি। তাঁর তিরোধানের মাসখানেক পরে যখন বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করলাম, তখন কেবল এই কথাই মনে করেছি, তাঁর ইচ্ছা তখন পূরণ করতে পারি নি, আজ তিনি যে লোকেই থাকুন যেন আমাদের মধ্যে এই বর্ষামঙ্গলের আনন্দে যোগ দেন, এ উৎসব আমরা তাঁর উদ্দেশ্যেই করছি—যদি উৎসব সার্থক হয় বুঝব তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে, আমাদের অর্ঘ্য তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পের ভিতর আমার সব চেয়ে ভালো লাগে 'গুরুদেব-ভাণ্ডারে' কাহিনী। অবশ্য আমার মনে হয়, গল্পটির নাম 'ভাণ্ডারে-গুরুদেব' কাহিনী দিলে ভালো হয়, কারণ কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ভাণ্ডারের (আশ্রমের একজন মারাঠি ছাত্র) একটি সৎকর্মের উপর।

ইস্কুলের মধ্য বিভাগে বিথীকা-ঘরে ভাণ্ডারে সীট পেল। এ ঘরটি এখন আর নেই, তবে ভিতটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারই সমুখ দিয়ে গেছে শালবীথি। তারই এক প্রান্তে লাইব্রেরি, অন্য প্রান্তে দেহলী। গুরুদেব তখন থাকতেন দেহলীতে।

দেহলী থেকে বেরিয়ে, শালবীথি হয়ে গুরুদেব চলেছেন লাইব্রেরির দিকে। পরনে লম্বা জোব্বা, মাথায় কালো টুপি। ভাণ্ডারে দেখামাত্রই ছুটলো তাঁর দিকে। আর সব ছেলেরা অবাক। ছোকরা আশ্রমে এসেছে দশ মিনিট হয় কি না হয়। এরই মধ্যে কাউকে কিছু ভালো-মন্দ না শুধিয়ে ছুটলো গুরুদেবের দিকে!

আড়াল থেকে সবাই দেখলে ভাণ্ডারে গুরুদেবকে কি যেন একটা বললে। গুরুদেব মৃদু হাস্য করলেন। মনে হল যেন অল্প অল্প আপত্তি জানাচ্ছেন। ভাণ্ডারে চাপ দিচ্ছে। শেষটায় ভাণ্ডারে গুরুদেবের হাতে কি একটি গুঁজে দিলে। গুরুদেব আবার মৃদুহাস্য করে জোব্বার নিচে হাত চালিয়ে ভিতরের জেবে সেটি রেখে দিলেন! ভাণ্ডারে এক গাল হেসে....ফিরে এল। প্রণাম না, নমস্কার পর্যন্ত না।

সবাই শুধালে, 'গুরুদেবকে কি দিলি?'

ভাণ্ডারে তার মারাঠি-হিন্দীতে বললে, 'গুরুদেব কোন্? ওহ তো দরবেশ হৈ।'

'বলিস কিরে, ও তো গুরুদেব হায়।'

'ক্যা 'গুরুদেব' 'গুরুদেব' করতা হৈ। হম্ উসকো এক অঠন্নী দিয়া।'

বলে কি? মাথা খারাপ না বদ্ধ পাগল? গুরুদেবকে আধুলি দিয়েছে।

জিজ্ঞেসবাদ করে জানা গেল, দেশ ছাড়ার সময় ভাণ্ডারের ঠাকুর-মা তাকে নাকি উপদেশ দিয়েছেন, সন্ন্যাসী-দরবেশকে দানদক্ষিণা করতে। ভাণ্ডারে তাঁরই কথামত দরবেশকে একটি আধুলি দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, দরবেশ বাবাজী প্রথমটায় একটু আপত্তি জানিয়েছিল বটে, কিন্তু ভাণ্ডারে চালাক ছোকরা, সহজে দমে না, চালাকি নয়, বাবা, একটি পূরী অঠন্নী!

চল্লিশ বছরের কথা। অঠন্নী সামান্য পয়সা, এ-কথা কেউ বলেনি। কিন্তু ভাণ্ডারেকে এটা কিছুতেই বোঝানো গেল না তার দানের পাত্র দরবেশ নয়, স্বয়ং গুরুদেব।

ভাণ্ডারের ভুল ভাঙতে কতদিন লেগেছিল আশ্রম-পুরাণ এ-বিষয়ে নীরব। কিন্তু সেটা এ-স্থলে অবান্তর।

ইতিমধ্যে ভাণ্ডারে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। ছেলেরা অস্থির, মাস্টাররা জ্বালাতন, চতুর্দিকে পরিত্রাহি আর্তরব।

হেডমাস্টার জগদানন্দবাবু এককালে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী সেরেস্তার কাজ করেছিলেন। লেঠেল ঠ্যাঙানো ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তিনি পর্যন্ত সেই দুঁদে ছেলের সামনে হার মেনে গুরুদেবকে জানালেন।

....গুরুদেব ভাণ্ডারেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, ভাণ্ডারে, এ কি কথা শুনি?'

ভাণ্ডারে চুপ।

গুরুদেব....কাতর নয়নে বললেন, 'হ্যাঁরে ভাণ্ডারে, শেষ পর্যন্ত তুই এসব আরম্ভ করলি? তোর মত ভালো ছেলে আমি আজ

পর্যন্ত দেখিনি। আর তুই এখন আরম্ভ করলি এমন সব জিনিস যার জন্য সকলের সামনে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে। মনে আছে, তুই যখন প্রথম এলি তখন কি রকম ভালো ছেলে ছিলি? মনে নেই, তুই দান-খয়রাত পর্যন্ত করতিস? আমাকে পর্যন্ত তুই একটি পুরো আধুলি দিয়েছিলি। আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল গেল কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয়নি। সেই আধুলিটি আমি কত যত্নে তুলে রেখেছি। দেখবি?

* * *

তার দু' এক বৎসরের পর আমি শান্তিনিকেতনে আসি। মারাঠি সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় ভীমরাও শাস্ত্রী তখন সকালবেলার বৈতালিক লীড করতেন। তার কিছুদিন পর শ্রীযুত অনাদি দস্তিদার। তারপর ভাণ্ডারে।

চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে। এখনো যেন দেখতে পাই ছোকরা ভাণ্ডারে বৈতালিকে গাইছে,

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার॥

চতুরঙ্গ ॥

শিশু আসরে রবীন্দ্রনাথ — সুব্রত কর

তেতাল্লিশ বছর আগের কথা। আশ্রম এত বড় ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীও ছিল অল্প। তখন সন্ধ্যে হলেই গুরুদেব ছেলেদের নানা রকম গল্প শোনাতেন। প্রত্যেক দিনই এ রকম সভা বসত। গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে থাকতেন, তাদের খুব ভালোবাসতেন, তাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন তাদের সমস্ত ব্যবস্থা। তাদের পেছনে সারাক্ষণ কোন লোক লেগে থাকত না। ছেলেদের মধ্যেই কেউ হত ক্যাপটেন—ছেলেদের সে চালিয়ে নিত, কেউ দোষ করলে বিচার ছেলেরা নিজেরাই করত, দরকার মতো শাস্তিও দিত। এ বিচারে বড়রা হাত দিতেন না। ক্যাপটেনরাও ছিল তেমনি—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,—কাউকে রেহাই দিত না। প্রকাশ দত্ত ব'লে একজন ক্যাপটেন ছিল। তখন তার বয়স দশ এগারো বছর। একটি ছেলে ছিল খুব অবাধ্য। অনেক বেলা অবধি সে ঘুমোতো, নানা রকম দুষ্টুমি করত। সে ছিল গুরুদেবের আত্মীয়। একদিন সকালে কিছুতেই সে ঘুম থেকে উঠছে না। প্রকাশ গিয়ে ডাকল। তা-ও ওঠে না। যখন একটু জোর করল ছেলেটি রেগে বলল, জানো,—এটা আমার তাঐ-মশায়ের আশ্রম; প্রকাশ দৃঢ়স্বরে বললে—তাহলে তুমি তোমার তাঐ-মশায়ের কাছে গিয়েই থাকো, এখানে আমাদের মধ্যে থেকে ও-সব চলবে না। ছেলেদের কয়টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত—ভদ্রতা, সত্যনিষ্ঠা অর্থাৎ মনের জোর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সেটা ভদ্রতারই অঙ্গ, আর নিজের কাজ নিজে করা।

আশ্রমে নানা রকম গাছপালা ছিল। ছেলেরা প্রত্যেকটি গাছকে যত্ন করত এবং ভালো ক'রে সেই সমস্ত গাছের তথ্য সংগ্রহ করত। কোন্ মাসে কি ফুল হয়, কি ক'রে ফুলের থেকে ফল হয় ইত্যাদি।

শুধু গাছ নয়, পশু-পাখিদের সম্বন্ধেও তারা অনেক খবর জানতো—কোন্ সময়ে কোন্ পাখি ডিম পাড়ে, গায়ের রঙ কি রকম, কি খায়। এ বিষয়ে শুধু পড়া-বিদ্যা ছিল না, প্রকৃতির থেকে তারা জ্ঞান লাভ করত। এখন দেখা যায়, ছেলেমেয়েরা গাছপালা ভাঙে, পশু-পাখি-দের প্রতিও তারা নির্মম—প্রকৃতির সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। ফল-গুলিকে পাকবার সুযোগ দেয় না।

আরেকটি জিনিস ছেলেদের মধ্যে ছিল না সেটা স্বার্থপরতা। কেউ কখনো কোনো ভালো জিনিস নিজে একা ভোগ করত না। বাড়ি থেকে এলে, কেউ একা খেত না, এতটুকু ক'রে পেত, তবু পঞ্চাশ জনে মিলে ভাগ ক'রে খেত। তখন শিশু বিভাগ এত বড় ছিল না। প্রত্যেকেই নিজের জায়গাটি খুব পরিষ্কার রাখত। সন্ধ্যার সময় এক-একদিন ছাত্ররা সকলকে নিমন্ত্রণ করত। খেতে দিত লবাত আর মুড়ি। সভাগুলিকে তারা কী সুন্দর ক'রে সাজাতো। আনত পদ্ম ফুল, কেয়া ফুল,—আরো কত ফুলের রাশি। কী উদ্যম,—কোত্থেকে এ সব আনত, কেউ জানত না।

একবার মহাত্মাজী এই আশ্রমে আসেন। তিনি বললেন—আশ্রমে ঝি-চাকর রাখা উচিত নয়। সব কাজ নিজেদের করতে হবে। রান্না-ঘর থেকে ঝি-চাকরদের বিদায় দেওয়া হল। তিনি ছাত্রদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"কে কে কাজ করতে পারবে, প্রতিজ্ঞা করো!" পৃথিবীতে দু' প্রকার লোক আছে, একদল কেবলি খুব উঁচু গলায় বলে—"হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব।" কিন্তু অনেক সময় কাজের বেলা দেখা যায়, তারাই পড়ে পিছিয়ে। আরেক দল আছে, তারা বলে, "চেষ্টা করব।" তারা প্রাণপণ ক'রে দেখে। এখানেও তাই হল। একদল বললে—প্রতিজ্ঞা করছি। আরেকদল বললে—চেষ্টা করব। দু'টি আলাদা রান্না ঘর হল। শেষ অবধি "চেষ্টা করব" দলের ঘরেই "প্রতিজ্ঞা"র দলের সবাই এসে ঢুকে পড়ল।

ছেলেরা সেই সময় নিজের বাসন মাজত এবং তারা গুরুজনদের বাসনও মেজে দিত। মানা শুনতো না। বাসনগুলি চকচকে ঝক-ঝকে থাকত। নেপালের মহারাজার এক আত্মীয় এখানে ছিল। সেও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মিলে সমস্ত মেজে ঠিক করে রাখত। গুরুজনদের বাসনও সে নিয়ে নিত। সকলেই বিস্মিত হত। সে উত্তর দিত,—"আপনি যে গুরুজন।" বুঝবার জো ছিল না সে এক রাজার বাড়ির লোক। নাম ছিল পুণ্যবজ্র।

আরেকটি ছিল জমিদারের ছেলে। নূতন ভর্তি হল। সঙ্গে একটি চাকর। বড়লোকের ছেলে,—ধূতিটি অবধি পরতে জানত না। চাকরে তাকে পরিয়ে দিত। তিনদিন চাকরটির থাকবার কথা ছিল। যখন সে চলে যাবে, ছেলেটি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল,—"এ ঘন্নুয়া ভাই, তুমি চলে গেলে আমি কি করব।" ছেলেরা জমিদারের ছেলেটিকে শেষে 'ঘন্নুয়া ভাই' বলে ডাকত। তার নাম ছিল জ্যোতিপ্রকাশ মিশ্র। এখানে থাকতে-থাকতে সে সব কাজ শিখেছিল।

কিছুদিন পর আশ্রমে আবার চাকর এল। অবশেষে গান্ধীজির নির্দেশ পালন-প্রথা শুধু একটি দিনে এসে ঠেকল। সেটি হচ্ছে দশই মার্চ। এখনো সেদিনটি আমরা পালন করি। তার নাম হচ্ছে এখানে "গান্ধী-দিবস"। তাই দেখে মণি দত্ত নামক ছেলেটি এই আশ্রম ত্যাগ করল। গান্ধীজির আশ্রম সবরমতি। সেখানে সে রওনা হল। পণ করল এখানে আর থাকবে না। বাড়ি থেকেও এক পয়সা নিলে না। হেঁটে চলল। আজ এখানে কাল ওখানে, কুলিগিরি করল, নয় তো কারো কিছু কাজ করল, যা পেল তাই খেল, খানিকটা হাঁটত, খানিকটা ট্রেণে চলত। এ রকম করেই সে পৌঁছালো গিয়ে গুজরাটে,—দেড় হাজার মাইলের পথ। সেখানে গিয়েও সে কিন্তু দেখল,—গান্ধীজির আশ্রমেও সেবক আছে। তবু সে দমল না। কয় বছর নিজের হাতে রান্না ক'রে সব কাজ ক'রে

সেখানে থাকল। সে কিন্তু শান্তিনিকেতনে ছিল "চেষ্টা করব" দলের,—প্রতিজ্ঞা করার দলের নয়। এদেরই বলে আদর্শবান, সত্যনিষ্ঠ ছেলে।

তখনকার আশ্রমের ছাত্রদের নির্ভীকতার কথা ধরা যাক। একবার তালতোড়ের জঙ্গলে একটা বাঘ বেরিয়েছিল। কয়েকজন শিকারী বাঘটিকে মারবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মারতে পারেনি। ঘায়েল ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল। ছেলেরা খবর পেল, অমনি ক'জন ছাত্র কাউকে না জানিয়ে চলে গেল। সারা জঙ্গল তোলপাড় করলে, বাঘটা মারলে, তবে ছাড়লে।

সারা দিন ছেলেরা কাজ করত, পড়াশুনা ক্লাসেই করানো হয়ে যেত; ছাত্রেরা কেবল ভাবত,—কখন্ সন্ধ্যা হবে, কখন্ গুরুদেব আসবেন। গুরুদেবেরও সব কাজ ফেলে এই শিশুদের সভায় যোগ দেওয়া চাই-ই। বড় বড় নিমন্ত্রণ, সভা,—সব ছেড়েছুড়ে ছুটে আসতেন। কত গল্প বলতেন।

শোনা গেল, একবার তিনি শিলাইদহে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যার ট্রেণে পৌঁছবার কথা ছিল। ট্রেণ মিস্ করে কুষ্টিয়াতে নেমেছেন রাত্রির ট্রেণে; রাতদুপুর; পদ্মার পারে অপেক্ষা করছেন। আশেপাশে কোনো নৌকো নেই। এমন সময় দেখলেন, একটি মাত্র ছোটো নৌকো সেদিকেই আসছে। নৌকোর মাঝি গুরুদেবের চেনা, তাঁর জমিদারির এক পুরাতন প্রজা! বাবুকে সেলাম ক'রে বলল—আসুন কর্তা, আমার নৌকোয়; আপনাকে পৌঁছে দেব; গুরুদেব বললেন—আমার বড় বোটটা কোথায় গেল? সে বলল,—সেটা বোধ হয় আপনাকে না পেয়ে ফিরে গেছে। বিছানাপত্র সে-ই গুছিয়ে দিল। গুরুদেব নৌকায় উঠে শুয়ে পড়লেন। অন্ধকার, ওদিকে দীর্ঘ পথ। সাড়া নেই, শব্দ নেই। মনে হচ্ছে নদীও নিশ্চল। শুধু লগির শব্দ, আর জলের ছপ্ ছপ্,—এই চলছে সমস্ত রাত! মাঝি প্রাণপণ বেয়ে চলেছে। ভোর হয়ে এলো; মুরগীর

ডাক শোনা যেতেই নৌকাটি পাড়ে এসে লাগল। অনুগত প্রজাটি নেমে বললে—বাবু, একটু আসছি।—এই ব'লে সেই যে সে গেল আর ফেরার নাম নেই! গুরুদেব নৌকোয় বসেই আছেন। বেলা হল; লোকজন এল। ঐ ছোটো নৌকোয় গুরুদেবকে বসে থাকতে দেখে সকলে তো অবাক,—কী ক'রে তিনি এখানে এলেন। রাত্রে তো ঘাটে কোনো নৌকো ছিল না। গুরুদেব বললেন, কেন? তাঁর সেই প্রজাটিই তো সারারাত নৌকো বেয়ে নদী পার করে দিয়েছে। কিন্তু সে 'আসছি' ব'লে গেল কোথায়! গুরুদেবের মুখে লোকটির নাম শুনে তো সবার চক্ষুস্থির। সে যে ক'মাস আগে মারা গেছে! গুরুদেব চম্‌কে উঠলেন, সে কি কথা! অন্য নৌকোর ব্যবস্থা হল। গুরুদেব তাতে গিয়ে চড়ে বসলেন। পিছন ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখেন—সে কী! কোথায় গেল সেই ছোটো নৌকোটি!

এ গল্পের কতটা সত্যি, আর, কতটা গুরুদেবের নিজের বানানো,—তিনিই জানেন, কিন্তু গল্প শুনে সকলের গা ছম্‌ছম্ করতো। শুধু শুধু ভূতপ্রেত নয়, বাঘ-ভাল্লুক নানা বিষয়ের গল্পই তিনি শোনাতেন। আবার, নিজে কেবল ব'লে যেতেন না, মাঝে মাঝে ছেলেদের দিয়ে বলিয়েও নিতেন।

গল্প-বলা ছাড়াও গুরুদেব নিজের রচিত নাটক, গল্প প্রভৃতি শিশুদের পড়ে শোনাতেন। মাঝে মাঝে তাদের দিয়ে সেই সব নাটক অভিনয় করাতেন। 'শারদোৎসব' নাটকের গানগুলি তিনি প্রথমে আলাদা আলাদা করে লেখেন। ছাত্রদের তাগিদেই শেষটা সেগুলি তিনি একদিনে একত্র করে নাটক লিখে ফেললেন।

ইংরেজরা তখন ভারতের পশ্চিম সীমান্তের কোনো এক স্থলে বোমা ফেলছিল। তাতে তাদের খুব নিন্দা হয়। গুরুদেব ঘটনাটি পড়েছিলেন। একদিন তিনি গল্প করে বললেন,—ওরা নিজেরা যে দোষে দোষী তাই নিয়ে ওরাই আবার পরের নিন্দে করে বেড়ায়!

তখন যিনি গল্প শুনছিলেন, তিনি একটু হেসে বললেন, ঠিকই বলেছেন গুরুদেব, অত্যাচারী পৃথিবীর সকল জাতই। দোষ সকলেই করে, কিন্তু দোষ দিয়ে বেড়ায় যে-দুর্ভাগ্য তাকেই। পূর্ব-বঙ্গে কথায় বলে,—

সকল পক্ষী মৎস্য-ভক্ষী
শুধু মৎস্যরাঙ্গা কলঙ্কিনী?

গুরুদেব শুনে বললেন, বাঃ, ছড়াটিতো খুব লাগসই! তবে ছন্দটা একটু ঠিক করে নিলেই তো আরো সুন্দর হয়। এই বলে তিনি মুখে মুখেই বলে গেলেন, পংক্তিটা হবে এই:

সকল পক্ষী মৎস্য-ভক্ষী
শুধু মৎস্যরাঙ্গা কলঙ্কিনী।

শ্রোতা তখন কবিকে অনুরোধ করলেন, বাকি পংক্তিটা পূরিয়ে দিতে। কবি অনুরোধ রাখলেন। পরিপূরক পংক্তিটির পিছনে একটু ঘটনা আছে। লোকে যায় বড়লোকদের কাছে অটোগ্রাফ নিতে। কলম ফেলে রেখে চলে আসে তাদের অনেকেই। তখন গুরুদেবের কাছেও ছিল অটোগ্রাফের ভিড়। কলম রেখেও কেউ-কেউ চলে যেত। তিনি খোঁজ ক'রে ক'রে মালিককে তা ফিরিয়ে দিতেন। সেদিন রহস্য ক'রে ছড়ায় এই বিষয়টিই বসিয়ে দিলেন। প্রথম লাইনে ছিল:

সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী,
শুধু মৎস্যরাঙ্গা কলঙ্কিনী.

মিল ক'রে দ্বিতীয় লাইনটি জুড়লেন:

সবাই কলম ধার করে নেন্,
আমি ক্যান্ বা কলম কিনি।

মৃত্যুর অল্প ক'দিন আগেও, শিশুদের নাম তিনি ছোট ছোট ছড়ার ভিতরে বসিয়ে রাখতেন। একবার ছেলেরা 'সৈনিক' নামে একটি হিন্দি পত্রিকা তাঁর কাছে নিয়ে যায়। এই পত্রিকার নাম

মিলিয়ে একটা কবিতার জন্য ; তারা গুরুদেবকে বলল, তিনি তখনি বলে গেলেন :

যদি পারো দৈনিক
চা খেও চৈনিক,—
আর, গায়ে যদি জোর পাও
হয়ো তবে সৈনিক।
জাপানীরা আসে যদি
চিঁড়ে নিক, দই নিক,
আর, যত পারে আধুনিক কবিতার বই নিক।

'সৈনিক' পত্রিকাটি যে ছেলেটি এনেছিলেন, তিনি ছিলেন কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্তের আত্মীয়।—অর্থাৎ অ-বাঙালী।

গুরুদেব নিজের ছেলেবেলায় বৃদ্ধাদের মুখে গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি শিশুদেরও নিজেদের ঠানদিদি, দিদিমার গল্প শুনতে বলতেন। তাদের মুখে গল্প শুনে আরাম আছে।

শান্তিনিকেতনের 'ঠাকুর্দা'-র মুখে গুরুদেবের এমনি-সব গল্প আমরা শুনেছিলাম এক সান্ধ্যবিনোদন পর্বে,—সেটি ছিল গুরুদেবের প্রয়াণ সপ্তাহ,—শিশু বিভাগের আসর। ১৩৫৮ সন। শান্তিনিকেতনে আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মশায়কে অনেকে 'ঠাকুর্দা' বলে ডাকে। গুরুদেবের 'শারদোৎসবে'র অভিনয়ে প্রথমবার ঠাকুর্দার ভূমিকায় অভিনয় তিনিই করেছিলেন। প্রবন্ধে-বর্ণিত ইংরেজদের গল্পের ক্ষেত্রে শ্রোতা-ব্যক্তিটি ছিলেন ক্ষিতি-দাদু নিজেই।

গুরুদেব যে সন্ধ্যাবেলা কেমনভাবে এবং কেন ছেলেদের গল্প শোনাতেন সে কথা তাঁর নিজের ভাষণেই বলা আছে 'বিশ্বভারতী' নামক গ্রন্থে—'তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি মাস্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।'

আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য করুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা ক'রে পাঁচ-সাত দিন ধ'রে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম, তখন মুখে মুখে গল্প তৈরি করবার আমার শক্তি ছিল। এই সব বানানো গল্পের অনেকগুলি আমার 'গল্পগুচ্ছে' স্থান পেয়েছে। এমনিভাবে ছেলেমেয়েদের মন যাতে অভিনয়ে, গল্পে, গানে, রামায়ণ, মহাভারত পাঠে সরস হয়ে উঠে, তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এমনিভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচ্যুড তৈরি ক'রে তোলা খুব বড়ো কথা।'

যুগান্তর। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৮ ॥

আপন মনে লিখছেন। লিখতে লিখতে ভাবছেন। ভাবনায় পড়ল বাধা তাঁর। কলম থামলো হঠাৎ—কানে এলো আচমকা কার জিজ্ঞাসা: 'মশায়, ঈশ্বরকে দেখেছেন?'

তাকালেন তিনি মুখ তুলে। নীরব রইলেন প্রথমটা। শেষে উত্তরে বললেন,—'না, দেখিনি!'

লোকটি বলল,—'আমি দেখেছি।'

তিনি শুধোলেন,—'কেমন দেখতে?'

উত্তর হল,—'চোখের সম্মুখে বিজবিজ করেন।'

তিনি হাসেন মনে মনে। এমন নির্বোধ, এমন অদ্ভুত। আচ্ছা পাগল জুটেছে এসে। উত্তরে চাই তত্ত্বকথা। কিন্তু এ লোকটা তার বুঝবে কি? মনে তবু কথা ওঠে—আর মুখে চেপে যান তিনি। তাঁর যে অবকাশ নেই। কবি মানুষ। ভাবে মন লেগে থাকে জোঁকের মতো। লেখার ঝোঁক বেড়েছে এখন। এমন সময় বিষম বাধা—অদ্ভুত এক প্রশ্ন:—

'মশায়, ঈশ্বরকে দেখেছেন?'

ভালো লাগে না বাজে প্রসঙ্গ। সইতে পারেন না অন্য সঙ্গ। একেবারে একলা থাকতে চান! তবু মনে বাজে আবার—আহা বেচারী ভালোমানুষ! বলতে পারেন না সোজাসুজি—'সরে পড়ো ভাই।' নষ্ট হয় দিনের সোয়াস্তিটাই।

ভুলে যেতে চান এই কথাটা। এই ঘটনাকে মুছে ফেলতে চান তিনি মন থেকে। তবু ফিরে ফিরে ওঠে মনে সেই কথাটা—ঘুরে ঘুরে আসে সেই লোকটা—একবার, দু'বার, কয়েকবার!

দিন যায়। রাত্রি যায়। মাস পোরে। বছর ঘোরে। উড়ে

আসে হঠাৎ কখন একটি কথা—সেই যে লোকটা বলেছিল,—“চোখের সম্মুখে বিজবিজ করেন।”

কাজ করে যান নিজের নিয়মে। ভাবেন। লেখেন। পড়াশুনো করেন। ফাঁকে ফাঁকে এসে কে যেন তাঁকে ডাকে। চঞ্চল হয়ে ওঠে তাঁর শ্রবণে মনে—“মশায় ঈশ্বরকে দেখেছেন ?”

চেষ্টা করেন না—তবু এ জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা চলে অন্তরে অন্তরে সারাক্ষণ।

এই কলকাতাতেই। সে দিনের সদর ষ্ট্রীটে রাত পোহায়।

প্রভাতের হাতছানিতে বেরিয়ে আসেন কবি। দাঁড়ান এসে বারান্দায়—দশ নম্বরের বাড়িতে। দাঁড়িয়ে থেকে তাকান তিনি বহুদূরে। পথের রেখা ধরে দৃষ্টি ধেয়ে যায় দিগন্তে।

দৃষ্টি বাধা পায় ফ্রি স্কুলের বাগানে। কবি চমকে ওঠেন হঠাৎ।

নূতন সূর্যের রাঙা ইশারা! ঝলমল করে কি যেন মনে। পাতার আড়ালে ফুলের নাচন। বাধা ঠেলে ঠেলে মুক্তি। আলোর কলরোল কালোর কোলে কোলে। অপরূপ এক সোনার ঝরনায় উপচে পড়ছে পৃথিবীর প্রীতি।

এর আগে ? এমনি কত সকাল এসেছে বাঁধা নিয়মে। সূর্য উঠেছে প্রতিদিনের ধারায়। আজ কি তারা কেউ নেই ? এ যেন অন্য কোন অনন্যর যাদু! কবির মন বলছে—এ আলো নূতন, এ আলো প্রথম, এ আলো সবসেরা, সর্বোত্তম।

যেন একটা পর্দা ছিল চোখের মণিকে ঢেকে। ছিল কাজলের মায়াবী চশমা নাকের ডগায়। চশমা ভাঙলো। পর্দা ঘুচলো—একটি অপূর্ব মুহূর্তের আঘাতে। চৈতন্য এলো চিত্ত থেকে। যে আসেনি সারাজীবনে, সে এসেছে এইক্ষণে।

একেবারে আরেক রকম এই জগৎটা। যতদূর দৃষ্টি যায়, যতখানি মনে পাওয়া যায়। কিছু নেই আর মন্দ, অসুন্দর, জীর্ণজরা। অমৃতসায়রে ডুব দিয়ে উঠেছে এই মর্ত্যলোকে—আনন্দে নন্দিত এক

নব বৃন্দাবনে। এক অকল্পিত লীলাসমুদ্রে অফুরাণ, প্রাণ ছড়ানো তরঙ্গে তরঙ্গে।

আজ সব আলোময়। অন্ধকার হারিয়েছে পথ। আতস কাচে পড়েছে সূর্যকিরণ। ঝরনায় ঝরছে রঙের ফুলকি। নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙ্গে এসেছে নবজন্মের ঘোষণা। কবির—'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।'

তারপর? সারাজীবন ধরে চলে এই জাগরণেরই গান। গানের সুরে সুরে ঘুরে আসে একটি শুভক্ষণ। গতি মিলিয়ে চলে পৃথিবীর গতির সঙ্গে।

পর হয় আপন। দূর হয় নিকট। অপ্রিয় প্রিয় হয়। কেউ থাকে না অপরিচিত। কিছু থাকে না অনাস্বাদিত। এমনি অপূর্ব এই উত্তরণের স্মরণীয় ক্ষণটি। আবার কবির কানে আসে,—"মশায় ঈশ্বরকে দেখেছেন?"

ঠিক দুপুরবেলা সেদিন। এসেছে সেই লোকটি আবার। মন আজ খুশি হয়ে উঠলো কবির। আলোকিত হয়ে উঠলেন তিনি অসীম বিশ্বাসে।

আজ সেই লোকটির আগমন অবাঞ্ছিত নয়। সোজা হয়েছে যে তাঁর সকল ভাবনা। কোথাও আর অন্ধকার নেই। অস্পষ্টতা নেই।

আর মন বিষিয়ে ওঠে না সেই লোকটিকে দেখে। আগ্রহ নিয়ে আজ তাকেই অভ্যর্থনা করে বলেন,—'এসো, এসো!'

যাকে ভেবেছিলেন নির্বোধ, যে ছিল সেদিন অদ্ভুত ক্ষ্যাপাটে—সে-ই হয়েছে আজ আশ্চর্য সুন্দর। তার কিন্তু আগের মতোই বেশভূষা—আগের মতোই মুখের ভাষা—এতটুকু বদলায়নি কিছু। তবু তাকে ডাকছেন অন্তর দিয়ে,—'এসো এসো!'

দৃষ্টি বদলেছে কবির। একটি মুহূর্তে অপূর্ব দীপ্তি পেয়েছেন তিনি জানি কোন্ অমৃতলোকের।

সত্যে পৌঁছলেন কবি স্বপ্নের সীমানা ছাড়িয়ে। দেখলেন,—

বন্ধুকে পেয়ে বন্ধু হাসে। মাকে সন্তান ভালোবাসে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পশুরাও আদর জানায় পরস্পরে।

এই মুহূর্তের মনের অবস্থা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন কবিতায়ঃ

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

এইখানেই শেষ হয় না দেখা, শেষ হয় না তাঁর কবিতা লেখা। তারপর দেখেছেন জীবনভর, লিখেছেন অজস্র। এর মধ্যেই কখনও কখনও সেই মুহূর্তটিকে স্মরণ করেছেন এই বলেঃ

"ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই
ভাইকে দেখিতে পায় যে আলোকে ভাই।"

এই আলোকের প্রথম দর্শনের ক্ষণটি থেকেই কবি রবীন্দ্রনাথ হলেন বিশ্বকবি।

আনন্দবাজার পত্রিকা। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০॥

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

বালকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তাই আজিকার বঙ্গসাহিত্যের বিশিষ্ট চিন্তাশীল, সুনিপুণ সুরসিক সাহিত্যিক শ্রীমান প্রমথনাথ বিশী যখন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের মাত্র বালকছাত্র, তখন তাঁহাকেও রবীন্দ্রনাথ ব্রাউনিং-এর কাব্য-কবিতা পাঠ সম্বন্ধীয় তাঁহার ক্লাসে যোগ দিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। সুযোগ দিয়াছিলেন বলিলে কম বলা হয়। বেশ ভাল করিয়াই ইংরাজী সাহিত্য বুঝাইতেন। যাঁহারা ঐ ক্লাসে উপস্থিত থাকিতেন তাঁহাদের কাহাকেও তিনি কৃপা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। প্রমথনাথ তখন বয়সে ছিলেন কাঁচা কিন্তু চিন্তায়, বিদ্যার্জন-সাধনায় ছিলেন পাকা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, জহুরী। প্রমথনাথের মধ্যে যে ভবিষ্যতের প্রতিভাবান লেখকটি ছিল তখনই রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্য প্রমথনাথকে স্নেহ করিতেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথের বালকসুলভ সেই সময়কার একটা মজার ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। ঘটনাটি এই,—

অঙ্কের প্রশ্নপত্রের পরীক্ষার সময় উত্তর না দিয়া কিংবা ভুল জবাব দিয়া তাহার সমর্থনে প্রমথনাথ একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন। আর কী দুঃসাহস, প্রমথনাথ অসংকোচে সেই খাতাটি পরীক্ষক মহাশয়ের কাছে দিয়া আসিলেন। এই ব্যাপারে প্রথম বিপদ ঘটিল আমার। যে ডরমেটারিতে বা ঘরে প্রমথ থাকিতেন সে ঘরের গৃহাধ্যক্ষ ছিলাম আমি। আজ আমার বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন আমিও যুবক এবং যুবকবয়সোচিত অনেক কিছু দুঃসাহসিক কাজ করিবার সুখ্যাতি এবং কুখ্যাতিও অর্জন করিয়াছিলাম। যেমন বাঘের মাংস ভক্ষণ করা ইত্যাদি। পরীক্ষক মহাশয়

তো প্রথমেই আমার উপরে একচোট উষ্মা প্রকাশ করিলেন। আমার মত দুরন্ত যুবকের ঘরে ছিল বলিয়াই প্রমথর অমন দুঃসাহস। আমি তাহার এই কাজের প্রেরণাদায়ক ইত্যাদি বলিয়া তো তিনি বেশ একচোট আমাকে ধমকাইয়া ঐ প্রশ্নপত্র আমাকে দিয়া বলিলেন—"বিশীর কাণ্ড দেখ। এ ছেলের কিছু হবে না।" বিনা তর্কে বকুনি সহ্য করিলাম। কারণ ছাত্রাবস্থায় কয়েকদিন তাঁহার কাছে বাংলা পড়িয়াছিলাম। তখন বেতন পাই সম্ভবত পনের টাকা। খাওয়া-দাওয়ার জন্য কিছুই দিতে হইত না। বড় সুখের চাকুরী। এ-চাকুরী গেলে বিপদে পড়িব এই ভয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। শেষটায় মুশকিল-আসানের পথ বাহির করিলাম। সোজা রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হইয়া নিজের বিপদের কথা এবং প্রমথরও কি হইতে পারে সে-কথাও তাঁহার কাছে অসংকোচে নিবেদন করিলাম। কবিতাটির চন্দ-বন্দ ঠিক স্মরণ নাই তবে বক্তব্য বেশ মনে আছে। প্রমথ লিখিয়াছিলেন, পরীক্ষক মহাশয়ের উদ্দেশে—

তোমার শরণাগত নহি সতত
শুধু পরীক্ষার সময়
দয়া করি কিছু মার্ক দিওগো আমায়।
ওগো মাস্টারমশায়,
পরীক্ষার সময় পড়ি তোমার পায়।"

কবিতাটি বেশ দীর্ঘ ছিল। সব কি আর এত দিনে মনে থাকে। ছাত্র-শিক্ষকে এরকম মজার মজার ঘটনা তখন কতই হইত। কে জানিত যে, আজকের দিনে, রবীন্দ্রনাথ আর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে লোকের সব কিছু জানিবার এমন আগ্রহ হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে অঙ্কের প্রশ্নপত্রের উত্তরে প্রমথনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা দিলাম। রবীন্দ্রনাথ উহা পাঠ করিয়া বেশ মজা পাইলেন। বলিলেন—"ভয় নেই! নগেনকে (নগেন্দ্রনাথ

আইচ তখন শিক্ষকদের মধ্যে বেশ একজন নামকরা ব্যক্তি ছিলেন) বুঝিয়ে বলব, বিশী যা লিখেছে, ঠিকই লিখেছে। তুই যা, নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়া।"

নিশ্চিন্ত হইলাম বটে। কিন্তু নগেনবাবুকে রবীন্দ্রনাথ কি বলেন তাহাও শুনিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক বুদ্ধি খাটাইলাম। নিজেই গিয়া নগেনবাবুকে বলিলাম—"মাস্টারমশায়, গুরুদেবের সঙ্গে একবার দেখা করবেন। বিশীর সেই কবিতা গুরুদেবকে দিয়েছি।" আমার কথা শুনিয়া নগেনবাবু চটিলেন অথবা খুশী হইলেন বুঝিতে পারিলাম না।

নগেনবাবুর সহিত রবীন্দ্রনাথের দেখা হইতেই তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলিলেন—'অঙ্কের জবাব দেয়নি। পারেনি বলেই দেয়নি। কিন্তু যা লিখেছে তাতে ওর সত্যনিষ্ঠার এবং প্রয়োজনীয় নম্রতার প্রমাণ আছে। রাগ কোরো না। এ দোষ ক্ষমা করো। কবিতার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবই খাঁটি সত্যি কথা। সে সতত তোমার শরণাগত যে নয় তাও নির্ভয়ে অথচ নম্রভাবে বলেছে। ঠিক উত্তর দিলে তো পা ধরাধরি করে নম্বর চাইত না। উত্তর হয়ত ঠিক হয়নি ভেবেই তোমার দয়া ভিক্ষা করে কিছু মার্ক চেয়েছে।' পরে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রমথকে কিছু বলিয়াছিলেন কিনা তাহা জানি না। তবে এইটুকু বেশ টের পাইয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথের ঐ কবিতা বেশ উপভোগ করিয়াছিলেন।

প্রমথনাথের সম্বন্ধে এই স্মৃতি প্রসঙ্গে আর একটি মজার ঘটনা বলি। শান্তিনিকেতনের শালবীথিকার দক্ষিণাংশে তখনকার দিনের "নতুন বাড়ি"র (বর্তমান "দেহলি"র) কাছ থেকে খড়ে-ছাওয়া "বীথিকা-গৃহ" নামে একটি বেশ লম্বা ঘর ছিল। ঐ ঘরে দুই সারিতে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী চুন-সুরকী-ইটে তৈরী স্থিতিশীল খাট ছিল। ঐ খাটে ঐ ঘরের ছেলেরা শয়ন করিত। কিছু দিন প্রমথনাথ ঐ ঘরে ছিলেন। আমি তখন ঐ ঘরের গৃহাধ্যক্ষ।

শিক্ষকরা ছেলেদের সায়েস্তা করার জন্য মারধোর করেন এটা রবীন্দ্রনাথ মোটেই পছন্দ করিতেন না। সেইজন্য দুষ্টু ছেলেদের দুষ্টামি করিবার সাহসের অভাব ছিল না। কিন্তু যাহাকে বলে সত্যিকার "প্রহার", সে রকম প্রহার কোনো ছাত্রের ভাগ্যে না জুটিলেও দু-একটি ডানপিটে কিংবা লিখা-পড়ায় ফাঁকিবাজ ছেলেদের যে সামান্য ওজনের কিল, কিম্বা একটু মোলায়েম চড়-চাপড় না খাইতে হইত এমন নয়। কিন্তু তাহা ছেলেরা গ্রাহ্য করিত না। তাহার প্রধান কারণ, "প্রহার"গুলো ছিল নামেই প্রহার, ঠিক প্রহার নয়। একদিন রবীন্দ্রনাথ একদল ছেলেকে উপদেশ দিলেন যাহার মর্ম হইতেছে—"তোমরা আনন্দ করবে। সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বেড়াতে যাবে....পারুল বনে বেড়াতে যাবে। বনের মধ্যে ছুটাছুটি করবে। তারপর সেখানে পূর্বদিগন্তের প্রথম সূর্যোদয় দেখে বেশ হৈ-চৈ করে আশ্রমে ফিরবে।" রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের সহিত একত্রে বসিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া বেশ গল্প-স্বল্প করিতেন মাঝে মাঝে। সকলেই সেদিন রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া খুব খুশী। যাহার যেমন বয়স সে তেমনি প্রশ্ন করে, রবীন্দ্রনাথও জবাব দেন। হঠাৎ বেশ একটু মুচকি হাসিয়া আমার দিকে আড় চোখে চাহিয়া প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন, "গুরুদেব আপনি তো বল্লেন তোমরা পারুল বনে সকলে গিয়ে সূর্যোদয় দেখ্‌বে। কিন্তু সূর্যোদয় দেখে আশ্রমে ঠিক সময় মত ফিরতে দেরী হ'য়ে গেলে আমাদের পিঠে সুধাকান্তদার কিলোদয় যখন হবে তখন কে সামলাবে।" প্রমথনাথের কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, এমন কি রবীন্দ্রনাথও। পরে রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়া-ছিলেন—'কিলচড় মারিস নাকি ? ছেলেরা তো তোকে বেশ ভালও বাসে। তা যাই করিস বাপু মারধোর করিস না। সূর্য দেখার আনন্দ-ভোজে যোগ দিলে' যদি দু-এক দিন তোদের ক্লাসের শিক্ষা-দানের বাঁধা সময়ের থেকে কিছু সময় বাদ যায় তাতে ছেলেদের

কোনই ক্ষতি হবে না, বরং প্রকৃতির কোলে যেদিন সূর্য দেখার, চাঁদ ওঠার যতটুকু আনন্দ পাবে তাতে ওদের লাভ-ই বেশি হবে।”

এই প্রসঙ্গে আমাকে লেখা অনেকদিন আগেকার একটি চিঠির নকল পাঠকদের উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। কোনো এক বাদলা দিনে শান্তিনিকেতনের “বেণুকুঞ্জে”র সামনে একদল ছাত্রকে পড়াইতেছিলাম তাহাদের পাঠ্যপুস্তকের একটি বিষয়। সমস্ত প্রান্তরে আকাশের মেঘ যেন নামিয়া আসিতেছিল। বৃষ্টি নাই। কিন্তু জোলোবাতাস বহিতেছে। আশেপাশের গাছে গাছে ডাল-পালায় মেঘাড়ম্বরকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আলোড়ন শুরু হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি যেন আসন্ন। ক্লাসে কি আর ছেলেদের মন বসে? কিছুতেই উহারা পড়ায় মন দিতে পারিতেছে না। জোর করিয়া তাহাদের মনবিহঙ্গকে যেন ক্লাসের খাঁচার মধ্যে ধরিয়া রাখার মত অবস্থা। বলিলাম—যাও তোমরা বই-টই ঘরে রেখে মাঠে ছুটোছুটি কর। পড়ায় যখন মন-ই নেই, খামকা ক্লাসে থাকা কেন।

ছুটি তো দিলাম ছেলেদের। ছেলেরাও তো হৈ-চৈ করিয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। আমারও ইচ্ছা হইতেছিল উহাদের সহিত ছুটোছুটি করি। কিন্তু ভয় হইল। একে তো ক্লাসের সময় ছেলেদের ছুটি দিলাম, তাহার উপর যদি উহাদের সঙ্গে ছুটিয়া মাঠে দৌড়াদৌড়ি করি তাহা হইলে বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে বকুনি ত খাইবই, শেষটায় চাকুরী না যায়। ভাগ্যিস ছেলেদের সহিত গিয়া জুটি নাই। কিছুক্ষণ পরেই দেখি জগদানন্দবাবু (রায় সাহেব জগদানন্দ রায়) আমার দিকে আসিতেছেন। আমার প্রাণ তখন প্রায় খাঁচা ছাড়া হইবার উপক্রম। কাছে আসিয়াই মাস্টার মহাশয় বলিলেন, ‘ভাল লোককেই বাবুমশায় (জগদানন্দবাবু এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুরের জমিদারীতে কাজ করিতেন। সেই সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথকে তিনি বাবুমশায় বলিতেন।) ছাত্র

পড়াবার ভার দিয়েছেন। নিজে তো পড়াশোনার ধার ধারে না। ছেলেদের মাথা খাবার চেষ্টায় আছে।' তাহার পরই একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'ক্লাসে থেকেই বা কি হত। এইরকম দিনে বাইরে কি ক্লাস করা চলে। বৃষ্টিতো এল বলে। ছোঁড়াগুলো জলে ভিজে যেন না বেড়ায়, সেদিকে বাপু নজর রেখো।'

আমি জগদানন্দবাবুর কথায় অনেকটা ভরসা পাইলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। ভাবিলাম নিম্ন আদালতের মনোভাব যদি (অর্থাৎ জগদাবাবুর সদয় ভাব) বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে ফ্যাসাদে পড়িতে পারি। সুতরাং হাইকোর্টে একটা জানান দিয়া রাখা ভাল। অর্থাৎ কিনা এই যে ক্লাসে ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল, তাহার সঠিক কারণটাই বেশ খোলাখুলি-ভাবে রবীন্দ্রনাথকে পত্র দ্বারা জানাইয়া রাখা ভাল। কৈফিয়ৎ তলব করিবার আগেই কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠাইলাম কবিকে। মনে ছিল এ-সংবাদে রবীন্দ্রনাথ খুশীই হইবেন, কেননা তিনি ছেলেদের খুবই ভালবাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন। যথাসময় উত্তর পাইলাম। তখন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদায় তাঁর কুঠিবাড়িতে ছিলেন। যে উত্তর দিলেন, তাহা এই :

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দ হল। পেয়ালাভরে তোমরা প্রকৃতির সুধার ঝরণা থেকে সুধা পান কর। একদিনও তোমাদের আনন্দ ভোজের কামাই না যাক। সেদিন যে ছেলেদের ক্লাসের বেড়া টপাটপ ডিঙিয়ে দৌড় দিতে দিয়েছিলে, সে খুব ভালো করেছিলে। আনন্দনিকেতনের আনাগোনার রাস্তাটা তাদের খুব করে চেনাশোনা হয়ে যাক। মক্কা-মদিনা, কামস্কাটকা, কোচিন, পাটাগোনিয়ার ঠিকানা তারা যখন হয় জেনে নেবে, কিন্তু বিশ্বলক্ষ্মীর স্নেহকোলের ঠিকানাটা যদি এই বয়সে খুঁজে না পায়, তবে যেদিন মস্ত পণ্ডিত হয়ে আমার মত চোখে চশমা লাগাবে, সেদিন আর কোন আশ

থাকবে না। আর সকল শক্তির চেয়ে খুশী হয়ে ওঠবার শক্তিটা ওদের যেন পুরোপুরি ফুটে উঠতে পায়—আমার এইসব ছেলেরা যেন আকাশের আলোর সঙ্গে তাদের হাসি মেলাতে জানে এবং নব-বর্ষার সঙ্গে যেন তারা হৃদয়ের সুর মিলিয়ে 'মেঘমল্লারে' নেচে উঠতে পারে। ওরা অশোক হোক, বীর হোক এবং সহজ আনন্দে ভরপুর হোক, ইতি ২৫ মাঘ, ১৩২১

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার প্রচলিত আয়োজন উপকরণের সঙ্গে প্রাকৃতিক সহজ সুন্দর ও সরল পরিবেশটি সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছাত্রেরা অল্প বয়সে পুঁথিগত শিক্ষাকে যাহাতে আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারে, সেই চেষ্টা তাঁহার ছিল। ছাত্রেরা দেহে মনে সবল হোক, সুস্থ হোক এই চিন্তাও তাঁহার মধ্যে সর্বক্ষণ সজাগ ছিল।

বিলাসিতা, ফ্যাশানপ্রিয়তাকে রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করিতেন না। এই শান্তিনিকেতনে এমনও এক সময় ছিল, যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জমিদারী হইতে ভাল ভাল লেঠেল আনাইয়া ছাত্র ও শিক্ষকদের লাঠি খেলা শিক্ষাদানের এবং জাপান হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে জুজুৎসুর কুশলী শিক্ষক আনাইয়া ছাত্র ও শিক্ষকদের জুজুৎসু ব্যায়াম শিক্ষার সুযোগ দিয়াছিলেন। বর্তমান সিংহসদনে দেওয়া হইত জুজুৎসু শিক্ষা আর সিংহসদন ও প্রাক্‌কুটীরের মধ্যবর্তী অঙ্গনে শেখান হইত লাঠি খেলা। কেবল কি এই। ৺পুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের ড্যাগার ছুরি খেলাও শেখান হইত। একটি গোপন দল গঠন করা হইয়াছিল কয়েকটি ছাত্রকে লইয়া। ঐ দলের নাম ছিল 'অভয়ব্রতী'। 'অভয়ব্রতী'দের নেতা করা হইল শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র রায়চৌধুরীকে। ৺বঙ্কিমচন্দ্র রায়ও

(তৎকালের অঙ্কের শিক্ষক) ঐ দলের অন্তর্গত হইলেন। উভয়েই বরিশালের লোক। এই সময় আশ্রমে পূর্ববঙ্গের কায়েত, বদ্যি, ব্রাহ্মণের প্রভাব বেশ ছিল। এই "অভয়ব্রতী"দের একটা বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভয়হীনতা চর্চার জন্য মাঝে মাঝে রাত্রে আশ্রমের প্রান্তরে, শ্মশানে, কবর স্থানের কাছাকাছি যাইতে হইত, কখনো একা, কখনো সঙ্গে দুইজন, কখনো একজন। পাছে এই সাধনায় কেহ ভয় পাইয়া একটা কিছু বিপদ বাধাইয়া বসে, সেই জন্য নেতাদের মধ্যে অর্থাৎ ভূপেশবাবু ও বঙ্কিমবাবুদের মধ্যে একজনকে গোপনে ঐসব ছেলেদের কাছাকাছি থাকিতে হইত। সঙ্গে থাকিত নিভান লণ্ঠন। এই 'অভয়ব্রতী'রা রাজনৈতিক কোনো কাজের মধ্যেই থাকিত না, কিংবা বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্যও কোনরকমের অ্যানারকিজম চর্চা করিত না। কিন্তু বৃটিশ রাজের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের নজর আশ্রমের উপর জাগ্রত ছিল। ঐ বিভাগের দ্বারা যাঁহাদের চিঠিপত্র পাঠ করা হইত, তাঁহাদের নামের ভিন্ন ভিন্ন নম্বর থাকিত। রবীন্দ্রনাথ খোঁজ পাইয়াছিলেন যে, ঐরূপ আসামীদের মধ্যে তিনি নিজে ছিলেন ১৩ নম্বরের আসামী। এই ১৩ নম্বর লইয়া রবীন্দ্রনাথ কতবার কত চিঠি খোলার গল্প করিয়াছেন কত লোকের কাছে। একবার ডিটেকটিভ অতি-সতর্কতার জন্য অন্য আর এক নম্বরের আসামীর চিঠি পাঠ করার পর পুনরায় সেই চিঠিটা সেই নম্বরের নামের খামের মধ্যে না ভরিয়া ভরিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের নামের খামের মধ্যে। এইরূপ কয়েকটি কাণ্ড ঘটায় রবীন্দ্রনাথ কেন এইরকম হয়, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, আই. বি. হইতে তাঁহার চিঠি খোলা হয়, ইন্টারসেপ্ট করা হয় অর্থাৎ গাপ করা হয়। তবে একথাও সত্য যে, ঐ সময় আশ্রমে উৎকট সরকারদ্রোহীদের আনাগোনা, গোপনে এবং প্রকাশ্যে হইত। বেশ মনে পড়ে ৺বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয় এক সময় বীরভূমের লাভপুরে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার দুই

পুত্র শ্রীমান সুশীল মজুমদার ও ননী মজুমদার তখন আশ্রমের ছাত্র, থাকিত বীথিকা গৃহে। কতদিন বসন্তবাবু, গোয়েন্দার চোখে ধূলা দিয়া কিংবা ঐ বিভাগীয় পুলিসের সহিত যোগসাজস করিয়া এখানে আসিয়া এক রাত্রি, কখনো দুই রাত্রি বাস করিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতসারেই। একবার কি রকমে গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তারা এই খবর জানিতে পারে। তাই হঠাৎ একদিন, তৎকালীন বীরভূমের এস. পি. মিস্টার প্লাউডেন, সেক্রেটারিয়েটের একজন বড় সাদা সাহেব এবং আর একজন উচ্চপদস্থ সাহেবী পোশাক পরিহিত বাঙালী, বেলা ৯৷৷টায় আশ্রমে আসিয়া হাজির। দেহলীর উপর তলায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমি জানি না কি কারণে, নিচের তলায় বারান্দায় ছিলাম। সাহেবরা আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা রবি বাবুর সহিত বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করিতে চান। আমি অতগুলো বড় বড় সাদা-কালো সাহেব দেখিয়া ভড়কাইয়া চট্‌ পট্‌ উপরে উঠিয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথকে জানাইলাম যে, দুজন সাহেব ও একজন দেশী সাহেব বিশেষ কাজে এখনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থী। তিনি বলিলেন, 'যা জিজ্ঞেস করে আয় তাঁরা কে, কি কাজ।' নিচে নামিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পুনরায় গুরুদেবকে তাঁহাদের পরিচয় দিয়া বলিলাম, 'ওঁরা এনকোয়ারি করতে এসেছেন, কি বিষয় সেটা তাঁরা আপনাকে সাক্ষাতে বলবেন।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সাহেবদের কাছে দেখা করতে গেলে, কার্ড পাঠাতে হয়, দেখার নির্ধারিত সময়ে দেখা করতে হয়। এই হল দেখাকরা ব্যাপারে সাহেবদের রীতি। এঁরা তাঁর ব্যতিক্রম করেছেন। অতএব বল্‌ রবিবাবু এখন ব্যস্ত। বিকেল তিনটার সময় যেন দেখা করতে আসেন। এখন হবে না। জগদানন্দের কাছে এঁদের পৌঁছে দে। এনকোয়ারী তাঁর কাছে করতে চান করুন।' —আমি তো একটু ভড়কাইয়া গেলাম! বলিলাম, পাটটা এখনই চুকিয়ে দিলেই তো পারেন। নরম স্বরে কিন্তু চরম এবং

গরম ভাষায় তিনি বলিলেন, 'সাহেবদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার ও আচরণ করতে হয় আমি তা জানি। যা বলছি তাই কর। আমাকে পরামর্শ দিস না। তোর পরামর্শমত কাজ করতে হবে নাকি।'

যথাসময়ে বৈকালে উঁহারা আসিলেন। উঁহাদিগকে উপরে লইয়া গেলাম। যথারীতি সাহেব দুজনে রবীন্দ্রনাথের সহিত করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইতেই রবীন্দ্রনাথ হাত বাড়াইয়া উঁহাদের সহিত নিজের চৌকীতে (যে ছোট্ট খাটের উপর বসিয়া সামনে ছোট্ট ডেস্ক রাখিয়া তিনি মাঝে মাঝে লিখিতেন) বসিয়াই করমর্দন শেষ করিলেন। বাঙালী ভদ্রলোক করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইতেই রবীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন,—আমরা তো বাঙালী। নমস্কার। ভদ্রলোকটি একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়াই প্রতি নমস্কার করিলেন। আমার আড়ালে থাকার কথা। কেননা ইহাদের এনকোয়ারীর বিষয়টা গোপনীয়। কিন্তু আড়ালে যাইবার দরকার হইল না। বাঙলায় রবীন্দ্রনাথ আমাকে কাছেই থাকিতে বলিলেন। এনকোয়ারীর বিষয় ছিল বসন্ত মজুমদার মহাশয় কত বার এখানে আসিয়াছিলেন এবং কি জন্য আসিতেন, আসিলে কোথায় থাকিতেন ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি জবাব দিলেন যে, এখানে যে সব ছাত্ররা থাকে তাহাদের অভিভাবকগণ প্রয়োজন-বোধে আসেন, যে ক'দিন দরকার থাকেন আবার যান। কবে কে আসেন, কবে যান, কোথায় থাকেন এসব বিষয় সঠিক খোঁজ রাখা দরকার তাঁর হয় না। কাজেই এইসব প্রশ্ন তাঁহাকে না করিলেই ভাল। এই বলিয়াই তিনি জবাব শেষ করিলেন। তাহার পর তাঁহাদের বলিলেন, বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়কে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এইরূপে সংক্ষেপে জবাব দিয়া পুনরায় করমর্দন আর নমস্কারের পালা শেষ করিলেন। তাঁহারাও ব্যাপার বেগতিক দেখিয়া আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া নিচে নামিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে পুনরায় তাঁহাদের জগদানন্দবাবুর কাছে পৌঁছাইয়া

দিলাম। জগদানন্দবাবুর সহিত কি কথাবার্তা হইল তাহা শুনি নাই, কেননা সেখানে দাঁড়াইয়া থাকাটা সঙ্গত মনে করি নাই।

রবীন্দ্রনাথ শিশু, বালক, যুবকদের স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন একথা যেমন সত্য তেমনি একথাও সত্য যে, তিনি বালকদের বাল-কোচিত দুরন্তপনা, চাপল্য ইত্যাদি, চলতি কথায় যাহাকে অপরাধ বা দোষ বলে, সেগুলি তিনি অপরাধ বা দোষ বলিয়া গণ্য করিতেন না! কিন্তু কাহারও স্বভাবে বা আচরণে হিংস্র ভাব, নীচতার ভাব, বাঞ্ছনীয় নিয়মানুগত্যহীনতা দেখিলে শুধু যে বিরক্ত হইতেন তাহা নহে, সেই বিরক্তিকে অসহিষ্ণু ভাবে ব্যক্ত করিতেন, অর্থাৎ তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। একটা ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বড় দোতলা বাড়িতে থাকিতেন। সেই সময় জনৈক শিক্ষক উদ্ধত আচরণের জন্য একটি ছেলেকে কায়িক শাস্তি দেন। ছাত্রটির ঔদ্ধত্য যেমন কিছুতেই সমর্থনযোগ্য ছিল না তেমনি শিক্ষক মহাশয় যতটা উত্তেজিত হইয়া যে শাস্তি দিয়া-ছিলেন তাহাতেও রবীন্দ্রনাথ বেশ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের সব কাজই পরিদর্শন করিতেন। যে ছাত্রদল শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের উপর তিনি খুবই বিরক্ত হইলেন এবং শিক্ষক মহাশয়ের ব্যবহারে বিরক্ত। ঐ ব্যাপার লইয়া তখনকার ছোট্ট শান্তিনিকেতনে কয়েকজন শিক্ষক এবং কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভের ভাব দেখা দিল। এই ব্যাপার লইয়া যতদূর মনে পড়ে ঘটনার দু-একদিন পরেই আমাকে এবং শ্রীহিতেন্দ্রনাথ নন্দীকে বৈকালের দিকে রবীন্দ্রনাথ ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা যখন তাঁহার কাছে উপরে বারান্দায় হাজির হইলাম তখন টেবিলে তাঁহার জন্য স্যানাটোজেন, পাকা কলা, সন্দেশ, নোনতা খাবার সাজান ছিল আর ছিল চা-এর আয়োজন। গুরুদেব টেবিলের কাছেই চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমরা

দুইজনেই প্রণাম করিয়া ভয়ে ভয়ে পাশাপাশি চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি গম্ভীর। কয়েক মিনিট কোনো কথাই বলিলেন না। তাহার পরেই উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "তোরা কি মনে করেছিস তোদের ছাত্র আর শিক্ষকদের বিশ্রী আচরণকেও সহ্য করব? ছাত্রটির একটুও আত্মসম্মানবোধ, ভদ্রতা যদি থাকত তাহলে ওরকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারত না। আর এর বয়সোচিত শিক্ষকোচিত সম্ভ্রমজ্ঞান থাকলে তিনিও ওরকম শাস্তি দিতে পারতেন না। আশ্রমে এরকম লোকদের না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এইসব দোষ যদি ক্ষমা করতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয় তুলে দিতে হবে।" আমরা কিন্তু এরকম ধমক খাইব ভাবিয়া তাঁহার কাছে যাই নাই। হিতেন্দ্রনাথ তো আড়ষ্ট হইয়া বারান্দার উত্তরের কাচ লাগান দেয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি তাঁহাকে ব্যাপারটা কি হইয়াছে তাহা বলিবার চেষ্টা করিতেই রবীন্দ্রনাথ অতি মাত্রায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'যা ঘটেছে তা নিয়ে ওকালতি চলে না। যা চলে যা, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।' রবীন্দ্রনাথের তখনকার মেজাজ দেখিয়া আর বকুনি শুনিয়া তো হিতেন্দ্রনাথ আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চটপট নিচে নামিয়া গিয়া নিমতলায় দাঁড়াইয়া ইসারা করিয়া আমাকেও নামিয়া যাইতে বলিলেন। আমি নামিলাম না। চুপ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিলাম দেখি বকুনির দৌড় কতদূর চলে। আমাকে তিনি চিনিতেন, জানিতেন যে, আমি বকুনি খাইয়াও তর্ক করি। তবু ক্রোধের বশে বলিলেন—'কি দাঁড়িয়ে আছিস যে? চলে যা।' এবার কিন্তু বকুনির সুরটা নরম। বলিলাম যে আমাদের তো তিনিই ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। অথচ কেন ডাকিয়াছেন সেই কথাই শোনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি—বকুনি খাইব তা তো ভাবি নাই। আমরা কোনো পক্ষের জন্য ওকালতি করিতে আসি নাই। ভাবিয়াছিলাম এটা

চা-এর সময়, হয়তো বা ভাল জলযোগ জুটিবে। আর যদি এই ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান তাহা হইলে যাহা জানি সব কথাই বলিব। আমার কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ নরম সুরে বলিলেন —'ঐ হতভাগাটা গেল কোথায়, ও ভাল মানুষ নেমে গেল। নির্লজ্জ তুই, তাই গেলি না। যা, ওকে ডেকে আন।' আমি আর নিচে গেলাম না। উপর হইতেই ডাক দিলাম, 'হিতেনদা, উপরে এসো। গুরুদেব ডাকছেন।' হিতেন্দ্র ভয়ে ভয়ে উঠিয়া আসিলেন। হয়তো ভাবিয়াছিলেন, আর এক কিস্তী বকুনি খাইতে হইবে।

বকুনি আর হইল না। পরিবর্তে তোয়াজ। বলিলেন, "তোদের নিয়ে আর পারি না। এসব আচরণ অসহ্য। যাক বকুনি খেয়েছিস, এখন ভাল করে কলা সন্দেশ খা।" হিতেন নন্দীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"বেশ লোক সুধাকান্ত। বকুনি খেলি তোরা দুইজনেই। আর ওর মতলব ছিল যা কিছু খাবার ও-ই খাবে, তুই থাকবি নিচে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা বন্ধু জুটিয়ে এনেছিস। আমি বল্লুম, যা হতভাগাকে ডেকে নিয়ে আয়।" রবীন্দ্রনাথ যখন শুনিলেন ছাত্র ও শিক্ষক দুজনেই নিজেদের আচরণের জন্য অনুতপ্ত, খুসী হইলেন। তার পর আরো কথা হইল। প্রথমে বকুনির তেতো বটিকা পরিবেশন, ক্রোধের ঝটিকার পর্ব। তার পর স্নেহ মিশ্রিত তাঁহার কথা, সেই সঙ্গে চা-সন্দেশ, কলা। মধুরেন সমাপয়েৎ।

দেশ। সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৬ ॥

প্রথম অভিজ্ঞতা

প্রমথনাথ বিশী

এতদিন পরেও আজ আমার স্পষ্ট মনে পড়ে একদিন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলায় শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনকার দিনে বোলপুর রেল-স্টেশনটি ছোট ছিল; স্টেশনের বাহিরে বটগাছের তলে কয়েকখানা গোরুর গাড়ি থাকিত; তাই একখানা গাড়ি চড়িয়া শান্তিনিকেতনের দিকে রওনা হইলাম। যখন আশ্রমে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন অনেকক্ষণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কোথায় নামিলাম, কোন্ ঘরে গিয়া বসিলাম, কাদের সঙ্গে প্রথম কথা বলিলাম, সে-কথা আজ আর মনে পড়ে না। কিছুক্ষণ পরেই খাবার ডাক পড়িল। এখন যেখানে লাইব্রেরী তার উত্তর দিকে বড় একখানি টিনের ঘর ছিল, তখনকার দিনে সেটি ছিল খাবার ঘর, আর এখন যেখানে আপিস-বাড়ি তারই খানিকটা অংশ ছিল রান্নাঘর। এই টিনের ঘরে লম্বা করিয়া চটের আসন পাতা, শাল-পাতা আর গেলাস-বাটি সাজানো—এই রকম পাঁচ-ছয়টি সুদীর্ঘ শ্রেণী। খাবারের আয়োজনের মধ্যে খিচুড়ি ও পায়েসের ব্যবস্থা ছিল মনে পড়ে। প্রথম সূচনা নেহাৎ মন্দ লাগিল না।

তার পর কে যেন আমাকে শোবার জন্য 'বীথিকা' ঘরে লইয়া গেল। সেবার বোধ করি বীথিকা-গৃহ নূতন তৈরী হইয়াছে। বিছানায় গিয়া শুইলাম। সন্ধ্যাবেলা একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, নূতন-ছাওয়া চালের খড়ের সিক্ত গন্ধ পাইলাম। এই উদ্ভিজ্জ স্নিগ্ধসুবাসেই শান্তিনিকেতনের আমার প্রথম যথার্থ অভিজ্ঞতা। তার পরে তো কত বছর কাটিয়া গিয়াছে, কত নূতন নূতন অভিজ্ঞতার স্তর জীবনের উপর জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যখনই খড়ের চালের সিক্ত সুগন্ধ পাই, আমার সেই প্রথম রাত্রিটির কথা

মনে পড়িয়া যায়। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না, যখন জাগিলাম, দেখি অনেক বেলা। অন্য ছেলেরা অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছে, আমাকে নূতন ছেলে বলিয়া বোধ করি জাগাইয়া দেয় নাই। সেই প্রথম দিনের আলোয় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পরিচয় —যেখানে জীবনের সতেরো বছরকাল কাটিবে, সেখানকার সেই প্রথম প্রভাত।

বাহিরে আসিয়া সবচেয়ে বিস্ময়ের লাগিল—ব্যাপারখানা কি! ছেলেরা মাঠের মধ্যে ইতস্তত আসন পাতিয়া বসিয়া কেন? ইহার অনুরূপ তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! গ্রামের ছেলে আমি, মনে কৌতূহল ছিল, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তির সাহস যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। তার পর দেখিলাম, ছেলের দল এক জায়গায় সমবেত হইয়া সমস্বরে কি যেন আবৃত্তি করিয়া গেল। একটা সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়া মনে হইল। এই পর্ব সমাধা হইলে সকলে সারবন্দীভাবে জলযোগের জন্য রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

এতদিন পরে সব কথা অবিকল মনে থাকিবার নয়। কত কথা ভুলিয়া গিয়াছি, হয়তো দশটা ঘটনা মিলিয়া একটা ঘটনায় পরিণত হইয়াছে; কত ঘটনার মেল-বন্ধন ভাঙিয়া নূতন পর্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে; আবার পরের ঘটনা আগের উপরে আরোপিত হইয়াছে।

ইহার পরে মনে পড়ে—আমাকে ক্লাসে ভর্তি করিয়া দিবার কথা। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে একই ছেলে শিক্ষার তারতম্য অনুসারে এক-এক বিষয় উচ্চতর নিম্নতর শ্রেণীতে পড়িতে পাইত। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসকে যদি প্রথম শ্রেণী বলা যায়, তবে দশম শ্রেণী নিম্নতম। কোন ছেলে বাংলা ইংরেজীতে হয়তো সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে, গণিতে সে অষ্টম শ্রেণীভুক্ত। বছর-শেষে সব বিষয়ে যাহাতে সে ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ত হইতে পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন।

কাল্পনিক দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া লাভ কি—আমি নিজেই এইরূপ বিচিত্র শ্রেণীর একজন ছাত্র ছিলাম।

গণিতে আমি বরাবর এক শ্রেণী নীচে পড়িতাম। বছর-শেষে আমাকে সব বিষয়ে সমান পারদর্শী করিয়া তুলিতে কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না কিন্তু গণিতে শূন্যবাদ প্রচার করিবার জন্যই যাহার জন্ম, কর্তৃপক্ষের তাড়না তাহার কি করিবে? ফলে এই হইত যে, বছর-শেষে গণিতে আমাকে ডবল প্রমোশন দিয়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমান করিয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইত। দু-একদিন সেই নূতন ক্লাসে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া গণিতে নীচের ধাপে ফিরিয়া আসিতাম। ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই নিশ্চিন্ত হইতেন।

একবার এই রকম একটা ডবল প্রমোশনের কথা বেশ মনে আছে। এই ব্যাপারে আমার আর একজন সঙ্গী ছিল—ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, কোন বিষয়েই যে আমার অনন্যসাধারণত্ব নাই, ইহা তাহাই মাত্র প্রমাণ করে। এখন, আমরা তো দুটিতে নূতন ক্লাসে গুটি গুটি গিয়া একটেরে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলাম। শরৎবাবু ছিলেন শিক্ষক; আমাদের গণিতবিদ্যার খ্যাতি অজ্ঞাত ছিল না, পাছে তাঁহার চোখে পড়িয়া যাই, সেই ভয়ে একটু আড়ালেই বসিয়াছিলাম। শরৎবাবু ব্ল্যাকবোর্ডে একটি অঙ্ক লিখিয়া দিলেন, তাতে 'হন্দর' কথাটি ছিল। এখন আমরা দুজনে ইতিপূর্বে কখনো হন্দর শব্দ শুনি নাই। প্রথম শ্রবণে শব্দটা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একে অঙ্কের ক্লাস, তার উপরে শরৎবাবুর কাল-বৈশাখীর মেঘের মতো গাম্ভীর্য ও শিলাবর্ষণের খ্যাতি, কাজেই হাসিবার মতো আমাদের ঠিক মনের অবস্থা ছিল না—আমরা সর্বজ্ঞের গম্ভীরতা মুখে টানিয়া আনিয়া খাতার পাতায় আঁকজোক কাটিতে লাগিলাম!

সঙ্গী আমাকে শুধাইল—'হন্দর' মানে কি?

আমি বলিলাম—ওটা বোধ হয় লেখার ভুল। হাঙ্গর হবে।

সে বলিল—জিজ্ঞাসা করো না।

আমি বলিলাম—চুপ করো। অন্তত একটা দিনও ডবল প্রমোশন ভোগ করতে দাও।

অগত্যা চুপ করিয়া থাকিবার পরামর্শই গৃহীত হইল। কিন্তু এত বিদ্যা কি অধিকক্ষণ চাপা থাকিতে পারে! কিছুক্ষণের মধ্যেই শরৎবাবু আমাদের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিলেন এবং পত্রপাঠ নীচের ক্লাসে পাঠাইয়া দিলেন। আসিবার পূর্বে বুঝিলাম শরৎবাবু সম্বন্ধে যে-সব খ্যাতি আছে, তাহা অত্যন্ত পীড়াদায়কভাবে সত্য।

গণিত সম্বন্ধে অজ্ঞতা কবুল করায় লোকের সন্দেহ হইতে পারে ম্যাট্রিকুলেশনের ঘাঁটি পার হইলাম কি উপায়ে! বলা বাহুল্য, জ্যামিতির সাহায্য না পাইলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না। জ্যামিতি এমন মুখস্থ করিয়াছিলাম যে, প্রথম হইতে শেষ, আবার শেষ হইতে প্রথম পর্যন্ত অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতাম। লোকে বলিত, জ্যামিতি বুঝিয়া লইলে নাকি মুখস্থ করিবার আর প্রয়োজন হয় না। হয়তো তাই। কিন্তু ও রকম বিপজ্জনক এক্সপেরিমেণ্ট করিবার সাহস আমাদের ছিল না।

এ-সব তো অনেক পরের ঘটনা। প্রথম দিন আমার যখন শ্রেণী নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠিল, কে একজন যেন বলিলেন—একে গুরুদেবের ক্লাসে নিয়ে যাও। গুরুদেব বলিতে যে রবীন্দ্রনাথকে বুঝায় তাহা জানিতাম না। আর সত্য কথা বলিতে কি, তখন রবীন্দ্রনাথের নামই শুনি নাই—এমন কি তাঁহার কোনো কবিতাও পড়ি নাই।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের দোতলায় থাকিতেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, আমার বয়সের কয়েকটি ছেলে, আর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ। তখনো তাঁহার চুলদাড়ি সব পাকে নাই; কাঁচা-পাকায় মেশানো, কাঁচার ভাগই বোধ করি বেশি। পরনে পায়জামা ও গায়ে পাঞ্জাবি। তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন, আগের সূত্র অবলম্বন করিয়া অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। তিনি একজন

ছাত্রকে বলিলেন,—আচ্ছা, ইংরিজিতে বল্ তো—সবির একটি গাধা আছে!

সবি ক্লাসের অপর একটি ছেলের নাম।

ছাত্রটি নির্বিকারচিত্তে বলিয়া গেল—Sabi is an ass. আমরা কেহ হাসিলাম না, কারণ গাধা থাকার ও গাধা হওয়ার ভেদ সেই বয়সে বোধ করি আমাদের মনে স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, দেখলি সবি, তোকে গাধা বানিয়ে দিলে? ইহাতেও সবি হাসিল না। বোধ করি পদবৃদ্ধির লোপ হওয়াতে সে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রথমতম স্মৃতি। ঘটনাটি অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছ সূত্রটাকেই অবলম্বন করিয়া বছরের পর বছর রবীন্দ্রনাথের কত স্মৃতি জমিয়া উঠিয়াছে! ফলে এই ঘটনাটি যেন আমার কাছে রবীন্দ্র-চরিত্রের অন্যতম প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। লঘুতম কথাবার্তা হইতে মোচড় দিয়া তাঁহার রস আদায় করিবার ক্ষমতা, অভাবনীয়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহার রসসৃষ্টির শক্তি, শিশু-মনের সঙ্গে সমসূত্রে নিজেকে অনায়াসে স্থাপন—এ সমস্তই রবীন্দ্র-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাদান যাঁহার ব্যবসা তেমন লোক হইলে এই ঘটনায় না জানি কি অনাসৃষ্টি করিয়া বসিত! কিন্তু শিক্ষাদান যাঁহার পক্ষে সহজাত, তিনি কি অনায়াসে সমস্ত ঘটনাটির উপরে শুভ্র কাশকুসুমের মতো একটি হাসির হিল্লোল বুলাইয়া দিয়া ইংরেজি তর্জমার আবহাওয়া হইতে তাহাকে একেবারে রূপকথার অনির্বচনীয়তা দান করিলেন!

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥

রবীন্দ্র চিত্রকলা

হুমায়ুন কবির

ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাঙলা কাব্য-জগতে তাঁর আবির্ভাবের মতনই প্রায় সমান বিস্ময়কর। ...রবীন্দ্র-নাথ চিত্রশিল্পে এসেছিলেন নবাগত ও রবাহুত অতিথি। তাই ভারত-বর্ষে অধুনা প্রচলিত চিত্রপদ্ধতির প্রভাব তাঁর চিত্রাঙ্কনে নেই বললেই চলে। চিত্রজগতে তিনি এনেছেন স্বভাবশিল্পীর প্রতিভা ও অশিক্ষিত-পটুত্ব। কিন্তু যে প্রগাঢ় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনে পরিব্যাপ্ত, এখানেও তার অভাব ঘটেনি, এবং এই প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাসেই তিনি চিত্রজগতে যে পথ খুঁজে পেয়েছেন সে পথ যেমন নতুন তেমনই আশাপ্রদ। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সত্তা কোন শ্রেণী-বিশেষের বন্ধন স্বীকার করেনি। জন্ম এবং শিক্ষা-দীক্ষার শাসনকে অতিক্রম করে সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রতীকের সঙ্গে তাঁর প্রতিভা নিগূঢ় আত্মীয়তা স্থাপন করেছে, কিন্তু তাঁর যৌবনে, শ্রেষ্ঠ সংগঠনী বৎসরগুলি দেশের পল্লী সমাজের বুকে মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় আত্মীয়তায় না কাটলে তা সম্ভব হত কিনা বলা কঠিন। এই প্রগাঢ় ও পরিপূর্ণ সমাজবোধের ফলে রবীন্দ্রনাথ চিত্র-জগতেও কেবল সংস্কৃতিবান্ চিত্রপদ্ধতিকে স্বীকার করে তৃপ্ত হননি। পরিণত চিত্রাঙ্কনরীতির পিছনে ও নীচে যে সহজ চিত্রকলা দেশের অশিক্ষিত বিপুল জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তাঁর মধ্যেও তিনি নিজের শিল্প সাধনার প্রেরণা অনুভব করেছেন। ··

রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার দিন আজো আসেনি। যে বয়সে অন্য মানুষ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের কথা ভাবে, অর্জিত সিদ্ধি ও যশের মূলধনেই জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিতে চায়, সেই বয়সে চিত্রশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অভিযান দুঃসাহসিক। সেই

মানসিক উদ্যমই উত্তরকালে তাঁর কাব্যে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখকে রূপ দেবার যে সাধনা, চিত্রপদ্ধতিতে দেশের গণমানসকে আবিষ্কার করবার ফলে যে তা সহজ হয়েছিল, একথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না।

বাঙলার কাব্য ॥

শিশু-সাহিত্য স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ

গিরীন চক্রবর্তী

কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'শিশুসাহিত্য' রচনা করতে হলে লেখকের এক চোখ রাখতে হয় শিশু-পাঠকদেব ওপর, আর অন্য চোখ রাখতে হয় তার অভিভাবকদের দিকে। কথাটি খুব সত্য। ছোটদের জন্য কিছু লিখতে হলে তার একাধারে অভিভাবক এবং শিশু-পাঠকদের মনোরঞ্জন করা দরকার। অর্থাৎ সে লেখার মধ্যে শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ের সমাবেশ ঘটা উচিত। এবং যিনি সত্যকার শিশুসাহিত্যিক হবেন তাঁকেও হতে হবে একাধারে শিক্ষক ও লেখক।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ দু-এরই অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে সারা পৃথিবীময় পরিচিত ম্যাঞ্চেস্টারের অধ্যাপক জেমস ফিণ্ডলের এ বিষয়ে মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বললেন, "আমাদের এ যুগে দুজন মাত্র লোক আছেন—পাশ্চাত্ত্যে জন ডিউই এবং প্রাচ্যে রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর—যাঁদের জ্ঞানের শিখা যে সাধারণ মানুষের মনেই আলো জ্বেলে দেয় তা নয়, তাঁরা স্বচ্ছন্দে নেমে আসে শিশুর স্তরে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা ছিল স্বাধীনতা ও সংযম। আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি শব্দকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। আপনা হতে সর্বদা কিছু সৃষ্টি করবার উন্মুখতার মধ্যে এই দুই-এর মিল হয়। রবীন্দ্রনাথ সংযম বলতে শুধুমাত্র শৃংখলা বুঝান না। তিনি সংযম বলতে মনে করেন আত্ম-প্রতিষ্ঠা। উচ্ছৃংখলতাকে যেমন স্বাধীনতা বলা ভুল, তেমনি কৃচ্ছ্রসাধন আর শৃংখলাও সংযম নয়। শিশু ও বালকের দেহেমনে যে উদ্দাম আনন্দবেগ ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্ট হয় তাকে কবি উচ্ছৃংখলতা বলতে রাজী নন। সেজন্য এ সহজ উচ্ছৃংখলতাকে তিনি কোনওদিন কঠোর শাসন

করতেও চাননি। কোন বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান হারাইলে তবেই তাকে বলে অসংযম। কবির লক্ষ্য ছিল শিশু ও বালকদের শিক্ষাদর্শে সংযম, আনন্দের মধ্যে সংযম, জীবনের প্রতি কর্মে, ভাবনায় সংযম উপলব্ধি করানো।

এ কাজ সহজ নয়। সেজন্য কবি বড়দের জন্য লেখার তাগিদে অস্থির হয়েও শিশুদের লেখার দাবীকে মেনে নেন আগে। ১৯১৯ সালের এপ্রিলের দিকে তিনি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে একটি চিঠি লিখেছেন,

"আমার পদোন্নতি হয়েছে।....শিশু মহারাজের সভায় সখার পদ পেয়েছি।...যৌবন মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশু দিগন্তের দিকে নেমেছে।....আমার মনিব এসেছেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্ছি। তার কাছে শাস্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট, কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেইজন্য এখান থেকে তোমাদের জয় কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চলব, এখন আমার সে অবকাশ নেই। আগামীকালে যারা যুবক হবে, আমি তাদের সঙ্গ নিয়েছি।"

শিশু মনিবের দাবী মেটাবার জন্য কবি লিখলেন শিশু, শিশু ভোলানাথ, ছড়া, ছড়ার ছবি প্রভৃতি কাব্য ও ছড়া আর সহজ পাঠ ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক।

বয়স্ক লোকদের দায়িত্ববোধের জীবনকে কিছুকালের জন্য মন থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছেয় রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের জন্য কবিতা লিখতে বসতেন। কবি প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকায় গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতার চরম উন্নতি প্রত্যক্ষ করলেও বেশ বুঝতে পারলেন সে দেশের মানুষের মন শুধুমাত্র ঐশ্বর্য আর সম্পদ লাভ করে তৃপ্ত হতে পারছে না। কবির নিজের কথায় বলতে গেলে বলা চলে, "কিছুকাল আমেরিকার পৌরতার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার

পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট আবিষ্কার করে তার চিত্তের জন্য এতবড়ো আকাশের ফাঁকাটা দরকার। সেদিন আমি আবিষ্কার করেছিলাম অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকলোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"

রবীন্দ্রনাথ কাজ ও খেলার মধ্যে পার্থক্য টানতে চান না। 'খেলার জগতে শিশু হয়ে জন্মেছেন এই ঘটনাটির মধ্যেই মানব-জীবনের মূল সত্যটি আমাদের জীবনের ভূমিকারূপে লিখিত হয়েছে' বলে কবির ধারণা। তাঁর ধারণা দায়িত্ববোধরূপ ব্যাধি মানুষের বয়স্কতাকে কড়া করে, পাকা করে তোলে, সে অবস্থায় সে খেলাকে অবজ্ঞা করতে থাকে, এবং খেলার সঙ্গে কাজের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে কর্তব্য সাধন করছে বলে গৌরব বোধ করে।

জীবনের এই ভূমিকাকে তিনি কিছুটা প্রকাশ করেছেন 'শিশু' কবিতায়। 'শিশু'র বহুদিন পরে রচিত 'শিশু ভোলানাথ' বইটিতে কবি এই ভাবই প্রকাশ করেছেন।

'শিশু ভোলানাথ' রচনার সময়ে কবি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্বভারতীর জীবনধারার মধ্য দিয়া কবি তাঁর উপলব্ধি ও জীবনসত্য মূর্ত করে তুলতে চান। বিশ্বভারতীর যে অংশটা আইডিয়া বা কল্পনা—তাই হচ্ছে বিশুদ্ধ আনন্দ, আর যে অংশটা নিয়মকানুনে ঘেরা সেটা সকলের কাছে মনে হয় বিষম দায় বলে। ঐ নিয়মকানুনের দায় যদি কল্পনাকে চাপা দিয়ে রাখে, কল্পনা চাপা দিয়ে যদি প্রতিষ্ঠানটি নিয়মকানুনের কারাগার হয়ে ওঠে তাহলে সংসারী যাঁরা, পাকা লোক যাঁরা তাঁরা খুব খুশী হয়ে ওঠেন। মানুষের মন কিন্তু তাতে তৃপ্তি পায় না। মানুষের মন যে মুক্তি চায় তা

কাজ এড়িয়ে নয়; মানুষ মুক্তি চায় কাজকে খেলা কিংবা খেলাকেই কাজে রূপান্তরিত করে।

শিশু ভোলানাথ-এর প্রথম কবিতায় তিনি তাই লিখলেন:

"আপন সৃষ্টিকে ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস্ অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।"

ছড়ার ছবি রচনার ইতিহাসও এমনি বিচিত্র। কবি তখন আলমোড়া গেছেন বেড়াতে। সঙ্গে পুট্‌লি ভর্তি নন্দলালবাবুর আঁকা ছবি। সে ছবিতে বাংলার নানা জীবন ধরা পড়েছে। অন্যের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না এমন অনেক জিনিস আছে এতে। সে ছবি ঘাঁটতে ঘাঁটতে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বড়দের জন্য কিছু লিখলেন না। লিখলেন আপন খেয়ালে শিশুর জন্য ছড়া।

এর আগেই বলেছি কবি বড়দের বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেতে, শিশুর জগতে প্রবেশ করতে চাইতেন। শিশুজগতে তিনি অনাবিল আনন্দে মনের গহনের কথাও অকপটে বলে যেতে পারতেন; জানতেন 'শিশু পাঠ্য' বলে তার জন্য কোন কৈফিয়ৎ তাঁকে দিতে হবে না।

বইটির ভূমিকায় লিখলেন, "এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্য লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর, ছেলে মেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে।....

"ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েলি আলাপের আলাপ, ছেলেদের প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজে সভাযোগ্য হবার কোন খেয়াল এর নেই।"

এর অনেকগুলি কবিতাই গল্প। কোনটি করুণ, কোনটি বা হাস্যরসের। কিন্তু প্রত্যেকটিতে জীবনের ছাপ অতি স্পষ্ট। 'সুধিয়া' কিংবা 'মাধো' কবিতায় উৎপীড়িতের বিদ্রোহ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শিউনন্দন গোয়ালার ছেলে সামরু। বন্যার পরে তিনটে গরু নিয়ে অনেক কষ্টে ঘরে ফিরে দেখে—

"...দুহাত চোখে চাপা দিয়ে
ইষ্টদেবকে স্মরণ করে নড়ছে বাপের মুখ—
তাই দেখে ওর একেবারে জ্বলে উঠল বুক ;
বলে উঠল, "দেবতাকে তোর কেন মরিস ডাকি।
তার দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুক আজো রইল বাকি
ভার নেব তার নিজের পরেই, ঘটুক নাকো যাই আর,
এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।"

তারপরে,

"এদিকেতে প্রকাণ্ড এক দেনার অজগরে,
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে।"

সেই সময়, মাল্‌তদন্ত করতে এসে দুনিয়াচাঁদ বেণের ছেলে বায়না ধরল সামরুর গরু 'সুধিয়া' তার চাই-ই। সামরু মারমুখো হয়ে উঠতে—

"শেঠজী বলে মাথা নেড়ে, দুই চারিমাস যেতেই
ঐ সুধিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালেতেই।"

একফাঁকে সামরু যখন বাড়ি ছিল না তখন দুনিয়াচাঁদ বেণে সত্যসত্যই সুধিয়াকে নিজের গোয়ালে নিয়ে তুলল। ফিরে এসে সুধিয়াকে না দেখে সামরু পাগলের মত হয়ে গেল। খোলা ভোজালি হাতে নিয়ে সে মোকাবিলা করতে গেল শেঠজীর সঙ্গে। শেঠজীদের রচা আইনে সে কিছু করলেই হবে অপরাধী! কিন্তু মানবতাবোধ একটি জায়গায় এসে সকল আইন ছাপিয়ে ওঠে। সে হল বিপ্লবের মুহূর্ত। এমনি মুহূর্তেই সামরু বলল, আপন ইচ্ছামত যদি সুধিয়া তোমার ঘরে থাকে তবে সে তাকে শেঠজীর গোয়ালেই রেখে যাবে। কিন্তু জোর করলে ফল হবে বিপরীত। শেঠজী পুলিশের ভয় দেখালে সামরু জবাব দিল :

"......ডেকো ;
ফাঁসি আমি ভয় করিনে এইটে মনে রেখো।
দশ বছরের জেল খাটব ফিরব তো তারপর,
সেই কথাটা ভেবো বসে, আমি চললেম ঘর।"

এমনি আর এক চরিত্র মাধো। রায়বাহাদুর কিষণলালের স্যাকরা জগন্নাথের ছেলে সে। বাপের শিক্ষানবিশিতে তার যত কুঁড়েমি। পাড়ার কুকুর বেড়াল পাখি সব তার বন্ধু। রায়বাহাদুরের ছেলে দুলাল তার কুকুরকে মারতে এলে বিপর্যয় বাধল। মাধো তার চাবুক ভেঙে ফেলল। দুলাল বাবার কাছে নালিশ করে মাধোকে বেঁধে রাখল মার খাওয়াবে বলে, কিন্তু দুলালের মা এ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে মাধোকে মুক্তি দেন। সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। দিন বসে থাকে না। মাধো গিয়ে চাকরী নিয়েছে কলকাতার চটকলে। বিশপঁচিশ বছর পরে সে হল সংসারী, কারখানায় সে বেশ মাতব্বর। এমন সময় কারখানায় ধর্মঘট হল! মাধোকে মালিক কত অনুরোধ করলেন ধর্মঘটীদের ছেড়ে কাজে লেগে থাকতে। কিন্তু,

"মাধো বলল, মরাই ভাল এ বেইমানির চেয়ে।"

তারপর যখন ধর্মঘট ভাঙতে সরকার পুলিশের জুলুম শুরু হল তখন,

মাধো বললে, "সাহেব আমি বিদায় নিলেম কাজে ;
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।"

যে মাধো ধর্মঘটে যোগ না দিলে কত আনন্দে থাকতে পারত সে বউছেলের হাত ধরে—

"চলল সেথায় যে দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে—
মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে।
পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি—
ছেড়া শিকড় পাবে কি আর পুরানো তার মাটি।"

রবীন্দ্রনাথ এ বইটি সম্বন্ধে পরে বলেছেন যে, এতে তিনি পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। "কিছুকাল হল একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা গদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি কিছু নাবালকের কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল, অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এই বইটাতে বালভাষিত গদ্যে।"

অত্যাচারের, অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ শিশু ও বালকদের সঞ্জীবিত করতে চাইলেন—এসব ছড়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাই তো শেষ নয়। ছেলেদের মনের বাঁধন খুলে দিতে না পারলে যে সব চেষ্টাই বৃথা। তাই রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ছোটদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে। অন্যের হাতে এ গুরুদায়িত্বভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।

শিশুদের জন্য 'বিশ্ব-পরিচয়' লিখবার দায়িত্ব প্রথমে দিয়েছিলেন এক বিজ্ঞানীর উপর। কিন্তু সেটা তাঁর মনঃপূত হয়নি। তিনি নূতন ভাবে বিশ্ব-পরিচয় লিখবার জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করলেন। তাঁর চেষ্টা হল বিশ্বতত্ত্বের আধুনিকতম মতাদি আয়ত্তে এনে যতদূর সম্ভব সরল করে লেখা। যৌবনের বসুন্ধরার মত কবি ছড়ার ছবিতেও বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বকথা দিলেন। 'পাথর পিণ্ড' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এসব বই লেখার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি অতি সহজের টানে কোন বিজ্ঞানের বিষয়কে চটুল করে তোলেন নি। বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বসমূহ মাজাঘষা না করেই পরিবেষণ করেছেন। ছেলেরা যতটুকু বুঝতে পারবে তাতেই চলবে। বাকী-টুকু বোঝাবার দায়িত্ব হল অভিভাবকের। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চা চাই-ই। কবি বলেন, "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার।··· জ্ঞানের এই পরিবেষণকার্যে পাণ্ডিত্য (Pedantry) যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি।"

রবীন্দ্রনাথের সদা সৃজনশীল মন নূতন যুগের নূতন রূপকথা লেখার পথও দেখিয়ে গেলেন সে বইটিতে। সেকথা বলতে গিয়ে লিখলেন—

"বিধাতা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন তবু মানুষের আশা মেটে না; বলে আমরা নিজে মানুষ তৈরী করব। তাই দেবতার সজীব পুতুল খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা সুরু হল পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের আপন-গড়া মানুষ। তারপরে ছেলেরা বলে 'গল্প বলো; তার মানে ভাষায় গড়া মানুষ বানাও।.... নাতনীর ফরমাশে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে। নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যের কোন জবাবদিহি নেই।... অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই বলে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ করে দিলুম, এক যে আছে মানুষ।"

আমরা জানি মনের এমনি অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনের কিছু কঠোর সত্য পরিবেষণ করেন ছোটদের পাতে। এতেও হয়েছে তাই। আমাদের আশেপাশের বহু মানুষের মুখ ফুটে ওঠে এই গল্পগুলিতে।

হুঁহাউ দ্বীপের কথা কি আমাদের চলতি সমাজের প্রকাণ্ড ব্যঙ্গ-রূপ নয়? শিবাশোধন সমিতিই বা কি? আর গেছো বাবা?

শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ দান পাঠ্যপুস্তক রচনা। এ রচনাগুলিও সার্থক সৃষ্টি। পাঠ্যপুস্তক বলতে শিশু ও বালকদের মনে বিভীষিকার ভাব উদয় হয়। কবিরচিত "সহজ পাঠ" তেমন ভীতিপ্রদ গ্রন্থ নয়।

এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ-যোগ্য: "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এককালে বাঙালী ছেলেকে ভাষার রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেন, আমাদের যুগে রবীন্দ্রনাথ ভাবের রাজ্যে, ছন্দের আনন্দলোকে শিশুর মনকে মুক্ত করিলেন।"

তবে দুঃখের বিষয় "শিশুদের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য গদ্যে ও পদ্যে লিখিয়াছেন এখন পর্যন্ত তাহার সম্যক্ আলোচনা হয় নাই!"

কার নাম এই চু-চেন্-তাং? এ তো আর আমাদের দেশী নাম নয়, খাস চীন দেশীয় নাম। শুনে আরও অবাক হবে যে, চু-চেন্-তাং রবীন্দ্রনাথেরই আর এক নাম।

কবি সবে 'নোবেল পুরস্কার' পেয়েছেন গীতাঞ্জলি লিখে। বিশ্ব-ব্যেপে ছড়িয়ে পড়েছে বঙ্গ-দুলাল, ভারত-রবির খ্যাতি। তাই দেশ-দেশান্তর থেকে প্রচুর আমন্ত্রণ এলো রবীন্দ্রনাথের কাছে। কেউ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁদের দেশে পদার্পণ করে তাঁদের ধন্য করতে; কেউ বা অনুরোধ জানিয়েছেন, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পদ-ধূলি দিয়ে দেশের জ্ঞানী-গুণী ও ছাত্রদের কিছু নূতন কথা শোনাতে!

রবীন্দ্রনাথ। তিনি যে বিশ্বকবি, বিশ্বের ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি তাদের বিমুখ করবেন কী করে। তাই পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে ইংলণ্ড, আমেরিকা, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মান, জাপান আরও কত কত দেশ তিনি ঘুরলেন, তার ইয়ত্তা নেই। তারপর ডাক এলো মহাচীন থেকে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো। ভারতের যুগযুগান্তের বন্ধু, কৃষ্টি ও সভ্যতার সহযাত্রী মহাচীনের আমন্ত্রণ পেয়ে কবির অন্তরাত্মা আনন্দে নেচে উঠলো। গ্রহণ করলেন আন্তরিক আমন্ত্রণ।

ওদিকে কিন্তু মহা হুলস্থূল। ভারতঋষি, বিশ্বকবি আসছেন চীন ভ্রমণে। কিভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হবে, আর কিভাবে করা হবে আদর-আপ্যায়ন, তাই নিয়ে সকলেই মহাব্যস্ত! দেশের ছোট-বড়ো, যুবক, ছাত্র সবার পক্ষ থেকে চীন-সরকারের কাছে আবেদন গেলো, মহামান্য অতিথি, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যেন চীন-সম্রাটের রাজপ্রাসাদেই রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

এ যে উত্তম প্রস্তাব। সম্রাটেরও যে সৌভাগ্য। তাই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে দেশবাসীর আবেদনে সাড়া দিলেন চীন-সম্রাট্।

১৯২৪ সালে কবি পদার্পণ করলেন ঐতিহাসিক শহর পিকিং-এ। সমগ্র দেশের লোক ভেঙ্গে পড়লো কবিকে দেখে ধন্য হতে। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সকলেই অবাক। কৈ, কবি কোথায়! এযে শান্ত সমাহিত সর্বসুন্দর ঋষি। চোখে-মুখে দীপ্ত অপূর্ব-সুন্দর জ্যোতি। মহাশ্রদ্ধায় অবনত হলো সকলের চিত্ত। ভূতপূর্ব চীন-সম্রাট্ হু-য়ান-তাং কবিকে অভ্যর্থনা জানালেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে তিনি তাঁকে উপহার দিলেন চারশো বছরের পুরানো একখানি ছবি, ভারত-চীনের অতীত দিনের মধুর সম্পর্ককে স্মরণ করে। ঐ প্রতীক উপহারে আনন্দ উপচে পড়ে বিশ্বকবির।

এ আনন্দের ঢেউ যেতে না যেতেই আরেক আনন্দের বান এলো। এলো পঁচিশে বৈশাখ।

রাত্রির অন্ধকার মন্থন করে পঁচিশের "সূর্য-শঙ্খ" বাজলো। পরম সৌভাগ্যে মেতে উঠলো চীনবাসী। বিশ্বকবির জন্মোৎসব পালন করবে তারা কবিকে সঙ্গে নিয়ে!

কবি ভাবলেন...."পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই...." তাই পরমাত্মীয়ের খোঁজ পেলেন তিনি এখানেও। চীন দেশীয় রীতিতেই পালন করা হলো তাঁর জন্মদিন। সারাদেশ থেকে এলো শতশত উপঢৌকন। নীল পায়জামা, কমলা রঙের আলখাল্লা; আর মাথায় বেগুনী রঙের টুপি দিয়ে সাজানো হলো কবিকে। সবার সামনে দাঁড়িয়ে কবি বক্তৃতা দিলেন আবেগভরা কণ্ঠে।

চীনের মানুষও তাদের প্রাণের ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলো বরেণ্য কবির জন্ম-উৎসবে। শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্ষান্ত হতে পারলো না। তাদের নিজস্ব ভাষায় কবির নূতন নামকরণ করে কবিকে করে নিল তারা একান্ত আপনার, পরমাত্মীয়। সে নাম "চু-চেন্-তাং"। তার অর্থ, "বজ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত ভারত-সূর্য"। পরম তৃপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ হাসলেন কোমল-উজ্জ্বল হাসি; হাসলো ভারত-সূর্য!

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজগৎ

মনোজ বসু

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, সেই সঙ্গে জাতীয়তার কবি।

বঙ্গভঙ্গে....জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতায় অথবা হিজলি-জেলের হত্যাকাণ্ডে কবিকণ্ঠ তিরস্কারে গর্জে উঠেছে। প্রতিকারের উপায় খুঁজেছেন তিনি, ক্ষেত্রবিশেষে কর্মোদ্যোগে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ..

বিশ্বের মানুষের সঙ্গে কবি যেন এক পরিবারস্থ। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে মনুষ্যত্বের উপর যখনই আঘাত পড়েছে, কবির লেখনী খরধার অসি হয়ে ঝলক দিয়েছে। আমেরিকায় নিগ্রো স্ত্রী পুরুষের উপর চাবুক মারা, জার-শাসিত রাশিয়ায় ইহুদি-হত্যা, কংগোয় বেলজিয়ানদের অত্যাচার, স্পেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসি-আক্রমণ, হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার—কোন অন্যায় কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।

১৯১৩ অব্দে নোবেল প্রাইজ পেলেন। ভুবনের জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির অধিকতর সুযোগ হল এই সম্মান লাভে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লড়াইয়ের বিপক্ষে কঠোর প্রতিবাদপত্র প্রকাশ করলেন। ১৯১৬ অব্দে কবি জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণে বেরুলেন—আলোচনার প্রধান বিষয় জাতীয়তা।

শান্তিনিকেতনে অনেক বছর আগে প্রাচীন আশ্রমের আদর্শে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবারে কবি সেখানে 'সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু' রচনার সঙ্কল্প করেছেন। লজ এঞ্জেলস্ থেকে এই সময়ে লেখা একখানা চিঠি: "ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতির মহা মিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন ঐ বোল-পুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিতে সমস্ত জাতিগত ভূগোল

বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্বমানবের জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।” প্রতিষ্ঠানের নামও স্থির করে ফেললেন—বিশ্বভারতী। বিশ্ব অর্থাৎ জগৎ আর ভারতী হল জ্ঞানসংস্কৃতি। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভারতী—এ রকম অর্থ করলেও বেমানান হবে না।

১৯২১ অব্দের ডিসেম্বরে তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন।

বিশ্বভারতীর বাণী বহন করে পৃথিবীময় ছুটাছুটি শুরু হল কবির। চীনে গেলেন ১৯২৪ অব্দে। চীনে আর ভারতে হাজার হাজার বছরের পুরানো সম্পর্ক তিনি নতুন করে প্রতিষ্ঠা করে এলেন। সেই বছরই চললেন দক্ষিণ আমেরিকার পেরুরাজ্যে—তাঁদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে। ফেরার পথে ইতালী। দু'বছর বাদে আবার ইউরোপ—পশ্চিম ও মধ্য-ইউরোপের সর্বত্র। গেলেন বলকান রাজ্যে, তুরস্কে ও মিশরে। পরের বছর মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ এবং শ্যামরাজ্যে।....পরের বছর কানাডা ও ইন্দোচীনে। তার পরের বছরে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করলেন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, রাশিয়া ও আমেরিকা। রাশিয়া প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে কবি লিখলেন : “রাশিয়ায় এসেছি। না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যেত।” তারপরেও কবি গিয়েছেন পারস্যে—১৯৩২ অব্দের এপ্রিলে।

বিশ্বব্যাপ্ত তীর্থ-পরিক্রমা! ভাষণে, গানে, আবৃত্তি ও অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ দিগ্বিজয় করলেন। ভারতের সাংস্কৃতিক বিজয়। ভারত অতি দরিদ্র ও পরপদানত তখন. কিন্তু ভারতের কবি রাজরাজ্যেশ্বরের গৌরব আহরণ করে এলেন। না, তার অনেক বেশি।

১৯৫৪ অব্দে সোভিয়েট দেশে গিয়ে মস্কো শহরের ইউনিয়ন অব রাইটার্সে হাজির হয়েছি :

এক ঘরে নিয়ে গেল। লম্বা টেবিল ঘিরে বসেছি—আমাদের তরফের এবং ঐ তরফের। অশীতিপর একজন রবীন্দ্রনাথের কথা

তুললেন। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গেলেন, বিপ্লবের ধকল তখনো কাটে নি। নানান অভাব-অসুবিধা—খাবার-দাবার পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছে সহরতলীর এক বাড়ীতে। লোকজনের ঝামেলা কম, নিরিবিলি থাকেন।

বৃদ্ধ লেখক মশায় বলতে লাগলেন, বিপ্লবের আগেও তাঁর কবিতা তর্জমা হয়েছিল এদেশে। আমরা এঁর নাম জানতাম, লেখা পড়েছি। একদিনের কথা মনে পড়ে। পনের জন লেখক মোট-মাট বসেছি একসঙ্গে। টেগোর প্রাস্ত দেশে। বারংবার দেখছি তাঁকে, দেখে দেখে আশ মেটে না। মনে হল, প্রফেট। তাঁর মুখ-চোখ দাড়ি-পোশাক সব মিলিয়ে অপরূপ মনে হচ্ছিল। মৃদুস্বরে কথা বলছেন। সঙ্গীতের মতো সেই কণ্ঠ। দু-ঘণ্টা ধরে চলল। আমাদের ভয় হচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তিনি। কিছু না। মস্কো তখন খুব বড় একটা গ্রামের মতো। এত বড় বৃহৎ দেশের রাজধানী এই—তিনি কিন্তু হতাশ হননি····

ভারি এক মজা হল সেই সময়। বৃদ্ধ বলতে বলতে হেসে উঠলেন: কেমন করে রটে গেছে, গির্জার এক পাদরিকে লুকিয়ে রেখেছি আমরা ঐ বাড়িতে। টেগোরের দাড়ি ও লম্বা পোশাক দেখে ভেবেছে তিনি পাদরি। বিপ্লবের জের আছে তখনো, পাদরি-পুরুতের উপর লোকের রাগ। বড় লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ছিল তারা। জনতা একদিন হামলা দিয়ে পড়ল। আমরা বলি, মস্তবড় কবি, ভারত থেকে এসেছেন—মহামান্য অতিথি। তখন বলে দেখতে দাও ভাল করে। টেগোর উপরের বারান্দায় এলেন। সকালবেলা রোদে চারিদিক ভরে গেছে, তার-মধ্যে ঐ সুঠাম সৌম্য দীর্ঘদেহ এসে দাঁড়ালেন। মুগ্ধ জনতার জয়ধ্বনি উঠল। তখন আবার নতুন উপসর্গ—রোজ এসে ভিড় করে: টেগোরকে দেখব। কবি বারান্দায় বেরিয়ে আসেন, দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে লোকে ফিরে যায়।

১৯৫৭ অব্দে বার্লিনে গিয়ে শুনি কয়েক শ' মাইল দূরে কার্লে-মার্কস্তাদ (আগের নাম চেমনিজ) শহরে খুব জাঁকিয়ে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। অভিনয় দেখবার জন্য ভারতীয় আমাদের নিমন্ত্রণ এল। অভিনয়ের পরে রাত দুপুরে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এবং অভিনয়শিল্পীরা খাতির করে আমাদের হোটেলে চলে এসেছেন। ডিরেক্টর কেসলার রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। টেগোর এসেছিলেন, তখন যুবা আমি। তাঁর আশেপাশে ঘুরতাম।

আর কোথা যাবে! সকলে ধরে বসল, বলুন তাঁর কথা। আশ্চর্য কণ্ঠ, এমন মিষ্টস্বর কখনো শুনি নি। সৌম্য চেহারা, দুধের রঙের দাড়ি। অনেক করে বলা হল, কিন্তু টেগোর বক্তৃতা করলেন না। ডাকঘর অভিনয় করলেন।

আর একটি ঘটনা না বলে পারছি নে। চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে একদিনের ব্যাপার। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের নাতি আমার বন্ধু মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নিয়ে যাচ্ছেন একটা নার্সরী স্কুল দেখাতে। ট্রাম থেকে চৌমাথা মতন জায়গায় নেমে তিনি পথ গুলিয়ে ফেললেন। স্কুল কোন্ রাস্তায়, তা-ও মনে পড়ছে না। অস্থির হয়ে মোহনলাল পথচারী একে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন।

হেনকালে দেখি এক বুড়িমানুষ স্তিমিত দৃষ্টি স্থাপিত করছেন আমার দিকে। পুঁথিপড়ার মতন করে কি পড়ছেন! দ্রুতপায়ে চলে এলেন আমার কাছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলেন, তুমি কি ইণ্ডিয়ার মানুষ? দেখ, অনেক কাল আগে এক ভারতীয় কবি এসেছিলেন এই সহরে—টেগোর। দীর্ঘদেহ, জ্যোতিষ্মান চেহারা। টেগোর কবিতা পড়তেন, বাঁশির মতো কণ্ঠস্বর। ভাষা বুঝিনে, কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর লাগত।

বুকে থাবা দিয়ে বলি, ভারতীয় আমি তো বটেই—তদুপরি টেগোর কলকাতার বাসিন্দা, আমারও বাস সেই কলকাতায়।

আমাদের পরিবারের আদি পূর্বপুরুষের নাম হচ্ছে যাদু-কীর্তনীয়া, ওরফে যাদবানন্দ চৌধুরী। যাদু-কীর্তনীয়ার পুত্র জমিদার হয়ে ওঠেন। এবং সেইসময় থেকেই 'চৌধুরী' আমাদের পারিবারিক উপাধি হয়ে উঠল।

আমাদের পরিবারে গান-বাজনার রেওয়াজ একেবারে উঠে গেল। মুর্শিদকুলি-খাঁ যখন বাঙ্গলার নবাব ছিলেন তখন আমাদের জমিদারীর ভিতপত্তন হয়। এবং অদ্যাবধি এ পরিবার বেঁচে আছে। কিন্তু এ দীর্ঘকালের মধ্যে চৌধুরীবাবুদের কেউ গাইয়ে-বাজিয়ে হয়েছেন বলে শুনিনি।

অতএব আমি গানবাজনার আবহাওয়ার ভিতর মানুষ হইনি। আমার পৈতৃক ভদ্রাসন হচ্ছে হরিপুর গ্রাম, জেলা পাবনা। কিন্তু আমার জন্ম হয় যশোর-সহরে। পাঁচবৎসর বয়সে আমি যশোর ত্যাগ করি। যশোরেও কোন গানবাজনা শুনিনি। সেখানে আমাদের বাড়ীতে 'মুখুয্যে-মশায়' নামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি সেতার বাজাতেন। কিন্তু সেই পিড়িং পিড়িং আমার মনের উপর কোন ছাপ রেখে যায়নি।

যশোরে একটিমাত্র গান শুনি,—বোধহয় কোন ভিখিরির মুখে। সে গানটি আমার আজও মনে আছে—

গড় করি সে মেয়ের পায়
যে পায়ে ধান ভেনে দেয়।

তারপরে কৃষ্ণনগরে এসে আমার কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের মুখে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সদ্য-প্রকাশিত 'ব্রাহ্মসঙ্গীত'-বইয়ের কতকগুলি গান শুনি।....

এরপর আমি একদিন সন্ধ্যার সময় গোয়াড়ির বাজারে যাই। রাস্তায় একটি যুবক এক গান করতে করতে যাচ্ছিল। কি মিষ্টি

তার গলা, আর কি হৃদয়গ্রাহী তার সুর !···সেই অবধি আমি গানের ভক্ত হয়ে উঠি।

তারপর কৃষ্ণনগরে আমার এক সহপাঠী, 'বঙ্কু'-বলে একটি ছোক্‌রার কাছে কতকগুলি গান শেখে। 'বঙ্কু'র ছিল অতি চমৎকার গলা। তার আওয়াজ যেমনি মিষ্টি তেমনি দরাজ !···· নকল করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করি যে, আমার গলায় মিহি তান আছে।

বাড়ীতে একটি টেব্‌ল্‌-হারমোনিয়ম ছিল। দাদা সেটি বাজিয়ে গান গাইতেন।

দুঃখের বিষয়, দাদার সুর-সারের কান ছিল না, এবং গানের গলা মোটেই ছিল না। বাড়ী থেকে হারমোনিয়ম বিদায় হবার পর দাদা আর কখনো সঙ্গীতচর্চা করেননি। তারপরে যখন একটি পিয়ানো এল, তখন দিদি এক মিশনারি মেমের কাছে পিয়ানো শিক্ষা সুরু করলেন।····তাঁর পিয়ানো-শিক্ষা আমাদের একটা নিতান্ত উৎপাত বলে' মনে হত। সুখের বিষয় এই যে, দিদির ইংরিজী বাজনা-শিক্ষা এর বেশি আর এগলো না। মিশনারিরা তাঁকে জবাব দিলে, আমরাও বাঁচলুম।

এই সময়ে 'নেত্য'-বলে একটি বৃদ্ধা····মধ্যে মধ্যে মা'র কাছে এসে তাঁকে গান শোনাত। কি ভরাট তার গলা! সে গাইত ভারি ভারি রাগ। অধিকাংশই শ্যামা-বিষয়ের গান। সে ছিল জাতে হাড়ি; কিন্তু আজীবন সঙ্গীতশিক্ষা আর গান অভ্যাস করে' এ বৃদ্ধবয়সেও আমাদের মুগ্ধ করে' দিত।

এরপরে আমি যখন সাড়ে-তেরো বছর বয়সে কলকাতায় পড়তে আসি, তখন আবিষ্কার করে আশ্চর্য হলুম যে, কলকাতায় ভদ্র-সন্তানরা একদম সঙ্গীতছুট।

কলকাতা তখন ছিল এক রকম সঙ্গীতহীনা—অন্ততঃ আমার পক্ষে। কিন্তু বোধহয় সমস্ত কলকাতার বিষয় একথা বলা

অন্যায়। কারণ আমি শুধু ছাত্রসমাজই জানতুম, অন্য কোন সমাজ জানতুম না। পরের বৎসর আমি ইস্কুল ছেড়ে যখন প্রেসিডেন্সি-কলেজে ভর্তি হলুম, তখন একটি ছোক্‌রার সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখুয্যে। তার ছিল বিরাট শরীর, আর শুনলুম সে খুব ভাল সেতার বাজায়। পরে তার অপূর্ব সুরবাহার বাজানো শুনেছি। ইনিই সেই স্বনামধন্য গোবর-ডাঙ্গার জমিদার জ্ঞানদাপ্রসন্ন, যিনি কালক্রমে বাঙ্গলার অদ্বিতীয় সৌখীন সুরবাহারী হয়ে ওঠেন।

....সেকালে রবীন্দ্রনাথের কোন গান কারও মুখে শুনিনি। বছরতিনেক কলকাতায় থেকে আমি আবার কৃষ্ণনগর ফিরে যাই। কৃষ্ণনগর আমার ভাল লাগেনি,—সঙ্গীর অভাবে। পূর্বে যারা আমার সহপাঠী ছিল, তারা প্রায় সকলেই কলকাতা চলে গিয়েছিল। তারপর একদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে সত্য লাহিড়ী নামক দাদার সহপাঠী যুবকের গান শুনি।... এ গান শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। তারপর থেকে আমি রোজ সন্ধ্যাবেলা তাঁর ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে জুটতুম। তাঁর বন্ধুবান্ধবরা এবং তাঁর গুরু 'শশীকুমার' বলে' একটি ওস্তাদও সেখানে আসতেন। প্রায় নিত্য এই ডিস্পেন্সারিতে নানারকম গানবাজনা শুনেশুনে আমার ক্লাসিকাল গানবাজনার কান তৈরী হল।

বছরখানেক পর রবীন্দ্রনাথ দিন ৪।৫-এর জন্য আমাদের বাড়ীতে আসেন। সেখানেই তাঁর গান আমি প্রথম শুনি। গলা ছিল তাঁর আশ্চর্য। অথচ তাঁর গান একেবারে তানবর্জিত।

তারপর কলকাতায় ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথ বন্ধু-হিসেবে আমাদের বাসায় প্রায় প্রত্যহই আসতেন এবং প্রায় প্রত্যহই তাঁর স্বরচিত গান শুনতুম। তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীও সঙ্গে আসতেন। তিনি হারমোনিয়মে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গত করতেন। মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'অভিজ্ঞা'-নামে তাঁর এক ভাইঝিকে সঙ্গে

নিয়ে আসতেন। তার তুল্য গান গাইতে আমি আর কাউকে কখনো শুনিনি। যেমন তার গলা মিষ্টি, তেমনি তার গাইবার ধরন ছিল অতি সরস। তার মুখের একটি হিন্দী গান, "ঠাঢ়ি রহো মেরে আঁখন আগে" (ছায়ানট) আজ পর্যন্ত আমার কানে লেগে আছে। তার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, সে সমস্ত 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় বসে একটানা গাইতে পারত—অভিনয় করে। এমন দরদী গলা লাখে একজনের হয়। মেয়েটি অল্পবয়সে মারা যায়, তাই তাকে বেশি লোকে জানতে পারেনি! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার গানের অতিশয় ভক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার ৪।৫ মাস পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং অভিজ্ঞার বড়দিদি শ্রীমতী প্রতিভাদেবীর সঙ্গে দাদার বিবাহ হয়।

এরপর ১৮৯৩ খৃঃ-এ আমি বিলেত চলে যাই। তিনবৎসর পর ফিরে এসে নানা নাচগানের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকতুম। এইখানে আমি বলতে চাই-যে, বিলেত থেকে ফিরে-আসার পর আমি রবীন্দ্রনাথের নব-পর্যায়ের গানের রসগ্রহণ করতে সমর্থ হই। কারণ, বুঝতে পারি যে, সে-সব গানের সুর ক্লাসিকাল রাগরাগিণী থেকেই উদ্ভূত। এবং তার ২।৪টি গান আমি নিজেও গাইতে পারতুম,—যথা "আহা জাগি পোহালো বিভাবরী" (ভোঁরো), ও "তুমি যেয়ো না এখনি" (ভৈরবী)। তারপর বর্ষা-মঙ্গলের কয়েকটি গান, যথা "বাদল মেঘে মাদল বাজে", "তিমির অবগুণ্ঠনে", "যেতে যেতে একলা পথে"—এগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। এগুলি সবই গুরুগম্ভীর গান, যার সঙ্গে মৃদঙ্গের সঙ্গত করা চলে। আমি রবীন্দ্রনাথের বাউলের গান সম্বন্ধে কিছু বল্লুম না, কারণ সকলেই জানে, সেগুলি স্বদেশীযুগে, দেশের লোককে পাগল করে দিয়েছিল।

গীতবিতান বার্ষিকী। মাঘ ১৩৫০ ॥

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি

নীলরতন সেন

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি—এযুগের দুই পরম বিস্ময়। একজন কবি এবং দার্শনিক, আর একজন রাজনীতিক এবং দার্শনিক। দুজনের দর্শন এক,—অহিংসা, মানবপ্রীতি, বিশ্বমৈত্রী। একজন সেটা কাব্যে-সাহিত্যে প্রকাশ করলেন,—অপরজন সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে তার রূপ দিলেন। বহুবার নানা ভাবে এই দুই মহামানবের সাক্ষাৎকার হয়েছে। এখানে তারই দু'একটা ঘটনা উল্লেখ করি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি তখন (১৩১৪-তে) ইংরেজদের বর্ণ-বৈষম্য আইনের প্রতিবাদে অহিংস সত্যাগ্রহ করছিলেন। ব্যারিস্টার ভারতীয় যুবক এক নূতন শক্তির পরীক্ষায় নেমেছেন। যে শক্তির পরীক্ষা দিয়েছেন যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, অশোক, শ্রীচৈতন্য। গোখলে, তিলক, রবীন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুস প্রভৃতি ভারতের দেশসেবকরা মোহন-দাসের এই নতুন পদ্ধতিতে ইংরেজ অত্যাচারের প্রতিরোধ-আন্দোলন বেশ কৌতূহল নিয়ে দেখছিলেন। ভাবছিলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্যেও এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করলে কেমন হয়। গোখলে, এণ্ড্রুস, পিয়ারসন—একে একে ছুটলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। কেমন আন্দোলন চালাচ্ছেন এই যুবক,—স্বচক্ষে দেখতে চান তাঁরা। রবীন্দ্রনাথ নিজে যেতে পারলেন না,—এণ্ড্রুসকে লিখলেন—'শ্রীযুক্ত গান্ধী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আফ্রিকায় আপনারা যে আন্দোলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন তাতে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি গ্রহণ করুন।' আন্দোলন অনেকটা সফল হল। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার আপস-আলোচনা চাইলেন এই যুবকের সঙ্গে। যে লোক হিংস্র আঘাতের পরিবর্তে নির্ভীকভাবে প্রতিরোধ জানায়, তাকে

সঙ্গে এঁটে ওঠার কৌশল শাসকরা তখনো আবিষ্কার করতে পারেননি। ইংলণ্ড থেকে ইংরাজ সরকার ডেকে পাঠালেন গান্ধীকে। গান্ধী চললেন ইংলণ্ডে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে নয়—ইংরেজের অধীন সমস্ত উপনিবেশগুলির সমস্যার সমাধান চান তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি একটা স্কুল চালাচ্ছিলেন। ঠিক আমরা যাকে স্কুল বলি তেমন নয়। এখানে ধরা বাঁধা বই পড়া অথবা পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপার ছিল না। সবাই নানারকম কাজ-কর্ম করত। রান্না, ঘর পরিষ্কার, চাষবাস, এমনকি পায়খানা পরিষ্কার পর্যন্ত সব কাজই স্কুলের ছেলেরা আর মাস্টার মশাইরা মিলে করতেন। চাকর বাকর রাখাই হত না। সবাই সমান—গরীব বড়লোক বলে কোন ভাগাভাগি নেই সেখানে,—কে কার চাকর হবে। পরে ভারতে এসে এই রকম স্কুল খুললেন প্রথম সবরমতীতে তারপর ওয়ার্ধায়। কিন্তু গান্ধীতো চললেন ইংলণ্ডে—সেখান থেকে জন্মভূমি ভারতে আসবেন। ভারতের স্বাধীনতা আনতে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালানো যায় কিনা পরীক্ষা করতে চান তিনি। এই স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের কোথায় রাখবেন। ভারতে পাঠানোই ঠিক করলেন এবং হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রমে প্রথম রাখলেন তাদের। কিন্তু এমন বর্ণাশ্রম ধর্মের আশ্রম তাঁর ভালো লাগতে পারে না; জাতিভেদ যিনি মানেন না তিনি গুরুকুলে ছাত্রদের রাখেন কি করে? ভাবছিলেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে এদের রাখা চলে কি না। বোধ হয় দীনবন্ধু এণ্ড্রুসকে বলেছিলেনও এ সম্পর্কে। তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা হয়ে গেল। এণ্ড্রুসকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গুরুকুল থেকে ছাত্র ও শিক্ষকদের শান্তিনিকেতনে আনালেন। ইংলণ্ডে কর্মব্যস্ত গান্ধীজি আকস্মিকভাবে একদিন একটি চিঠি পেলেন—

প্রিয় শ্রীগান্ধী।

আপনার স্কিংক্‌স্ (স্কুলটির নাম) ছাত্রদের ভারতে এনে আমার বিদ্যালয়ে রাখাটাই যে আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেছেন তাতে সত্যিই আনন্দ পেলাম। এই প্রিয় ছাত্রদের এখানে আমাদের মধ্যে পেয়ে সে আনন্দ আজ আরও বেশী উপভোগ করছি। আমরা সবাই এটা বুঝতে পারছি, এদের প্রভাব শান্তিনিকেতন ছাত্রদের ওপর যথেষ্ট ভাল ফল দেবে। আপনি আপনার ছেলেদের এখানে পাঠিয়ে আমাদের দুজনের সাধনার যে মিলনের সুযোগ দিলেন তারজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই চিঠি লিখছি!

আপনার বিশ্বস্ত—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোধ হয় এইটিই গান্ধীজিকে লেখা কবির প্রথম চিঠি। প্রথম সাক্ষাৎকারের কথাটাও এখানে বলি।

গান্ধীজি বিলাত থেকে সোজা ভারতে ফিরলেন সেবার। পুণায় অসুস্থ গোখলেকে দেখে এলেন শান্তিনেকেতনে, সঙ্গে পত্নী কস্তুরবা। গান্ধীজির দুই ছেলে তখন স্কিংক্‌স্ স্কুলের ছাত্র। তারা-তো আগেই শান্তিনিকেতনে এসে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনিও কলকাতা হয়ে শান্তি-নিকেতন ফিরছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই নতুন বাধা ঘটল। কবির শান্তিনিকেতন পৌঁছবার দুদিন আগেই গান্ধীজি আবার পুণায় ফিরে গেলেন মহামতি গোখলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। এটা ১৩২১, ৯ই ফাল্‌গুনের ঘটনা। গান্ধীজি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরলেন ২২শে ফাল্‌গুন। এবারে দুই মহামানবের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটল। কিন্তু প্রায় ৮।১০ বছর ধরেই দুজনের পারস্পরিক ভাবধারার বিনিময় চলছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারে দুজনের কাছেই দুজনকে অপরিচিত

মনে হয়নি, যেন বহুকালের চেনা। দুজনের দেখা হয়ে গেল পৃথিবীর পরিক্রমা পথে।

সেবারে শান্তিনিকেতন আশ্রমে গান্ধীজি যে সব সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন নিজের আত্মজীবনীতে তার উল্লেখ করেছেন। তাতে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সব কাজ ছাত্র-শিক্ষক মিলে করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিদ্যার্থীরা যত স্বাবলম্বী হয় ততই মঙ্গল। রবীন্দ্রনাথেরও এ ব্যবস্থা ভালো মনে হয়েছিল। ছাত্রদের তিনি বলেছিলেন—এর মধ্যেই স্বরাজের চাবি রয়েছে। এসময় থেকে বেশকিছু দিন রান্না, জল তোলা, বাসন ধোয়া, ঝাড়ু দেওয়া, পায়খানা পরিষ্কার করা সবই বিদ্যার্থীরাই করতেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নানাকারণে শান্তিনিকেতনে এব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১০ই মার্চ ১৯১৫ থেকে গান্ধীজির এ নীতি শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীরা মেনে নিয়েছিলেন :—এখনও প্রতি বছর ১০ই মার্চ আশ্রমবাসীরা গান্ধীদিবস পালন করেন—সে দিনটাতে চাকর বাকর মেথরদের ছুটি দিয়ে সব কাজ নিজেরাই করেন।

গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ—পরস্পরের ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভালোবাসা থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির সব কর্মনীতি পছন্দ করতেন এমন নয়। যেমন, গান্ধীজির চরকা-খদ্দর-নীতি। সবাই মিলে চরকা কাটলে তাতেই স্বরাজ আসবে এমন যুক্তিহীন কথার রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেছেন। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র যে সময়ে চরকা কাটেন সেই সময়টা বিজ্ঞান চর্চা করলেই দেশের বেশী মঙ্গল হবে। কবির কথা হোলো,—'সব মানুষ মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে বিধাতা এমন ইচ্ছা করেননি। ··চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' আবার গান্ধীজির রাজনৈতিক কারণে অনশন করাও কবি পছন্দ করতেন না। চিত্তশুদ্ধির জন্যে

অনশন ভারতের প্রাচীন রীতি। কিন্তু রাজনৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য অনশন করে দেশবাসীদের উৎকণ্ঠা বাড়ানোর কোনও যুক্তি রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন না। তবু ১৯৩২-এ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদে গান্ধীজি যখন পুণার যারবেদা জেলে অনশন করলেন—রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হয়ে গান্ধীজিকে এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাক-ডোনাল্ড্‌কে তার করলেন। আরও উৎকন্ঠিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটে গেলেন পুণাতে। সেবারে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাতে ইংরেজ-রাজ নতুন আর এক চাল চেলেছিল। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ তো আগে থেকেই তৈরী করেছে। এবারে হিন্দুদের মধ্যে আবার বর্ণহিন্দু আর তপশিলী হিন্দু বলে দু'ভাগ করে তপশিলীদের কিছু আলাদা সুযোগ-সুবিধা দেবার প্রস্তাব দিল। আসলে ঘর ভেঙে দু'খানা করে শান্তি নেই,—চারখানা করতে এগিয়ে এলো। সফলও হল কিছুটা। তারই প্রতিবাদে অনশন করলেন গান্ধীজি। অনেক কষ্টে সেবারে আপস হল, গান্ধীজির প্রাণ রক্ষা হল। দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কবি অনেকটা শান্তি নিয়ে ফিরে এলেন আশ্রমে।

দুই মহাপুরুষের জীবনের কত ঘটনাই মনে আসে। ১৯৩৬ সাল—মার্চ মাসের দুঃসহ গরম। ৭০ বছরের বৃদ্ধ কবি বেরিয়েছেন দলবল নিয়ে উত্তরভারত পরিক্রমায়। শান্তিনিকেতনের তহবিল নিঃশেষ হয়ে গেছে। অভিনয়, নাচ-গানের আসর বসিয়ে টাকা তুলতে চান কবি। পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর হয়ে দিল্লী এলেন কবি, গান্ধীজি কস্তুরবাকে নিয়ে সেদিনই কবির সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এলেন। কবির হাতে ষাট হাজার টাকার একটি চেক দিয়ে বললেন, 'এ বয়সে আপনার মতো কবির পক্ষে এমন ভাবে টাকার জন্যে ঘুরে বেড়ানো ঠিক হবে না—এই টাকায় বিশ্বভারতীর ঋণ-ভার শোধ হবে আশাকরি।' এমন মহানুভবতার দৃষ্টান্ত জগতে কটি পাওয়া যাবে?

ওপারের ডাক—কবিগুরু আর মহাত্মা—দুজনের জীবনেই ধীরে

বাল্মীকি'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

ধীরে পৌঁছাচ্ছিল যেন। ছোট্ট ঘটনা দুটি বলি। ১৯৩৭—সেপ্টেম্বর। কবি তখন শান্তিনিকেতনে। এক সন্ধ্যায় সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ চোখে আঁধার নেমে এল। চেতনা হারালেন কবি। দুনিয়ার সব প্রান্ত থেকেই অনবরত টেলিগ্রাম আসছে—কবির জন্যে উৎকণ্ঠিত সকলে। গান্ধীজিও ঘন ঘন খবর নিচ্ছেন তার-যোগে। কবির জন্য তাঁরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। দুদিন পরে করি জ্ঞান ফিরে পেলেন ডঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসায়। শত শত চিঠি আর তাদের স্তূপ জমে উঠেছে। সুস্থ হয়ে কবি প্রথম জবাব দিলেন দুটি শিশুর চিঠির। গান্ধীজিকে সেবার লিখলেন—'অচেতন অবস্থা কাটিয়ে উঠে প্রথমেই ভালো লাগল আপনার স্নেহপূর্ণ উৎকণ্ঠার কথা ভেবে। এ রোগ ভোগের আসল দামের অনেক বেশী আমি পেয়ে গেছি।' কবির যোগ্য উত্তর বটে!

—একমাস পরের ঘটনা। ১৯৩৭—অক্টোবর। কবি একটু সুস্থ হয়ে আরও চিকিৎসার জন্যে বেলঘরিয়াতে এসে রয়েছেন। গান্ধীজিও কংগ্রেসের মিটিং-এর জন্য তখন কলকাতায়। জওহরলাল, কৃপালনী, সরোজিনী নাইডু—একে একে সবাই কবির সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। গান্ধীজিও ভাবছেন, কবি অসুখ থেকে উঠেছেন সবে, দেখে আসবেন গিয়ে! গাড়িতে উঠতে যাবেন, নিজেই অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। এবারে কবির ছুটে আসার পালা। শরৎ বসু টেলিফোনে কবিকে জানালেন। কবি এসে মহাত্মাকে দেখে গেলেন। এক মাসের ব্যবধানে দুজনের একই ধরনের অঘটন ঘটে গেল। দুজনের সেদিনের সাক্ষাৎকার তাঁদের ওপারের ডাক সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিল কি? কবি তো আরও আগে থেকেই মন তৈরী করে নিচ্ছিলেন। গান্ধীজি?—তিনি যে সমাজ-কর্মী; এত ভাবপ্রবণ হলে চলে না, ডাক শুনলেও উপেক্ষা করতে চেয়েছেন, শত বছর পরমায়ু চেয়েছেন। তখনো ৪০ কোটি ভারত-বাসীর স্বাধীনতা আসেনি যে!

দুজনের শেষ সাক্ষাৎকারের কথা দিয়ে এবারে শেষ করি। ১৯৪০, ১৭ই ফেব্রুয়ারী। এই শেষবার কবি বেঁচে থাকতে শান্তি-নিকেতনে এলেন গান্ধীজি আর কস্তুরবা। বাংলাদেশ তখনো সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজির বিরোধ ভোলেনি। রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনে আম্রকুঞ্জে গান্ধীজিকে মাল্যভূষিত করে স্বাগত জানালেন। ২৫ বছর আগে এই শান্তিনিকেতনে গান্ধীজি প্রথম এসেছিলেন,—তাঁর ছাত্রদের কবি সেদিন এখানে স্থান দিয়েছিলেন। এবারেও প্রায় ১৫ বছর পর এলেন। অতীতের কথাই মনে আসছিল দু-জনের। দুই মহামানবের সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল সেবারে। সন্ধ্যাবেলায় একাগ্রমনে চণ্ডালিকার অভিনয় দেখলেন মহাত্মাজি। শান্তিনিকেতন ছাড়বার মুখে কবি একটি পত্র দিয়ে গান্ধীজিকে সেটি পথে যেতে যেতে পড়তে বললেন। সে পত্রে কবি তাঁর অবর্তমানে শান্তিনিকেতনকে দেখতে মহাত্মার কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ৭৯ বছর বয়সে কবি বুঝেছিলেন তাঁর দিন আসন্ন হয়েছে। গান্ধীজি পত্রের উত্তরে কবিকে আশ্বস্ত করেছিলেন—এবং দেশ স্বাধীন হবার পর মৌলানা আজাদ গান্ধীজির অনুরোধে আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে শান্তিনিকেতনকে মুক্তও করেছেন।

গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে সম্বোধন জানিয়ে যেমন তাঁর শিষ্যত্ব নিয়েছেন, অন্যদিকে কবিগুরুও মহাত্মা সম্বোধনে গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন—

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
    কেউবা ধনী কেউবা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল,—
গরীব মেরে ভরাই নে পেট'
ধনীর কাছে হই না তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।

মৃত্যুর ছ' সাত মাস আগে লিখা এইটি বোধ হয় কবির গান্ধীজির উদ্দেশে শেষ প্রশস্তি।

রবীন্দ্রনাথের গান

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

…বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে নতুন যুগ এনেছেন। উত্তর ভারতের নানান ধরনের গান শুনে মনে হয় যে, সঙ্গীত-ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ওস্তাদী-সঙ্গীতে অভ্যস্ত হলেও নিজে ওস্তাদ নন, যদিও তাঁর কাছে আমি একাদিক্রমে দশখানি ভালো খেয়াল শুনেছি।…

রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব—উচ্চস্তরের। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ভাষা ও ভাবের দিক থেকে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ্ বলে তাকে উপযুক্ত নতুন সুরে মূর্ত করা আরো শক্ত। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ সুরে এমন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা এনেছেন যার সঙ্গীত হিসাবে মূল্য তানসেন-কৃত দরবারী কানাড়া, কিংবা মিয়া-কী মল্লার অপেক্ষা কম নয়। রবীন্দ্রনাথের ধারাটি কিন্তু কোনো মোগলাই তারিখের তোয়াক্কা রাখে না। এক সময় অবশ্য ছিল, যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সুরের ছকে গান বসাতেন। যখন থেকে দেশী সঙ্গীত, অর্থাৎ বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের স্রোত তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করলে তখনই তিনি নিজের সন্ধান পেলেন, স্বাধীন হলেন। এতদিন হচ্ছিল অনুকরণ, হাতে খড়ি, এবং শুরু হল সৃষ্টি। এই বোধ হয় জীবনের রীতি। দেশের সন্ধান, দরবার ও নগরের বাইরের মাটির ও গ্রামের সন্ধান, শূদ্র ও যবনের সন্ধান যখন পাওয়া যায়, তখনই মানুষ, জাতি, সভ্যতা, নবজীবন লাভ করে। মাটির সন্ধান পেয়েছেন বলেই রবিবাবু সঙ্গীতকে নবজীবন দিতে পেরেছেন। রবিবাবু যে সব গান লিখেছেন—সেসব একেবারেই নতুন, তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, যার তুলনা আমাদের দেশে অন্ততঃ নেই।

বক্তব্য ॥

মহাকবি

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, কিন্তু অধিকাংশ মহাকবিদের মতো তিনি মহাকাব্য রচনা করেন নি। যাঁরা মহাকাব্য রচয়িতা তাঁদের একটা সুবিধা আছে। একটা দেশের কিংবা জাতির সমগ্র জীবনকে নিয়ে তাঁদের কাব্য। ঐ যে বলেছে—'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে'—এ খুব খাঁটি কথা। ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবন মহাভারতের মধ্যে যেমনভাবে ধরা পড়েছে এমন আর কোথাও নয়। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র—সমাজের সকল স্তরের মানুষ এখানে এসে মিলেছে। এমন সর্বব্যাপী রসের ভোজ পৃথিবীর কম গ্রন্থেই আছে। মহাভারতের সম্পর্কে যে কথা বলেছি হোমারের কাব্য সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। মহাকাব্যকে বলা চলে সাহিত্যিক পংক্তি ভোজনের মহোৎসব। সেইজন্যে এদের আবেদন এত বিস্তৃত। একজন সুর করে পড়বে, দশজন শুনবে। যে নিরক্ষর সে-ও রসে বঞ্চিত হবে না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সেক্সপীয়রও মহাকাব্য লেখেননি, এবং তাঁরও দেশের বেশির ভাগ লোক তখন ছিল নিরক্ষর। কিন্তু তিনি তাঁর নাট্যসাহিত্যে জীবনের যে চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন তা অভিনয় মাধ্যমে অতি সহজেই নিরক্ষর মানুষেরও দৃষ্টিগোচর এবং শ্রুতিগোচর হতে পারত।

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য রচনা করেননি—তাঁর মানে এই নয় যে তাঁর কাব্যে এবং সাহিত্যে সামগ্রিক জীবনের রূপ ফুটে ওঠেনি। অসংখ্য গানে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে তিনি পরিপূর্ণ জীবনের আলেখ্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। মহাকবি যেমন সমগ্র জীবনকে প্রতিবিম্বিত করেন রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন কিন্তু সেই সমগ্র জিনিসটি সহস্র কবিতায়, গানে, অজস্র কণায় ছড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করবার সহজতম

মাধ্যম তাঁর গান—তাঁর গান বেঁচে থাকবে নিরবধিকাল! কারণ গান তো কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, তারও চাইতে বেশি। সাহিত্য ছাড়াও চলে যায় কিন্তু গান ছাড়া চলে না, প্রশ্বাসবায়ুর মতো এ জিনিস অত্যাবশ্যক। কত কত সাহিত্য-খ্যাতি লোপ পেয়ে গেল কিন্তু নিধিবাবুর টপ্পা বেঁচে আছে। নিজের গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই পৃথিবীকে ভালোবেসেছি, মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—

'ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান
সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি
সে গানে মোর রহুক স্মৃতি
আর যা কিছু হউক অবসান।'

গান সম্পর্কে তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। সঙ্গীতজ্ঞ শিষ্যদের বলতেন, 'শহরে গ্রামে যেখানেই যখন যাও, আমার একটি গান কারো গলায় দিয়ে এসো।'

কবি রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও তাঁর আরেকটি পরিচয় আছে। সেখানে তিনি স্বদেশবৎসল রবীন্দ্রনাথ, পল্লী-সংগঠনকারী রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই পরিচয়টি—দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট নয়। অনেকে জানেন না যে, ভারত সরকার কমিউনিটি পরিকল্পনা নামে যে পল্লী সংগঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের আদর্শে অনুপ্রাণিত। বাস্তবিক পক্ষে চল্লিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পল্লী সংগঠনের যে কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলেন বলতে গেলে অবিকল সেটিই ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। এ যুগের মহাভারত রচনায় হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি গ্রাম শ্রীসৌন্দর্যের নিকেতন হয়ে উঠবে, এই ছিল তাঁর অন্তরের বাসনা।

দেশ। সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৭॥

বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'য় দেখা যায়, কবির 'বাল্মীকি প্রতিভা' জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মধ্যে মধ্যে অভিনীত হ'ত, সুতরাং এর অনেকবার অভিনয় হয়েছে; এর মধ্যে শেষ অভিনয় আমার প্রবন্ধের বিষয়।

আমার বয়স তখন ১৫।১৬ বছর—পাড়াগাঁয়ের স্কুলে পড়তাম—গ্রীষ্মের ও শীতের ছুটিতে কলকাতায় আসতাম। আমার বড়দাদা মহর্ষিদেবের সংসারে খাজাঞ্চি ছিলেন—কলকাতায় তাঁর বাসায় থাকতাম, কিন্তু আমার অধিকাংশ সময়ই তাঁর অফিসে কাটত। তাঁর কাছে কবির অনেক কথা শুনতে পেতাম। একবার শীতের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি—বড়দাদার কাছে শুনলাম, বাবুদের বাড়িতে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় হবে—খুব ধুমধাম—প্রত্যহই রিহার্সাল হচ্ছে। কবির কলকণ্ঠের গানের ভূয়সী প্রশংসা আগেই লোকের মুখে মুখে শুনেছিলাম—শ্রবণপ্রত্যক্ষ করার ভাগ্য কখনও হয়নি। তাই অভিনয়ের কথা শুনে বড় আনন্দ হল। দিন গুনতে লাগলাম—ক্রমে অভিনয়ের দিন নিকট হল। তখন বড়দাদা বললেন, 'দু-দিন অভিনয় হবে—প্রথম দিন সাহেব-সুবো, কলকাতার বড় বড় মান্যগণ্য লোক অভিনয় দেখবেন—পর দিনের অভিনয় সাধারণের জন্য, সে দিন তুমি গেলে দেখতে পাবে।" আমি সেই আশায়ই থাকলাম।

বাড়িতে এই শেষ 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয়ে খুব ধুমধামই হয়েছিল সত্য। এর পরে শান্তিনিকেতনে কবির উদ্যোগে মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের এই নাটকের অভিনয় দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এ সব অভিনয়ের তুলনাই হয় না। তখন লর্ড ল্যান্সডাউন

বড়লাট। 'ঘরোয়া'য় দেখা যায়, মহর্ষিদেব এই অভিনয়ের মূল কারণ, তাঁর কি খেয়াল হয়েছিল, লেডী ল্যান্স্‌ডাউনকে পার্টি দেবেন, তাই তাঁর হুকুম 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী) নিকট শুনেছি, সত্যেন্দ্রনাথ এক বার যখন বিলাত থেকে আসেন, সেই সময়ে সেই জাহাজে লেডী ল্যান্স্‌ডাউন যাত্রী ছিলেন। কথোপকথন-প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ লেডী ল্যান্স্‌ডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আহ্বান করার কথা উত্থাপন করেন। বোধ হয় এ কথা ক্রমে ক্রমে মহর্ষিদেবের কানে উঠেছিল, তাই তাঁর এরূপ খেয়াল। মূল কারণ যাই হোক, এইবার 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় সর্ববিলক্ষণ—খুব জাঁকজমক হয়েছিল। অর্ধচন্দ্রাকারে নির্মিত রঙ্গমঞ্চের সুশোভন সজ্জা—নাটকীয় দৃশ্যপটে স্বভাবের অনুকরণে বনের নিখুঁত পরিপাটি—দস্যুদলপতি ও দস্যুদের অনুরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ, কবির দস্যুপতি বাল্মীকির সাজ,—আর আর অভিনেতা-অভিনেত্রী, সকলেরই পাত্রোচিত বেশভূষা—সবই বেশ মনোমোহকর হয়েছিল—তাই বলি, এ অভিনয় সর্ববিলক্ষণ।

বড়দাদার সঙ্গে আমি অভিনয় দেখতে গেলাম। বাড়ির মধ্যে যে বিস্তৃত আঙিনা, দেখলাম তা শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট দর্শকে পরিপূর্ণ—মাথায় মাথায় লাগালাগি—মাথায় মাথায় মাথাময়—ন স্থানং তিলধারণে। আঙিনার উত্তরে দালান—তার বারাণ্ডায় কোন প্রকারে একটু স্থান হল। দূর হলেও সেখান থেকে রঙ্গমঞ্চ বেশ দেখা যাচ্ছিল। নাটক আরম্ভ হল। প্রথমে বনদেবীর নৃত্য—পরে দস্যুদলের আবির্ভাব।....আমি এসব দেখছিলাম বটে, কিন্তু মনে একটা কথা সর্বদাই জাগছিল—সেটা কবির কথা, কতক্ষণে বাল্মীকির বেশে কবিকে দেখব—কখন তাঁর কলকণ্ঠের গান শুনতে পাব। অত্যন্ত ঔৎসুক্য—তখন দেখলাম, দস্যুপতি বাল্মীকির বেশে কবির প্রবেশ—লম্বা জোব্বা-পরা, গলায় শঙ্খ ঝুলছে—ডাকাত ডাকবার। একে কবির সহজ-মনোমোহন রূপ, তাতে যৌবনের

ললিত লাবণ্যচ্ছটা, অনুকূল পোশাক-পরিচ্ছদে সৌষ্ঠবসম্পন্ন—তাতে আবার রঙ্গমঞ্চের পরিস্ফুট আলোকপ্রভা প্রতিভাত—সে সৌন্দর্য আরও মনোমোহকর হয়েছে। দর্শকেরা কবির সেই বাল্মীকিবেশ দেখে চিত্রার্পিতের মত নিষ্পন্দ নির্বাক নির্নিমেষনেত্র। তখন কবির কলকণ্ঠে সঙ্গীত শোনা গেল—কবি গাইলেন,

'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে॥
কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কি জানি?
প্রতি-জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!' ইত্যাদি।

এর পরে বাল্মীকির প্রস্থান। তার পরে, দৃশ্য কালী প্রতিমা—বাল্মীকির স্তবগান,

'রাঙা পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা॥
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব কর,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোর উন্মাদিনী-পারা।' ইত্যাদি

একে মধুর কণ্ঠ, তাতে সময়োপযোগী বাগেশ্রী-রাগিণীর সুরে ছন্দোবন্ধনে—সেই স্তুতিগীতি স্বরসম্পদে সম্পূর্ণ হয়ে আসর একেবারে মাত করে ফেললে! গান গাওয়া শেষ হলো—বাল্মীকি নেপথ্যের অভিমুখ হলেই, দর্শকদের মধ্যে মহাকোলাহল উঠলো—'এন্‌কোর', 'এন্‌কোর'! সকলেই কবির সেই এক-ফেরতা গান শুনে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি, আবার শোনবার জন্যে সমুৎসুক! কবি কি করবেন—আবার ফিরলেন—গানের পূর্ববৎ আমূল পুনরাবৃত্তি হল—কবি নেপথ্যে অন্তর্হিত হলেন। আর 'এন্‌কোর' হল না, কিন্তু সকলে অতৃপ্ত না হলেও, সুতৃপ্ত হওয়ার ভাব মুখে দেখা গেল না—আমি সামান্য শ্রোতা—দর্শক, আমার কথা কি বলবো! এর পরে

সরস্বতীর আবির্ভাবে তদ্‌গতচিত্ত কবির রামপ্রসাদী সুরের শ্যামাসঙ্গীত,

'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা !
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা !
এতদিন কি ছল করে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি,
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়ন-জলে গলেছি মা।'

ইত্যাদি।

মধুর প্রসাদী সুর সহজেই শ্যামাসঙ্গীতের অনুকূল—তাতে কবির মধুর কণ্ঠে আরও মধুরতর হয়ে সঙ্গীত সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়েছিল। সে সময়ে এই দুটি গানের সুর আমার কানে এমন মিষ্টি লেগেছিল যে, তা বলবার নয়, অনুভবেরই বিষয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ের কথা শুনলেই, এখনও কবিকণ্ঠে গীত এই দুটি গানের সুরের অনুরণন আগেই কানে বেজে ওঠে—সে এক কেমন মদিরভাবমাখা সুর !

'রিম্‌ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে' ইত্যাদি বর্ষণের গানের সময়ে রঙ্গমঞ্চে বৃষ্টিধারাপাত ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা বজ্রের কড়-কড় ঘোর শব্দ—মেঘাড়ম্বরে গড়গড় গম্ভীর গর্জনে বর্ষার মূর্তি অনুকরণের সৌষ্ঠবে যেন স্বাভাবিক বলে বোধ হয়েছিল। 'ঘরোয়া'য় দেখি, সাহেব-মেমরা এই দৃশ্যে স্বাভাবিকের অনুকরণপটুতায় বড় খুশি হয়েছিলেন—হাততালির পর হাততালি পড়েছিল। এদিনও বর্ষার দৃশ্য অঙ্গহীন হয়েছিল বলে মনে হয় না, এর পরে ক্রৌঞ্চমিথুনের পালা—ব্যাধশরে ক্রৌঞ্চবধ—ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপে করুণবেদী বাল্মীকির কণ্ঠ হতে ক্রৌঞ্চীশোকে অতর্কিতভাবে শ্লোকের উচ্চারণ—'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।...

এর পরে সরস্বতীর আবির্ভাব, পরের দৃশ্যে লক্ষ্মী আবির্ভূতা—লক্ষ্মীর পরীক্ষা। ইন্দিরা দেবী মূর্তিমতী ইন্দিরা হয়েছিলেন। ধনরত্নরাশি-ধূলিরাশিতে ভারতীগত-চিত্ত বাল্মীকি কবি বীতস্পৃহ,

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—অনাদৃতা লক্ষ্মীর তিরোভাব, তাই কবিকণ্ঠে কমলার বিদায়ের গান,

'দেবী গো, চাহি না চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক্,—হয় হোক্—
আমি দেবী, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এস না এস না,
এস না এ দীনজন-কুটীরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না!

এইবার শেষ দৃশ্য—বিদায় সমাদর—প্রিয়তম বরপুত্রকে বর দিতে সরস্বতীর পটভূমিকায় আবির্ভাব! দেবী সর্বশুক্লা—শুক্লবর্ণ—শুক্ল বাস—শুক্ল হাস—শুক্ল পদ্মে সমাসীনা—শুক্ল হস্তে তুষারসারশুভ্র শুক্ল বীণা—সর্বাঙ্গ শুক্ল পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত—কেবল বীণার তারে সংলগ্ন বাঁ হাতের শুক্ল বাঁকা আঙুলগুলি অবধি কনুই পর্যন্ত সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল—যেন ভুজাকারে কোঁদা তুষারদণ্ড, ডান হাত বীণার অন্তরালে—তত সুস্পষ্ট নয়। দূরে ছিলাম—বোধ হল, যেন মৃন্ময়ী সরস্বতী প্রতিমা। অনির্বচনীয় শোভা। সরস্বতী পদ্মাসন থেকে উঠলেন, হাতের বীণা বাল্মীকির হাতে দিলেন, বললেন,

'আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণপ্রাণ!
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোর কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত!

এই যে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে-সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার !'

বীণাপাণির শুভক্ষণে উচ্চারিত এই বরবাণী-বরপুত্র কবির জীবনে সত্যসত্যই বর্ণে বর্ণে সার্থক হয়েছিল !

এই প্রবন্ধে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র যে সব দৃশ্য বর্ণনা করলাম তাহা আমার প্রত্যক্ষ। দেখার পরে প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হয়েছে, সব মনে না থাকা আশ্চর্যের বিষয় নয়। যে কয়টি দৃশ্য মনে ছিল, তাহাই লিখলাম—পর পর বিষয়গুলির বর্ণনার কোন অভিপ্রায় নাই।

রবীন্দ্রনাথের কথা ॥

জন্-এর চোখে গুরুদেব

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমরা তাকে শুধু জন্ ব'লেই জানতুম। নিশ্চয়ই তার একটা কোনো পৈতৃক পদবী ছিলো। কিন্তু তা নিয়ে আমরা কেউ কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। আমাদের কাছে কেবল জন্ই ছিলো যথেষ্ট··

সে একটা ক্যাবস্টলের মালিক। এই ক্যাবস্টলের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। নইলে ব্যাপারটা সকলে সঠিক না-ও বুঝতে পারেন। চার চাকার উপর বসানো একটা ছোট্টো কাঠের ঘরের মতন গাড়ি। তার ভিতর আছে টুকিটাকি রাঁধবার কিছু সরঞ্জাম। আর আছে কিছু পরিবেশনের পাত্র—এই খানকয়েক পেয়ালা-পিরিচ, পেলেট-গেলাস, দস্তার কাঁটা-চামচ।

রান্না সামান্যই। জন্-এর ক্যাবস্টলে পাওয়া যেতো ডিমসেদ্ধ, হ্যাম্-স্যাণ্ডউইচ, ফিশ অ্যাণ্ড চিপ্ আর রোস্ট-করা ডুমো-ডুমো ওয়ালনাট্। ধোঁয়া-ওঠা গরম এক পেয়ালা কফির সঙ্গে তার যে-কোনো একটা খেতে বেশ উপাদেয়। স্টলটা রাস্তার উপরেই। স্টলের কাউন্টারে ঠেসান দিয়ে পথে দাঁড়িয়ে খাওয়া—সে বড়ো এক মজাদার ব্যাপার।

দিনমানে ক্যাবস্টলগুলো দেখতে পাওয়া যায় না। ভোররাত্রে চাকাসুদ্ধ স্টল টেনে নিয়ে গিয়ে মালিকের বাড়ির কাছে রাখা হয়। সন্ধ্যের মুখে আবার সে ঘর স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসে।

জন্-এর স্টলটা ছিলো আমাদের পাড়ার মধ্যেই। আমাদের বাড়ির রাস্তা থেকে দুটো মোড় নিলেই জন্কে দেখতে পাওয়া যেতো। স্টলের ভেতরে সে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে। একমাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া পাকা চুল। গালের দু-ধার বেয়ে দুটো মটনচপ

দাড়ি। থুঁতনির সমস্তটাই কামানো। গোঁফ পরিষ্কার ক'রে চাঁচা। ভারী সৌম্যমূর্তি।

রোববার ছাড়া আমি প্রত্যহ দু-বার ক'রে জন্-এর স্টলে যেতুম। একবার সন্ধ্যের দিকে, যখন সে সবে আড্ডা গেড়েছে। তখন গল্প করবার জন্যে। আর একবার রাত্তির সাড়ে দশটা-এগারোটায়। তখন যেতুম খাবার জন্যে। আমাদের জন্ ধার্মিক ক্রীশ্চান। রবিবারে পারতপক্ষে কখনো দোকান খুলতো না। শুনেছিলুম, ওইদিন সকাল-সন্ধ্যে দু-বেলাই সে গির্জেয় যেতো। দুপুরে নাকি বাইবেল খুলে বসতো।

নিঃসঙ্গ বিদিশি ছাত্র দেখে আমার উপর জন্-এর কেমন একটু মায়া পড়ে গিয়েছিলো। সন্ধ্যেবেলায় স্টল সাজিয়ে সে আমায় কতো রকমের গল্প ক'রে শোনাতো। পুরনো লণ্ডন শহরের কতো বিচিত্র কাহিনী।

১৯২০ সালের জুন মাস। তখন আমি এক-হিড়িকে তিন-তিনটে প্রিলিমনারী বার্-এগ্জামিন কোনোরকমে একসঙ্গে থার্ড ক্লাসে পাশ ক'রে ব'সে আছি। ফাইনাল এগ্জামিন অনেক দূরে। যখন ইচ্ছে তখন তৈরী হয়ে নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া চলবে। হাতে কাজ নেই। তাই খেয়াল হলো, উপনিষদের বাছাই-বাছাই শ্লোক-গুলো ইংরিজিতে তর্জমা করি।

এমনি চলেছে, এমন সময় উইলি পিয়ার্সন এসে খবর দিলেন, গুরুদেব লণ্ডনে আসছেন। শেষে একদিন গুরুদেব সত্যই এসে পড়লেন। এসে, আমাদেরই বাড়ির কাছে কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসনে উঠলেন। কাছে ব'লে কাছে। আমার ওখান থেকে এক লাফে সেখানে পৌঁছানো যায়। আমাদেরই ডি-ভিয়র গার্ডেন্স রাস্তার ঠিক মোড়ের উপর।

রোটেনস্টাইন গুরুদেবের জন্যে ওই জায়গাটা ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির থেকে কাছে হবে ব'লে। রোটেনস্টাইন

তখন নিকটেই নটিংহিল গেটে শেফিল্ড টেরাস ব'লে একটি রাস্তায় বাস করেন। সেখান থেকে তিনি একদিন কেনসিংটনে গুরুদেবের কাছে আসতেন, একদিন গুরুদেব নটিংহিল গেটে রোটেনস্টাইনের বাড়ি যেতেন।

একদিন—পড়তে-পড়তে রাত্তির বারোটা বেজে গেলো। আর না। বই রেখে উঠে পড়লুম। চললুম জন্-এর স্টলের দিকেই। আন্‌মনা হ'য়ে ডি-ভিয়র গার্ডেন্স-এর রাস্তা দিয়েই হাঁটছি। মোড় বরাবর পৌঁছেছি, এমন সময় একটা ট্যাক্সি কেনসিংটন হাই স্ট্রীট থেকে বাঁক নিয়ে ডি-ভিয়র গার্ডেন্সে ঢুকলো। আমায় চাপা দেয় আর কি। আমি ঝড়াৎ ক'রে রাস্তা থেকে একেবারে ফুটপাতে লাফিয়ে পড়লুম।

আমার ঠিক বাঁ-পাশেই কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসনের পাঁচ-তলা বাড়ি উঠে গেছে। ট্যাক্সিটা তারই সামনে থামলো। দেখি, তার থেকে নামছেন স্বয়ং গুরুদেব। রাস্তায় নেমে গুরুদেব তাঁর ঝোল্লা জোব্বার একবার এ-পকেট একবার ও-পকেট হাতড়াতে লাগলেন। গুরুদেব আমাদের অত্যন্ত অন্যমনস্ক-প্রকৃতির লোক। কোথাও যেতে-আসতে গেলে যে সঙ্গে কিছু রেস্ত দিয়ে বেরোনো উচিত, সেটা তিনি সদাসর্বদা ভুলে ব'সে থাকতেন। তাই নিয়ে অনেক অনর্থও বাধাতেন।

বেশ বুঝলুম এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। টাকা সঙ্গে আনেননি। এখন ট্যাক্সি-ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে পারছেন না! আমি একটু এগিয়ে গেলুম। আমায় দেখে গুরুদেব বললেন, 'এই, তোর পকেটে কিছু আছে নাকি? না, আমারই মতন একেবারে শূন্য?' আমি বাক্যব্যয় না ক'রে ট্যাক্সির মিটারের দিকে উঁকি মেরে দেখলুম, তাতে দেড় শিলিং উঠেছে। তার সঙ্গে আরো ছ' পেনি যোগ ক'রে আমি ট্যাক্সি ভাড়াটা মিটিয়ে দিলুম।

গুরুদেবের মুখ দেখে মনে হ'লো, তিনি খুবই নিশ্চিন্ত হলেন।

অতো রাত্তিরে রথীবাবুর (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ঘুম ভাঙিয়ে তাঁর কাছ থেকে ট্যাক্সি-ভাড়াটা চাইতে গেলে ব্যাপারটা যে কিরকম-কিরকম হবে—গুরুদেব বোধ হয় তাই ভাবছিলেন। তার উপর প্রতিমা দেবী (গুরুদেবের পুত্রবধূ) তখন অসুস্থ। রথীবাবুকে তাঁর বাবার জন্যে অনেক সইতে হয়, অনেক-কিছু ধকল সামলাতে হয়। কিন্তু এতটা ঠিক সইবে কিনা, তাই ভেবে গুরুদেব একটু ইতস্তত করছিলেন ব'লে মনে হ'লো।

আমি কাছে যেতে গুরুদেব বললেন, 'রোটেনস্টাইন-এর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ক'রে ফিরছি। গল্প-গুজবে অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে দেখছি। তা তুই এতো রাত্তিরে কোথায় বেরিয়েছিস? পড়াশুনো কিছু করিস নে বুঝি?'

আমি বললুম, 'তা কেন? এই তো এতোক্ষণ—পড়ছিলুম। পড়তে-পড়তে মাথা গরম হ'য়ে উঠেছে।'

'তাই বুঝি মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়েছিস?' গুরুদেব প্রশ্ন করলেন। গুরুদেবের সব সময় হাসি-ঠাট্টা লেগেই আছে। বিশেষত তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের সঙ্গে।

আমি নিবেদন করলুম, 'কতকটা তাই বটে। জন্-এর স্টলে গিয়ে এখুনি এক পেয়ালা গরম কফি খেয়ে ফেললে মাথা ধরাটা ছেড়ে যাবে।'

জন্-এর কথা গুরুদেবকে সব খুলে বললুম। বলেই তাঁকে ধরে বসলুম, 'চলুন না, একবার জন্-এর স্টলে। জন্ কতো খুশি হবে দেখবেন।' আমার তখন অল্প বয়েস। তাই ধৃষ্টতার সীমা-পরিসীমা ছিল না।

গুরুদেব আমার দিকে একবার তাঁর অন্তর্দৃষ্টি হানলেন। একটু হাসলেন কিনা সেটা তাঁর গোঁফদাড়ির আড়াল থেকে ঠিক ধরতে পারলুম না। তারপর শুধু বললেন, 'চল্।'

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, 'চলুন, এই কাছেই। আর একটা মোড় ফিরলেই জন্-এর স্টল।'

নির্জন নিশুতি রাত। পথে বিলিতি ম্লান জ্যোৎস্নার একটু আবছা আলো। গুরুদেব আর আমি পাশাপাশি চলেছি।

জন্-এর স্টলে পৌঁছবার আগেই গুরুদেবকে একটু পিছনে রেখে' আমি খানিকটা এগিয়ে গেলুম। জন্‌কে আগের থেকে সাবধান ক'রে দিতে হবে, গুরুদেব আসছেন। সে যেন গুরুদেবকে সসম্মানে গ্রহণ করে।

স্টলের কাছে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই দেখি এক আশ্চর্য দৃশ্য। অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে। জন্-এর স্টলে একটিও লোক নেই। জন্ একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তার চাউনি অনুসরণ ক'রে দেখি, দূরে গুরুদেবেরই উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। গুরুদেব তখন মাথার মখমলের লম্বা টুপিটা খুলে ফেলেছেন। সামনের বড়ো-বড়ো বাড়িগুলোর মাথার উপর দিয়ে পানসে-গোছের একফালি চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। তারই মৃদু আলো একটুখানি গুরুদেবের ঠিক মুখের উপর এসে পড়েছে।

দেখতে দেখতে জন্ হাটু গেড়ে মাটিতে নিল্‌ডাউন হ'য়ে বসলো। তার দু-খানা হাত একত্র জোড়করা। পিছন ফিরে দেখি, গুরুদেব তাড়াতাড়ি সে জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। লণ্ডনের রাস্তাঘাট গুরুদেবের মোটেই সড়গড় নয়। কোথায় যেতে শেষে কোথায় গিয়ে পড়বেন ভেবে আমি প্রায় দৌড়ে গিয়েই তাঁকে ধরলুম। সেইখানটায় রাস্তার বাঁক। একপাক ঘুরতেই জন্-এর স্টলটা চোখের আড়াল হয়ে গেলো।

যেতে-যেতে একটি কথাও হ'লো না। নিঃশব্দে গুরুদেবকে কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসন-এর নাইট পোর্টারের হাতে জিম্মা করে দিয়ে এলুম।

আবার জন্-এর স্টলেই ফিরে গেলুম। আমায় দেখে জন্ বললে, 'চ্যাটার্জি, আমার জীবন ধন্য। করুণাময় লর্ড যীশুস্ ক্রাইস্ট দূর থেকে আজ আমাকে দর্শন দিয়ে গেছেন। আমার জীবন সার্থক।'

জন্-এর মুখে অপার শান্তি !

আমার মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরুলো না। কিছু না খেয়েই সে-রাত্তির বাড়ি ফিরলুম।

তারপর আবার একবার বিলেত গিয়েছিলুম। আমি সেই পুরানো বাড়িতেই উঠেছি। এবারও গুরুদেব আছেন। কিন্তু এবার আর কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসন-এ নয়, রেজিনা হোটেলে। রথীবাবুও সঙ্গে আছেন, প্রতিমা দেবীও আছেন।

কেবল নেই আমার বন্ধু জন্। তার জায়গাও শূন্য। সেখানে আর কেউ স্টল খোলে নি।

তারপর কতো দিন চ'লে গেলো। কিন্তু এখনো গুরুদেবের একটা ছবি হাতে পড়লে সঙ্গে-সঙ্গেই জন্-এর কথা মনে পড়ে যায়।

স্মৃতিরঙ্গ ॥

রবীন্দ্রনাথের 'মানুষ'

সরলাবালা সরকার

রবীন্দ্রনাথের রচনা মাত্রই চিত্রধর্মী! তাই তাঁহার রচনায় আমরা যে সকল বহু বিচিত্র চিত্র দেখিতে পাই তাহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি তাহার সবগুলিই বিভিন্নভাবে মানুষেরই ছবি।

তাঁহার কবিতায়, তাঁহার রচিত কাহিনীগুলিতে, তাঁহার ছোট গল্পে ও উপন্যাসে এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় সর্বত্রই গূঢ়-ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে মানব-চরিত্রের চিত্র।

মানুষ একাধারে বাহিরের জগৎ ও মানসজগতের অধিবাসী। কবিমানসে মানুষের যে রূপটি ধরা পড়িয়া যায় সাহিত্যের সঞ্চয়ের ভিতর দিয়া তাহা চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে; মরণধর্মী মানুষ তাই সাহিত্যের ভিতর দিয়াই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবিশ্রেষ্ঠ, তাই মানুষের চরিত্র—যাহাকে এক হিসাবে অপরূপ বলা চলে, সেই অপরূপকে রূপ দান করা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। তাই তাঁহার রচনায় আমরা যে সকল মানুষের ছবি পাই তাহা এত জীবন্ত ও এমন হৃদয়গ্রাহী।

মানুষ চায় মানুষকে। অতীতকালে কত মানুষের জীবনে কতই ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই অতীতের ঘটনা লইয়া রচনা এবং অনাগত মানুষের জীবনের ঘটনাবলী কিভাবে ঘটিতে পারে তাহার কল্পনায় মানুষ বিমুগ্ধ। সাহিত্য এই ঘটনা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া চিত্রের ন্যায় অঙ্কন করিবার ভার লইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মানুষের পক্ষে 'মানুষ' হওয়াই প্রথম দরকার। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্ক-সূত্র আছে—যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মত বিচিত্র রসাস্বাদন করছি সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন

নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা,—চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করা, ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা—সাহিত্য এমনি করে আমাদের 'মানুষ' করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের ও মানুষকে আপনার বলে অনুভব করছি।....সংক্ষেপে এক কথায় বলতে গেলে ইহাই বলতে হয় সাহিত্যের বিষয় মানব-হৃদয় এবং মানব-চরিত্র।"

'মানুষ' এই নামটি একটি বিশেষ গৌরবের অধিকার দাবী করে। সৃষ্টিতে জড় আছে, আবার নানা শ্রেণীর প্রাণী ও তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ আছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতিরূপ রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা!"

তিনি আরো বলিয়াছেন, "অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোন এক আদি যুগে আমরা নিশ্চয়ই পাখী ছিলাম তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি?"

আর যে কেহ ভুলুক বা না ভুলুক কবি কখনই ভুলিতে পারেন নাই। তরুলতার সহিত তাঁহার নিবিড় আত্মীয়তা তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার শান্তিনিকেতন-তপোবনে আশ্রম-বালকের মত আশ্রম-পাদপদলও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে মঙ্গলাচরণে ও শুভ কামনায়।

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা॥

আমরা বলতুম কত্তাবাবা। কত্তাবাবারা অনেক ভাই ছিলেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবার ছোট। বড়-কত্তাবাবাদের সঙ্গে বিশেষ আমাদের যোগাযোগ ছিল না; দেখেছি তাঁদের অল্পই, কাকে কি ব'লে ডাকতে হবে তাও কেউ আমাদের শিখিয়ে দেননি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে আমরা ছেলেবেলায় প্রায়ই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে পেতুম—তাই তিনিই ছিলেন আমাদের কত্তাবাবা।

কত্তাবাবা জোড়াসাঁকো-বাড়িতে সব সময় থাকতেন না। তিনি থাকতেন শান্তিনিকেতনে, কখনও কখনও বিদেশে। কিন্তু যখন দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ছ-নম্বর বাড়িতে আসতেন তখন ঠাকুর-বাড়ির চেহারাই বদলে যেত। চেহারা বদলে যেত মানে, দরজায় জানলায় রঙিন পর্দা টাঙানো হত বা ঝালর ঝোলানো হত বা ফুল-পাতা দিয়ে বাড়ি সাজানো হত তা তো নয়। বাড়ি যেমনকার তেমনই থাকত! শুধু মনে হত মানুষরা সব যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে। কিসের একটা ছোঁয়া লেগে যেত চারিদিকে। অন্যরকম মনে হত সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি দিনগুলিকে। ছ-নম্বর বাড়ি থেকে কত্তাবাবা চলে আসতেন আমাদের পাঁচ-নম্বর বাড়িতে আমাদের দাদামশায়দের কাছে। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, তিন দাদামশায় ছিলেন কত্তাবাবার বিশিষ্টতম সহচর। তাঁরাও যেতেন ছ-নম্বর বাড়িতে। আনাগোনা চলত কেবলই। এই চারজনে এমন জমত যে কি বলব। এঁদেরই ঘিরে এসে পড়তেন জোড়াসাঁকো-বাড়িতে কলকাতার জ্ঞানী-গুণীরা, মনীষীরা। অভিনয়ের তোড়জোড় হত, নতুন নতুন গান শোনা হত, নতুন রচনা পাঠ হত, কত কি আশ্চর্য জিনিস সৃষ্টি হত; রঙ্গমঞ্চ রচনায়,

অভিনয় কৌশলে, সাজ-সজ্জায় নতুন নতুন চিন্তা, নতুন সুর, নতুন কথা, নতুন ঢং নিয়ে চলত উৎসাহপূর্ণ পরখ! আর আমাদের ছোটদের যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত সেটা হচ্ছে এই যে, আমরাও অনায়াসে অবলীলাক্রমে বুড়োদের এই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারতুম; কোথাও একটুও বাধত না। অথচ আমাদের পরিবারের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অন্যান্য বুড়োরা যখন এসে মিলিত হতেন তখন তাঁদের সেই জগতের প্রকৃতি হত একেবারেই অন্যরকম। বিদ্বান বুদ্ধিমান অনেকে সেখানে থাকলেও তাঁদের চোখা-চোখা বাক্যজাল জোড়াসাঁকো-বাড়ির ছেলেমেয়েদের কোনদিন আকৃষ্ট করতে পারত না! কত্তাবাবার অদ্ভুত কথা বলবার ধরন ছিল। সবার থেকে স্বতন্ত্র! কেউ অমন ক'রে আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন না। কেমন করে জানি না নিজে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কথা বলিয়ে নিতেন। বড়রা আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন হয় ধমকের সুরে নয় আদরের সুরে। দুটোতেই আমাদের বুঝতে কষ্ট হত না বড়দের সঙ্গে কতটা আমদের তফাত। কত্তাবাবার কাছে কিন্তু যদি হঠাৎ সাহস করে এগিয়ে যেতুম সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ খুলে যেত আর মুহূর্তের মধ্যে ভুলিয়ে দিতেন বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে বয়সের কোন পার্থক্য আছে কি না! এদিকে কত্তাবাবার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান ছিল পঞ্চাশ বছরের। কেমন করে এটা ঘটাতেন জানি না, কিন্তু এই জন্যেই বোধহয় আমাদের ছেলেবেলায় তাঁকে একটুও অসাধারণ লাগেনি! আর 'ছুটির পড়া' আর 'কথা ও কাহিনী' পড়ে যতই ভালো লাগুক, যতই মনকে নাড়া দিক—ওগুলো আমাদের চোখে ঘরের জিনিসের মতই ছিল, তাই কোনদিন অসামান্য বলে মনে হয়নি।

নতুন গান, নতুন রচনা, নতুন নাট্য, নতুন অভিনয়—এ সব ছাড়াও তখনকার দিনে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঘটত নানারকম

বিচিত্র ঘটনা, তার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

হয়ত কলকাতায় এসে পড়েছেন ভারতের বা বিদেশের কোন খ্যাতনামা পুরুষ, তাঁরাও জোড়াসাঁকোর আকর্ষণে পড়ে চলে আসতেন। এইভাবে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিল্পী উইলিয়াম রথেনস্টাইন এসে পড়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথের আর অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখতে। তখনকার দিনের বাংলাদেশের সাহেব-গভর্ণর দাদামশায়দের বন্ধু এবং দাদামশায়ের ছবির ভক্ত ছিলেন। তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রথেনস্টাইনকে। রথেনস্টাইন আসছেন শুনে গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ পাশের বাড়ী থেকে রবীন্দ্রনাথকে ধরে নিয়ে এলেন, সকলে মিলে একসঙ্গে গল্প করা যাবে এই ভেবে। আলাপ হল কত্তাবাবার সঙ্গে রথেনস্টাইনের। খুব আলাপ জমল। রথেনস্টাইন যখন শুনলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি, তিনি দুঃখ করে বললেন—আমি তো বাংলা জানি না যে ওঁর লেখা পড়ব? লেখা পড়তে না পারলেও মনের মিল হল দুজনের খুবই। সেই থেকে দুজনে চিঠি লেখালিখিও চলত। সে সময় রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়নি। তখনকার দিনে বাংলা কবিতাই বা পড়ত ক-জন? কত্তাবাবার কবিতার একদল অনুরাগী ভক্ত থাকলেও বহু বিরুদ্ধ সমালোচক ছিলেন যাঁরা বলতেন—রবীন্দ্রনাথ কবিনামের যোগ্যই নন।

রথেনস্টাইন চলে যেতে রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা নিজেই ইংরেজিতে তর্জমা করতে শুরু করে দেন। এর কিছু দিন পরেই কত্তাবাবার বিলেতে আর আমেরিকায় যাবার কথা ওঠে। গীতাঞ্জলির শ-খানেক কবিতা ইংরেজিতে লেখা হয়ে গেল। সেগুলি নিয়ে কত্তাবাবা বিলেতের পথে বেরিয়ে পড়লেন। লণ্ডনে গিয়ে দুই বন্ধুর দেখা হল অনেকদিন পরে। কত্তাবাবা রথেনস্টাইনকে সেই একশোটি কবিতার একটি খাতা উপহার দিলেন। রথেনস্টাইন

পড়ে মুগ্ধ হয়ে তখনকার দিনের ইংলণ্ডের প্রধান কবি ইয়েটস্‌কে দিলেন খাতাটি পড়তে। পড়ে ইয়েটস্-এর মনে হল অমন কবিতা তিনি কোনদিন চোখে দেখেননি। তিনি লণ্ডনবাসী কবি-সাহিত্যিক-সমালোচকদের একটি সভা ডেকে রবীন্দ্রনাথকে কবিতাগুলি পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেন। সেই কবিতা পাঠের ফলে লণ্ডনের সুধীসমাজে যে চাঞ্চল্য হয়, তারই ফলে গীতাঞ্জলির অনুবাদ ছাপা হয়ে বেরল। তারই ফলে ঘটল কত্তাবাবার কপালে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি।

কত্তাবাবা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রয়েছেন, হঠাৎ একদিন শুনলুম গান্ধী আসছেন। সে কি কাণ্ড। ফিস্ ফাস্ করে কথা কইতে লাগলেন সবাই! কী গোপন পরামর্শ হবে কত্তাবাবার সঙ্গে গান্ধীর, কেউ জানে না। হয়ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই এবার উল্টে যাবে। কলকাতায় সে সময় কংগ্রেসের এক অধিবেশন হচ্ছে। সেই উপলক্ষে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী। অসহযোগ আন্দোলন আর বিলিতি জিনিস বর্জন পুরোদমে চলেছে তখন। আমাদের ব'লে দেওয়া হল আমরা যেন গোলমাল না করি, উঁকিঝুঁকি একেবারেই না দিই। কিন্তু অদম্য কৌতূহল আমরা চাপব কি করে? এণ্ডরুজ সাহেবের সঙ্গে যখন মহাত্মা গান্ধী এসে দোতলার ফালি ঘরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেঝের উপর আসন নিলেন, তখন সকলের চোখ এড়িয়ে পিছনের বারান্দার বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে আমরা কয়েকটি শিশু প্রাণপণে দেখবার এবং শোনবার চেষ্টা করতে লাগলুম ভিতরে কিসের মন্ত্রণা চলেছে। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হল না। দেখলুম চৌকাঠের উপর একটু দূরে ব'সে দাদামশায় অবনীন্দ্রনাথ একটুকরো কাগজে তিনজনের ছবি আঁকছেন। এইটিই দাদামশায়ের আঁকা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ডরুজ-এর বিখ্যাত চিত্র —শান্তিনিকেতনের কলাভবনে রক্ষিত আছে। মহাত্মা গান্ধীর বয়স তখন বেশি হয়নি—মাথায় গান্ধী-টুপি পরতেন। কাউকে খবর

না দিয়েই চুপি-চুপি এসেছিলেন জোড়াসাঁকোতে। প্রথমটা কেউ জানতে পারেননি, কিন্তু হঠাৎ কেমন করে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভিড় জমে গেল পাঁচ-নম্বর আর ছ-নম্বর বাড়ির মাঝখানের রাস্তাটুকুতে। ক্রমে মানুষের মাথা বাড়তে বাড়তে আমাদের ফটক পেরিয়ে গেল। শেষে জনতা আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল—গান্ধী মহারাজ কি জয়!

গান্ধী তখন ঘর থেকে উঠে এসে পশ্চিমের বারান্দায় হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। গান্ধীর সামনে আমাদের বাড়ির রাস্তার উপর বিলিতি কাপড় পোড়ানো হল! আরো জোরে সমবেত কণ্ঠে গান্ধীর জয়ধ্বনি উঠল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি প্লাবিত হয়ে গেল সেই শব্দে। গান্ধী আবার হাত জোড় করে সকলকে নমস্কার জানালেন, তখন ক্রমে ক্রমে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। কিন্তু কত্তা-বাবার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর চার ঘণ্টা ধরে কি যে বিচার-বিতর্ক হল আজ অবধি কেউ তা জানতে পারেনি।

শিশুদের পঁচিশে বৈশাখ

ক্ষিতিমোহন সেন

পঁচিশে বৈশাখ। এই দিনেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই দিনটি তিনি ধন্য করে গেছেন। আমাদের মধ্যে জন্ম নিয়ে তিনি আমাদেরও গৌরব দিয়ে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেশবাসী বলে আমাদের দায়িত্বও যে কতখানি বেড়ে গেছে সে কথাও ভুললে চলবে না।

কবিগুরুর ছবি তোমরা সবাই দেখেছ। তোমরা ছেলেমানুষ, কাজেই তাঁর বুড়ো বয়সের ছবিই হয়তো তোমাদের চোখে বেশি পড়েছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ তিনি যতই বুড়ো হয়েছেন ততই যেন তাঁর রূপ আরও অপূর্ব হয়ে উঠেছে। তাঁর চোখেমুখে দিনে দিনে যেন অপরূপ একটি নবীনতা ও দিব্যভাব ফুটে উঠেছে।

আসলে বাইরে থেকে তাঁকে বুড়ো দেখলেও তাঁর মনটি ছিল একেবারে শিশুর মতো তাজা ও নবীন। তাই শিশুদের সঙ্গেই ছিল তাঁর ভাব ও হৃদয়ের যোগ। শিশুদের সঙ্গে ভাবের ও মনের যোগ কয়জনের থাকে? আমাদের ঘরে ছোট্ট ছেলেপিলেদের কথা আমরা তো ভালো করে জানিই না। কারণ তাদের আমরা ডেকে স্নেহ করে তাদের সব কথা শুনতেই চাই না। আমাদের কাছে আমাদের শিশুরা আমল না পেলেও কবিগুরুর কাছে ছিল তাদের অবারিত গতি। সব সময়েই দেখতাম শিশুদের তিনি আদর করে বসিয়ে তাদের সব কথাই হৃদয় দিয়ে শুনতেন। আমাদের শিশুরা যে সব কথা আমাদের কাছে বলতে চাইত না, সেসব কথা তাঁর কাছে বলতে তাদের একটুও সংকোচ হত না। তাঁর এই স্নেহের মধ্যে শিশুদের প্রতি কৃপার ভাব ছিল না, তিনি শিশুদের শ্রদ্ধা করতেন, শিশুরাই ভবিষ্যতের

সৃষ্টিকর্তা এই ছিল তাঁর মত। তাই রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে রীতিমতো শ্রদ্ধার সাধনা। তার কোথাও ফাঁকি নেই। ছেলে-মানুষের সাহিত্যের নামে ছেলেমানুষি করতে গেলে যে দুষ্কৃতি তার আর প্রায়শ্চিত্ত নেই।

আমরা কখনো বা শিশুদের ফাঁকি দিয়ে তাদের প্রাপ্য হতে তাদের বঞ্চিত করি, কখনো বা তাদের দেখিয়ে তাদের নাম করে নিজেদের কিছু সুবিধা আদায় করে নিই। এই দুয়েতেই শিশুদের অপমান করা হয়। শিশুদের সে অপমানে রবীন্দ্রনাথ বড়োই ব্যথা পেতেন। এই শিশুদের যাঁরা ফাঁকি দিয়ে সুবিধে করে নিতে চান তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎকেই নষ্ট করেন। অশ্বত্থামার জন্য তৈরি কৃত্রিম দুধের মধ্যে দেশের দারুণ দুর্গতির পরিচয়। শিশুদের দেখিয়ে পথে বসে ভিক্ষা চলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিশুবন্ধুদের নিয়ে রীতি-মত ব্যবসা চলছে। নির্বাক নিঃসহায় শিশুদের নিয়ে এইসব ব্যবসায়ীদের আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। শিশু-অশ্বত্থামাদের জন্য যদি জলো দুধেরই সাহিত্যসৃষ্টি করি তবে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎকে নিজেরা নষ্ট করব। কালিদাসের মতো যে-শাখায় বসে আছে সেই শাখাকেই ছেদন করবার মতো মূঢ়তা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁর শিশুসাহিত্য শিশুদের প্রতি স্নেহে ও শ্রদ্ধায় ভরপূর। যখনই তিনি শিশুদের কথা ভেবেছেন তখনই তিনি নিজেরই শিশু-স্বরূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

তাই শিশুদের কী অপূর্ব চিত্রই তিনি রেখে গেছেন। 'কথা ও কাহিনী'র গল্পে শিশুর মনুষ্যত্ব, 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথে' শিশুদের কল্পনা ও মানসদৃষ্টির মাহাত্ম্য, 'ডাকঘরে' শিশুর অন্তরে অসীম বিশ্বজগতের জন্য ব্যাকুলতা, 'শারদোৎসবে' সকল মানবের হয়ে শিশুর ঋণশোধের তপস্যা নানাভাবে শিশুদের সাধনাকে অপরূপভাবে প্রকাশ করে কবিগুরু আমাদের সাহিত্যে শিশুদের এক দিব্যলোক দেখিয়ে গেছেন। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'

বইগুলিতে তাঁর হৃদয়ের ভাবসৃষ্টির যে পরিচয় দিয়েছেন জগতের কোনো সাহিত্যেই তার সমতুল্য জিনিস পাওয়া কঠিন। অনেক মহাপুরুষ দেখেছি, কিন্তু ছোটো ছেলেমেয়েদের এমন করে ভালোবাসতে আর কখনও দেখি নি। শিশুদের এই ভালোবাসার মধ্যে তাঁকে কখনো দেশ জাতি বা সম্প্রদায় দিয়ে বিচার করতে দেখি নি।

প্রায় চৌত্রিশ বছর তাঁর সঙ্গ জীবনে পেয়েছি। দেখেছি, যখনই কোনো ছোট্টো ছেলে বা মেয়ে এসে তাঁর কাছে কিছু দাবি করেছে তখনই তিনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। তারা যখন তাঁর কাছে কবিতা চেয়েছে, তখন তিনি নির্বিচারে তাদের নানারকমের ছেঁড়া খাতায় এমন-কি আল্‌গা ছেঁড়া কাগজেও অমূল্য সব কবিতা তখনই রচনা করে বসিয়ে দিয়েছেন। ওগুলি যে তাঁর কবিতার যোগ্য স্থান নয় সে কথা একবারও মনে করেন নি। শিশুরা যখন তাঁর কাছে গল্প দাবি করেছে তখন তিনি মজার মজার সব গল্প করে তাদের তৃপ্ত করেছেন, এমন প্রতিদিনই ঘটেছে। অরণ্যে ফুলের মতো এই রকম কত কবিতা ও গল্প ফুটে উঠে ঝরে গেছে এখন আর কোথাও তার দেখাও মিলবে না। আবার এই রকম উপলক্ষ্য ধরেই তাঁর কিছু কিছু ভালো রচনাও আমরা পেয়েছি। তাঁর কতক ভালো ভালো কবিতা ও গল্পের সৃষ্টি শিশুদের তাগিদেই এমনি করে সৃষ্টি হয়েছে।

আমি যখন তাঁর কাছে এলাম তখন শান্তিনিকেতনের শৈশবকাল। শিশুরা সন্ধ্যা হলেই তাঁর কাছে এসে জুটত। তাঁকে তাদের খেলার সাথী বলেই জানত। শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও সেবার আর অন্ত ছিল না। কেউ কেউ তাঁকে বলতেন, 'আপনার সময় অমূল্য, এই শিশুদের জন্য তা কেন এতটা নষ্ট করেন?' কবি বলতেন, "অনেক যত্ন না করলে ফুলবাগান তৈরী হয় না। ফুল ফুটলেও তা রাখতে বা কোথাও তা পাঠাতে খুব যত্ন না করলে চলে না; অথচ শস্য বা বীজ বস্তাবন্দী করে রাখলেও কোন ক্ষতি

নেই, যেমন তেমন করে তা যেখানে সেখানে পাঠানোও চলে। আমরা বুড়োরা হলাম বীজের মতো। যেমন তেমন করে অবহেলা করলেও আমাদের ক্ষতি হয় না, আমাদের জন্য ভাবনা নেই। কিন্তু ওরা যে ফুল, ওদের স্নেহ চাই, সেবা চাই, যত্ন চাই। অথচ ফুলের মধ্যেই অরণ্যের সব ভবিষ্যৎ! শস্য-ফল-বীজ-ছাল-কাঠ সবারই মূলে ওই সুকুমার কটি ফুল। তাদের অযত্ন করার অর্থই হল আত্মঘাত।"

অন্তরে অন্তরে রবীন্দ্রনাথও যে ছিলেন শিশু, তাই তিনি শিশুদের মর্ম বুঝতেন। তাঁর দাড়ি গোঁফ যতই কেন সাদা ধব্‌ধবে হোক না, তাঁর হৃদয়খানি চিরদিনই ছিল শিশুহৃদয়ের মতো কচি কাঁচা ও কোমল। তাই যখন তাঁকে না বুঝে আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে আঘাত ও অপমান করেছেন তখন এই দেশের সেরা ফুল-টিকেই আঘাত করা হয়েছে। ফুলের মতোই সুন্দর হয়ে তিনি সংসারে এসেছিলেন। ফুলের মতোই তিনি ছিলেন নির্মল ও পবিত্র, আর জীবনের অবসানে বিধাতার চরণে ফুলের মতোই পুষ্পাঞ্জলি-রূপে তিনি আত্মসমর্পণ করে চলে গেছেন।

তখনকার দিনে আমরা অয়েকজন অধ্যাপক বহুকাল তাঁর সঙ্গে একই জায়গায় পাশাপাশি ঘরে বাস করেছি। সকলেরই ঘরে যে ছোটো ছেলেমেয়ে—সর্বদাই ভয় ছিল কখন গিয়ে এরা সব তাঁর অসুবিধা ঘটাবে। তাই সব ঘরেই মায়েদের দিনরাত চেষ্টা ছিল শিশুরা যেন ওঁর কাছে না যায়। কিন্তু কার সাধ্য শিশুদের ঠেকিয়ে রাখে? তিনি নিজেই তাদের যে উৎসাহ দিচ্ছেন। তাঁর কাছে গেলেই ওরা টুকিটাকি সব খাবার পায়, এটা ওটা পায়, গল্প শুনতে পায়। কবিতা-ছড়া যা ফরমাশ করে পায়। সকলের উপর তাঁকেই পায়। তিনি স্নেহের ধারায় শিশুগুলোকে একেবারেই আপনার করে নিয়েছেন। আমরা যখন শিশুগুলোকে সামলাবার কথা ভাবছি, তখন দেখি শিশুর দল দিব্যি তাঁর চারদিকে ঘিরে বসে রয়েছে,

ইচ্ছামত তাঁকে গানের ফরমাস করছে, আর তিনিও মনের আনন্দে শিশুদের মনের মতো গান শোনাচ্ছেন। গান দিয়ে কবিতা দিয়ে স্নেহ দিয়ে তিনি শিশুগুলোকে একেবারে বশীভূত করে রেখেছেন। শিশুদের জ্ঞান কম হতে পারে কিন্তু তারা হৃদয় চেনে, স্নেহ বোঝে। কবির হৃদয়টি ছিল শিশুদের প্রতি স্নেহে ভরপূর। যৌবনকালে কবি অনেকসময় শিলাইদহে পদ্মানদীর উপর বোটে থাকতেন—একাই থাকতেন। তার মধ্যেও পারলেই একটি আধটি শিশুকে নিজের কাছে রাখতেন। নিজের ছেলেপিলে যখন হয়নি তখন ভাইদের ছেলেপিলের কাউকে কাউকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাদের খাওয়ানো পরানো নাওয়ানো সর্ববিধ সেবাই তিনি নিজ হাতে নিপুণভাবে করতেন। এরকম একবার একটি শিশু তাঁর কাছে রয়েছে, রাত্রে ভয়ংকর ঝড় উঠল। পদ্মানদী পাগল হয়ে সারারাত মাতামাতি করলো। ভীত শিশুটিকে কবি বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে কোনমতে তো রাতটি কাটালেন। ভোরের দিকে ঝড় শান্ত হয়ে এল, ছেঁড়া মেঘের মাঝে মাঝে অরুণের লোহিত আভা দেখা দিল, তিনি গান রচনা করলেন,

আহা জানি পোহালো বিভাবরী।
অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী॥

১৯২৪ সালে চৈত্র মাস। তাঁর সঙ্গে সমুদ্রে চলেছি। প্রশান্ত মহাসাগর—খুব কদিন ঝড় বাতাস চলেছে। কেউ আর মাথা তুলতে পারছেন না। কেমন একটা গা-বমিবমি ভাব। এরই নাম সমুদ্রপীড়া। কবির এই বালাই ছিল না, তিনি বেশ আছেন। শিশু আর বুড়োদের নাকি সমুদ্রপীড়া হয় না। সেদিন সকালে বৃষ্টির পর সুন্দর কাঁচা রোদটুকু উঠেছে। উড়োমাছগুলি প্রভাতের আলোয় উড়ে উড়ে আবার সমুদ্রে পড়ছে ঝাঁপিয়ে। ঘন নীল জলে ঢেউগুলির উপরে সাদা ফেনার উচ্ছ্বাস। তাতে ভোরের সোনার আলো পড়ে মনে হচ্ছে সোনালি ফেনায় নীল সমুদ্রের অপূর্ব

সমারোহ। যেন স্বর্ণভূষণ পীতাম্বর নীলমণি বিষ্ণুর অপূর্ব জলদনীল কান্তি। বিদ্যুতে জড়িত শ্যামঘন মেঘের শোভা। শীতল সুখকর হাওয়া। শরীরটা একটু ভালো বোধ হতেই ভাবলাম, দেখে আসি—এমন সময় কবিগুরু কী করছেন। তাঁর ঘরে তাঁকে দেখলাম না। সকালের হাওয়ায় জাহাজের খোলা ডেকে দেখলাম তিনি বেড়াচ্ছেন। এতক্ষণ তিনি ডেকে একা ছিলেন। তখন তাঁর প্রতিদিনের ধ্যানটি সেরে তিনি পায়চারি করছেন—আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘিরে নানাদেশের কয়েকটি ছেলেমেয়ে। তিনি হেসে দেখালেন, “কেমন দিব্যি একটি বন্ধুর দল জোগাড় করেছি দেখুন তো। ভাবছেন কী করে এদের সঙ্গে কথা কই? শিশুদের কথার দরকার হয় না। এরা বিনা ভাষাতেই অন্তরের ভাব বুঝতে ও বোঝাতে পারে। তাই নানাদেশের এই সব ছেলেমেয়ে দিব্যি আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছে আর আমিও তাদের কাছে আমার স্নেহটুকু জানিয়েছি।” তিনি দেশ জাতি বা সম্প্রদায়ের ভেদ মানতেন না। সকল মানুষকেই তিনি জানতেন আত্মীয় বলে। শিশুদেরও সেই ভাব, কাজেই শিশুদের সঙ্গে তাঁর স্বভাবতই মিল ছিল।

এখানে দেখলাম, শুধু স্নেহ নয়। শিশুদের তিনি নানা টুকি-টাকি ঘুষও দিয়েছেন। কিন্তু এইসব শিশুরা কী করে তাঁর সাদা গোঁফদাড়ির ভয়ংকর রকমের পাহারা ডিঙিয়ে তাঁর হৃদয়ের এত কাছে উপস্থিত হতে সাহস পেল? এরা তো তাঁকে চেনে না, ভাষাও জানে না, এঁর গান বা কবিতাও বোঝে না তবে তাঁকে বুঝল কেমন করে? কবির মধ্যে এমন একটা সরল সরস স্নেহময় শিশুর ভাব ছিল যে, যে-কোনো দেশের শিশুই তার কাছে আসতে দ্বিধা করে নি। দেশেবিদেশে শিশুর দল তাঁর কাছে যা-কিছু চেয়েছে, পরম স্নেহে তিনি তা চিরদিন পূর্ণ করে দিয়েছেন।

মনে আছে সেবারই চীনদেশে হাংচাউ নামে এক অতি সুন্দর

হ্রদের তীরে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা নববর্ষের পরদিন এসে তাকে জানালে—"তোমাকে নিয়ে বুড়োরাই সভা করেন। সেই সভায় আমাদের কেউ যেতেই দেন না, বলেন, 'তোমরা ছেলেমানুষ, গোল করবে।' কিন্তু আমাদেরও তোমার কাছে আসতে ইচ্ছা হয়। আচ্ছা আমরাই যদি সব ছোট্ট ছেলেমেয়ের দল একত্র হয়ে ডাকি তবে কি তুমি আমাদের কাছেও আসবে?" কবি বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব, খুব দরকারী কাজ থাকলেও তা ফেলে তোমাদেরই কাছে যাব।" ওরই মধ্যে একটু বুড়ো গোছের ইংরেজী জানা মেয়ে দোভাষীর কাজ করছিল, তার মুখে কবিগুরুর স্নেহময় কথা শুনে ছেলেমেয়ের দল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ছোট্টদের সেই সভায় কবির সঙ্গে আমরাও গেলাম। অনেক দরকারী কাজ মুলতবী রেখে তাঁকে সেখানে যেতে হল। শিশুদের কী আনন্দ। তাদের মুখেচোখে একটা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উচ্ছ্বাস। কেউ কিছু বলতে পারে না—তবু কেউ তাকে ফুল দিচ্ছে। কেউ বা কোনো একটা হাতের কাজ দিচ্ছে, কেউ-বা আরো কিছু দিচ্ছে। কবি তাতেই খুশি। কবি যা বললেন তা অনুবাদ করে শুনিয়ে দিতেই তারা কি খুশি।

কবি বললেন, 'আমি কিনা কবি, তাই ফুল ভালোবাসি। এই যে আমি আজ তোমাদের মধ্যে বসেছি—মনে হচ্ছে যেন আজ ফুল বাগানের মধ্যেই বসে আছি। তাই খুব ভালো লাগছে। আমার দেশে শান্তিনিকেতন তোমাদের মতো সব শিশুদের নিয়ে আমি কিছুকাল থেকে একটা ফুলের বাগান করেছি। সেখানে তোমাদেরও নিমন্ত্রণ রইল। যদি কোনোদিন যাও তবে দেখবে সেখানেও তোমাদের মতো নানান ফুলের দল দিনে দিনে ফুটে উঠেছে! তোমরাই তো সত্যিকার ফুল। তোমাদের জনে জনে নানা রঙের শোভা। তাই দেখছি আর মন খুশি হয়ে উঠছে। খুশি হচ্ছি, আবার তখনই মনে মনে উদ্‌বেগও হচ্ছে ফুল বড়ো সহজে

নষ্ট হয় মলিন হয়। তাই উদ্‌বেগ হয় পাছে তোমরা নষ্ট হও বা মলিন হও। ফুল নষ্ট হলে ফল বীজ কিছুই হয় না। তোমরাই যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। বড়ো দুর্দিন আসছে, তাই আশীর্বাদ করি ও প্রার্থনা করি যেন কিছুতেই তোমরা নষ্ট না হও। তবেই একদিন না একদিন তোমরা বড়ো হয়ে পৃথিবীকে সব দুঃখ দুর্গতি থেকে রক্ষা করতে পারবে।" তাঁর সেই ডাকে এখন চীনদেশের কিছু ছেলেমেয়ে এখানে শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দিয়েছেন ও আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন।

কবিগুরু চলে গেছেন। পৃথিবীতে আজ দারুণ দুর্গতি এসেছে। আজ মানুষের এক দিকে অন্তহীন হিংসা বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতা আর অন্য দিকে অপরিসীম দুঃখ দুর্গতি। আজ তাই ভাবছি, কবে তাঁর অন্তরের সেই আশীর্বাদটি সত্য হবে। কবে মানব-উদ্যানের ফুলগুলি বিকৃত না হয়ে সত্য ও নির্মল হবে ও পৃথিবীর সব অন্যায় অবিচার ও দুর্গতি দূর করবার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করবে? কবে পৃথিবী নির্মল হবে, নিষ্কলুষ হবে, ধন্য হবে? তাঁর আশীর্বাদ সত্য করতে একমাত্র তোমরাই পারো। তিনি তোমাদের এত ভালোবেসে গেছেন, আজ যদি তোমরা তাঁর সেই আশীর্বাদের দায়টি ভুলে যাও তবে বড়োই দুঃখের কথা হবে। তাই আজ পঁচিশে বৈশাখে তোমরা তাঁর সেই আশীর্বাদ স্মরণ করো। তবেই আবার তোমাদের অন্তরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নূতন করে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর 'জন্মদিবস' সার্থক হবে। তোমাদের সাধনার বলে জগতের নীচতা কুটিলতা বিদ্বেষ ও হিংস্রতার মধ্যে সত্য প্রেম কল্যাণ ও মহত্ত্বের সাধনার প্রতিষ্ঠা হবে। তা হলেই পঁচিশে বৈশাখকে যথার্থ সম্মান করা হবে, উৎসব সার্থক হবে।

কবি ও তাঁর শিশুকন্যা

আষাঢ় মাস পড়তেই বাবামশায় খোলা আকাশে বর্ষার রূপ দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন, তখন তাঁকে উত্তরায়ণের দোতলায় নিয়ে আসা হল। প্রথমটা কিছুতে আসবেন না, অনেক করে রাজী করানো গেল। এই সময় ডাক্তারদের মত নিয়ে কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হয়েছে। কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। রানী (নির্মলকুমারী) মহলানবিশও এই সময় শান্তিনিকেতনে এসে বাবামশায়ের সেবায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে বাবামশায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তিনি এসে মাসাবধি কাছে থাকাতে অপারেশনের পূর্ববর্তী দিনগুলি গুরুদেবের কাছে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রীতি ও আনন্দের পরিবেশে। রানীর গল্প শুনতে তিনি ভালোবাসতেন এবং তাঁকে কাছে বসিয়ে হাস্যালাপ করে প্রফুল্ল হয়ে উঠতেন।

এমন সময় এক দিনের জন্য কলকাতা থেকে ইন্দুবাবু, (ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ বসু), বিধানবাবু (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) ও ললিতবাবু (ডাঃ শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) এলেন, সঙ্গে ছিলেন জ্যোতিবাবু (ডাঃ শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ সরকার)। তাঁরা ওঁকে দেখে শুনে পরীক্ষা করে স্থির করলেন, শ্রাবণমাসেই অপারেশন হবে। ডাক্তার রাম অধিকারী, জিতেন্দ্র দত্ত এবং সত্যেন্দ্র রায় মহাশয়গণও কয়েকদিন পরে এসেছিলেন। অপারেশন সম্বন্ধে সকলেই একমত হন। এঁরা তখন গুরুদেবকে দেখবার জন্য ঘন ঘন যাতায়াত করতেন।

বাবামশায়ের মনে-মনে তাঁর অবসানের একটি কাল্পনিক ছবি গড়ে উঠেছিল, সেই ভাবের কথাও তিনি বলতেন। যেমন ক'রে ফুল পাতা খসে পড়ে, বৃদ্ধ গাছটি যেমন ক'রে ধীরে-ধীরে শুকিয়ে

আসে, তিনি ভেবেছিলেন তেমনি করে একদিন প্রকৃতির কোলে ঝরে পড়বেন। সেই হত কবির যথার্থ স্বাভাবিক অবসান :

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল-কিছু মাঝে। —জন্মদিনে. ১২

প্রকৃতির সঙ্গে এই গভীর ঐক্য-অনুভূতি ক্রমে ক্রমে নিবিড় হয়ে আসছিল তাঁর মধ্যে, কিন্তু নিয়তির ফের অন্যরূপ। ডাক্তাররা অনেক যুক্তি দেখালেন, "এই অপারেশন এত সহজ, এতে কোনো ভয়ের কারণ নেই।" শুনেছি কলকাতায় অপারেশনের পূর্বে ডাক্তাররা যখন তাঁকে সন্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিলেন যে, আমরা এত সাবধান হচ্ছি যাতে কোনো আর আশঙ্কার কারণ থাকবে না, সাবধানের মার নেই,—তিনি তখনই হেসে উত্তর করেছিলেন, "মারেরও সাবধান নেই।" লাখ কথার এক কথা। তবুও তিনি তর্ক না করে বিজ্ঞানের মতকেই মেনে নিলেন।

এদিকে বাবামশায়ের কলকাতা যাবার দুদিন আগেই আমি ব্রঙ্কাইটিস ও জ্বরে শয্যাশায়ী হলুম। এই কারণে বাবামশায়ের সঙ্গে আমার যাওয়া হল না। ২৫শে জুলাই। সেদিন আমার জ্বর খুব বেড়েছিল, নিজে উঠতে পারিনি, খালি কানে এসে পৌঁছচ্ছিল তাঁর যাত্রার আয়োজন, লোকজনের হাঁকডাক, জিনিসপত্রের নামাওঠা। এমন সময় নন্দিতা একখানি জন্মদিনের বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি পত্রিকা আমাকে এনে দিয়ে বললে, "দাদামশায় তোমাকে এই বই-খানা দিলেন।" এত আনন্দ হল, ভিতরের মলাটে তাঁর কাঁপা হাতের অক্ষরে লেখা, "মা-মণিকে, বাবামণি,"—তাঁর চিরস্নেহের বাণী, এর কোনো তুলনা নেই, বইখানা মাথায় ঠেকিয়ে বালিশের নিচে রেখে দিলুম। তখন কে জানত এই তাঁর বিদায়ের সংকেত

তাঁর চিরন্তন স্নেহের আশীর্বাদ স্মৃতিতে গেঁথে থুয়ে গেলেন এই বই-খানার মলাটের তলায়।

যাত্রার সময় হয়েছিল, নন্দিতা তাই তাড়াতাড়ি চলে গেল। বিছানায় পড়ে আছি, কানে আসছে লোকজনের কোলাহল, বাস্-মোটরের আওয়াজ, হঠাৎ শুনতে পেলুম আমাদের ছেলেমেয়েদের মিলিতকণ্ঠে গান--"আমাদের শান্তিনিকেতন,"—তাদের গুরুদেবকে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের শেষ বিদায় প্রণতি।

আমার অসুখ বেড়ে গেল, কলকাতা যাওয়া ক্রমশই পিছিয়ে যেতে লাগল, শচীনবাবু (আশ্রমের ডাক্তার শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) রোজ বলেন, দুচারদিনের মধ্যে আপনি কলকাতা যেতে পারবেন। শচীনবাবু বাবামশায়ের সেবায় বরাবরই ছিলেন কিন্তু আমাদেরই মতো কয়েকজন আশ্রমের রোগীর জন্য গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বাবামশায় শচীনবাবুর উপর এত নির্ভর করতেন যে, পাছে আশ্রমবাসীর কোনো অসুবিধা হয় তাই তাঁকে সঙ্গে নিলেন না। তার পর খবর এল, কাল ৩০শে জুলাই বাবামশায়ের অপারেশনের দিন স্থির হয়েছে। আজ বাবামশায়কে একখানি চিঠি না লিখে পারলুম না, যাবার সময় তিনি কত স্নেহে এই বইখানি দিয়ে গেলেন, তাঁকে একটি বার প্রণামও করতে পারলুম না, এ আমার দুর্ভাগ্য; চিঠিখানিতে তাই তাঁকে প্রণাম জানিয়ে লিখলুম, কিন্তু তার উত্তর পাবার আশা করিনি। পরে শুনলুম, অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে তিনি রানী চন্দকে দিয়ে এই চিঠি-খানি আমাকে লেখান, এই চিঠিতেই শুনলুম তাঁর কলম শেষ সহি রেখে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়েছে:

মা-মণি,

তোমাকে নিজের হাতে লিখতে পারিনে ব'লে কিছুতে রুচি হয় না। কেবল খবর নিই আর কল্পনা করি যে তুমি ভালো আছ—অন্তত এখানকার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভিতর থেকে দূরে থেকে কিছু

আরামে আছ। কিছু তাপ এখনও শরীরে আছে সেটা ভালো লাগছে না। কেননা ক্ষুদ্র শত্রুর জেদটাই সবচেয়ে দুঃখ-জনক। আমাকে প্রত্যহই একটা-না-একটা খোঁচা দিচ্ছেই,—বড়ো খোঁচার ভূমিকা স্বরূপে। শুনেছি, বড়োর আক্রমণ তেমন দুঃসহ নয়, এই সব ছোটো-ছোটোর উপদ্রব যেমন। যা হোক, এরও তো অবসান আছে এবং তারও খুব বেশি দেরি নেই। চুকে গেলে নিশ্চিন্ত থাকব। ইতি—

৩০।৭।৪১

বেলা দশটা বাবামশায়

জোড়াসাঁকো

কণ্ঠ তাঁর এসে থামল কালের সীমায়, বাণীর তাৎপর্য ভরে রইল বিশ্বের শব্দলোক ছাপিয়ে।

অপারেশনের পর রোজই ফোনে খবর আসত সমস্তই ভালোর-দিকে, আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠত যে, এবারের মতো ভয় কেটে গেছে। আমার স্বামী (শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) লিখলেন ঃ

বাবার অপারেশনের খবর সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে যাবার পরই পাঠিয়েছি —নিশ্চয়ই পেয়েছ। যখন ন'টার সময় টেলিফোন করতে চেষ্টা করলুম তখন বললে লাইন খারাপ। আমি বলে রাখলুম লাইন খুললেই যেন কানেকশন দেয়। যখন দিল ঠিক সেই মুহূর্তেই অপারেশন শেষ হয়েছে—তাই খবর আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই পেলে।

সকালবেলা থেকেই দশ-বারোজন ডাক্তার এসে পড়লেন। বারান্দায় সাদা পর্দা দিয়ে অপারেশন-টেবিল ঠিক করে রাখা ছিল। বাবা শেষ পর্যন্ত কিছু জানতে পারেননি। তোমার চিঠি দিয়েছিলুম (অমিতা পড়ে দিল) কিন্তু তখনো ধরতে পারেননি কে লিখলে। তখনি চিঠির জবাব লিখে দিলেন,—পাঠাচ্ছি। তার আগে একটা কবিতা লিখেছেন। ললিতবাবু ঠিক দশটার সময় এলেন। সত্য-

সখাবাবু ও অমিয়বাবু তাঁকে সাহায্য করবার জন্য ছিলেন। কোনো নার্স নেননি। একজন ক্লোরোফর্মের জন্য ডাক্তার ছিলেন গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত হয়ে কিন্তু দেওয়া হয়নি। ললিতবাবু নিজেই বাবার কাছে গিয়ে, 'এইবার আপনাকে একটু কষ্ট দেব' ব'লে বারান্দায় নিয়ে এলেন। জ্যোতিবাবু বাবার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ছিলেন কিন্তু বেশি কথা বলতে হয়নি, বাবা চোখ বুজে চুপ ক'রে ছিলেন। অপারেশনের সময় ব্যথা লাগছে ব'লে বলেছিলেন কিন্তু ডাক্তাররা বললেন সেটা অনেকখানি সাইকলজিকাল। অপারেশন হয়ে যাবার পর দু-ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। তারপর গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। এখন বিকেল বেলা বেশ স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছেন। কোন গ্লানি নেই। জ্বর ৯৮·৪° অন্য দিনের চেয়ে কম।

এখন আর ভাবনার কিছু নেই।

কিন্তু হঠাৎ হাওয়ার গতি যেন বদলে গেল, তেসরা আগস্ট খবর এল অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, ভালো নয়। মন একেবারে দমে গেল, শচীনবাবুকে সঙ্গে করে সেই বিকেলের দিকেই কলকাতা রওনা হলুম। জোড়াসাঁকো পৌঁছে শুনলুম তখনকার মতো একটু ভালো। যখন তাঁর ঘরে গেলুম তিনি তখন ঘুমুচ্ছেন তাই অপেক্ষা করে রইলুম, ঘুম ভাঙলে আবার দেখা হবে। দুপুরবেলা একটু চেতনা ফিরে এসেছিল, সুধাকান্ত ও আমি অনেক চেষ্টা করলুম বোঝাতে যে আমি এসেছি। অল্পক্ষণের জন্য বুঝতে পারলেন, একবার বললেন, "তাঁকে বসতে বলো, আমার দেহটা এখন বড়ো কষ্ট দিচ্ছে।" আবার চোখ বুজলেন, কোনো সাড়াশব্দ নেই। মন খারাপ হয়ে গেল, বুঝলুম চৈতন্য আচ্ছন্ন, সেদিন আর চেতনা পরিষ্কার হল না। তার পরদিন সকালে একটু ভালো ছিলেন। আমি যখন তাঁর কানের কাছে গিয়ে ডাকলুম, "আমি এসেছি আপনার মা-মণি", তখন একবার প্রসন্ন চোখে পূর্বের মতো বিস্তারিত

দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, বুঝলুম এবার সত্যি চিনেছেন। "জল খাবেন?"—জিজ্ঞাসা করতে 'হ্যাঁ'-র মতো অস্ফুট উচ্চারণ করলেন, আমি একটু-একটু জল তাঁর মুখে দিতে লাগলুম, ধীরে-ধীরে খেলেন। এই আমার হাতে তাঁকে শেষ জলদান। ছ'ই আগস্ট বিকেল থেকে সকলে বুঝল, আর আশা নেই। কিন্তু চলল যমে-ডাক্তারে লড়ালড়ি। আমি আর তার খুঁটিনাটি খবরের দিকে যাব না কারণ অনেকেই এ-বিষয়ে লিখেছেন।

আজ শ্রাবণ-পূর্ণিমার রাত, আকাশ স্তব্ধ, লেগেছে রাখিবন্ধনের লগ্ন। সন্ধ্যা থেকেই সকলে জানত আজকে তাঁর জীবন-সংশয়, বারাণ্ডায় মাঝে-মাঝে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, ডাক্তারদের অনেকগুলো গাড়ি নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে উঠনে, রুগীর ঘরে আলো জ্বলছে, বুঝছি অবস্থা ভালো নয়, ভালো বোধ করলে আলো নিবনো থাকে। কিছু খবর নিতেও সাহস হচ্ছে না, কী জানি কী শুনব। লোকজন পা টিপে-টিপে যাতায়াত করছে, যেন একটা থমথমে ছায়া পড়েছে বাড়ির চারিদিক ঘিরে। চাঁদের আলো যেন ম্লান। একবার উঠছি, একবার বসছি। আমার নার্স আজকের ভাব কী করে বুঝবে, সে খালি অনুযোগ করছে যে, আমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

এরি মধ্যে হঠাৎ কখন্ একটু তন্দ্রা এসেছিল এমন সময় সুধাকান্ত (রায়চৌধুরী) ও রানী এসে বললে, "বউদি চলুন।" বুঝলুম কেন এ ডাক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার সাহস নেই, পা যেন সরে না, তাদের সঙ্গে চলে গেলুম ঘরের দিকে, বুঝলুম মহাপুরুষ আজ মহাপ্রয়াণের পথে। আজ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে রাখিবন্ধন-লগ্ন। যে-মৃত্যুকে তিনি কত বৃহৎ করে, কত গভীর করে অনুভব করেছেন, আজ তারি সঙ্গে মিলনের দিন এসেছে এগিয়ে। সংজ্ঞা তাঁর মিলে যাচ্ছে :

ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে। —জন্মদিনে, ১২

গুরুদেবের আরাধনা-লব্ধ মন্ত্র ছিল "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

এই মন্ত্রকেই তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত সাধনা করে গেছেন। তিনি বলতেন, "এই মন্ত্রই পেয়েছি।" তাঁর ধ্যানের মধ্যে জ্ঞানের আলোকে, এই প্রাচীন মন্ত্র নব জন্মলাভ করেছিল, অমৃতকে অনুভব করার সাধনাই ছিল তাঁর কবিজীবনের উদ্দেশ্য। যিনি পৃথিবীর ধূলিকণার মধ্যেও সেই "আনন্দরূপমমৃতমে"র সন্ধান পেয়েছিলেন, আজ কি তাঁর আত্মা চিন্ময়লোকে সেই রসে নিবিষ্ট নন? তাঁর বরণডালা তিনি তো নিজেই সাজিয়েছেন, আমাদের তো কিছু করবার নেই, পাশে বসে বুকের উপর হাত রাখলুম, তখনো দেহের অণু-পরমাণুর সঙ্গে চেতনার নিবিড় দ্বন্দ্ব চলছে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য। মুখ দিয়ে আজ আপনি বেরিয়ে এল যে-মন্ত্র ত্রিশ বছর আগে এই বাড়িরই ঠাকুর-দালানে দীক্ষিত করেছিলেন তাঁর মা-মণিকে—'অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।'

দিনের আলো ফুটে উঠছে, নিশ্বাসও আসছে ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে। পূজনীয় রামানন্দবাবু (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) সাতটার সময় এসে তাঁর খাটের কাছে বসে উপাসনা করলেন। বাড়ির মেয়েরা ক্ষণে-ক্ষণে তাঁরই রচিত ব্রহ্মসংগীত গেয়ে উঠছেন, স্তবের গুঞ্জনধ্বনিতে ঘরের মধ্যে দেবালয়ের আভাস উঠছে জেগে। সকালের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে উঠছে লোকের ভিড়, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, আজানা অনাহূত কত কে। মনে হচ্ছে সবি ছায়াবাজি, মায়া; কী ভীষণ মিথ্যা এই পৃথিবী, যেন ভোজবাজির চাদরে ঢাকা। যা সত্য তারি অনন্ত সংগমে চলেছেন গুরুদেব, তাঁর শেষ নিশ্বাস ক্রমে-ক্রমে সমে এসে থামল। সকলের মন-মধ্যে মুহূর্তের জন্য অসীমের অনুভূতি নিবিড় রূপ নিল। বৃহস্পতিবার সাতই আগস্ট বারোটা দশ মিনিটে গুরুদেবের নির্লিপ্ত আত্মা দেহবন্ধন থেকে মুক্তি পেল।

সেবিকারা তাঁর পবিত্র দেহ সাজিয়ে দিল শুভ্র ধুতি উত্তরীয়ে। ললাটে আঁকা হল শ্বেতচন্দনের তিলক, গলায় রজনীগন্ধার গোড়ে—তাঁর যে-বেশ কত উৎসবের কত অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলত,

সার্থক করে তুলত, আজ সেই বেশে তাঁর বিচ্ছিন্ন চৈতন্যের দেহেও আধ্যাত্মিক রূপ দীপ্ত হয়ে উঠল। যে-দেহ তিনি পেয়েছিলেন সে তাঁরি চেতনার ও জ্ঞানের উপযুক্ত আধার। তিনি 'জন্মদিনে'তে যা লিখে গেছেন তাঁকে শেষে তেমনি করেই সাজানো হল :

অলংকার খুলে নেবে, একে-একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা ;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ-শঙ্খধ্বনি। —জন্মদিনে, ২৯

কিন্তু সেই 'শুভ-শঙ্খধ্বনি' আমাদের কানে পৌঁছবে কেন। আমরা যে মায়ার জীব, দিব্যদৃষ্টি তো আমাদের নেই। এদিকে বৃহৎ সমুদ্রের কলরব শুনছি বাইরে। জানালাদরজার উপর পড়ছে ভীষণ করাঘাত, যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের তরঙ্গ-আঘাতে সমস্ত বাড়িটা ভেঙে পড়বে। ভূমিকম্পের কাঁপন উঠছে চারিদিকে। কে যেন এসে বললে এইবার ওঁকে নিয়ে যাচ্ছে, শোকযাত্রা শুরু হবে। দৌড়ে দেখতে গেলাম জানালা দিয়ে, শেষ দর্শন হল না। একটা প্রকাণ্ড মানব-সমুদ্রের ঢেউ তাঁর দেহ গ্রাস করে নিল চকিতে। যে-মহামানব তাঁর ধ্যানের উপলব্ধি, সেই বিরাট মানবহৃদয়ের সাগর থেকে আজ বান ডেকে উঠেছে তারই উত্তাল তরঙ্গ তাঁর দেহকে পার্থিব জগৎ থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল, আর তাঁর মহান্ আত্মা ব্যাপ্ত হল ভূমার নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতায়। সেদিন :

দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর ॥

নির্বাণ ॥